বাংলা কাব্যপরিচয়

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা—১

বাংলা কাব্যপরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদিত

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
২১০ নং কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা।

বাংলা কাব্যপরিচয়

—

প্রথম সংস্করণ ১৩৪৫ সাল

মূল্য—দুই টাকা।

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

কোনো একটিমাত্র সংস্করণে এ রকম কাব্য-সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ হোতেই পারে না। বাংলা কাব্য-পরিচয়ের এই প্রথম সংস্করণে নিঃসন্দেহই অনেক অভাব রয়ে গেছে। অনেক কবিতা চোখে পড়েনি। অনেক নির্বাচন যোগ্যতর হোতে পারত। যে সংকলনে রচয়িতারা স্বয়ং তৃপ্ত হননি তাঁদের নির্দেশ পালন করলে হয়তো তা সন্তোষজনক হবার সম্ভাবনা থাকত।

আধুনিক কবিতার ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে, সুতরাং তার সংগ্রহ ভাবী সংস্করণে পূর্ণতা ও উৎকর্ষলাভ করবে এই প্রত্যাশা সংকলনকর্তার মনে রইল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি এই বচনটা পুরাতন। কথাটা যদি নিতান্তই সত্য হোত তাহলে সাহিত্য বা শিল্পের কোনো অর্থই থাকত না। রুচির ভেদ যেন নদীর বাঁকের মতো, ছোটো ছোটো সীমার মধ্যে দেখলে মনে হয় তার চলনের মিল নেই—বড়ো ম্যাপের মধ্যে তাব ঐক্য ধরা পড়ে। এক শিক্ষা এক সংস্কৃতির মধ্যে যাদের মন বেড়ে উঠেছে মোটামুটি তাদের রুচি এক। এর মধ্যেও প্রকৃতিভেদে ব্যক্তিগত যে রুচিভেদ ঘটে সেটা এতটা একান্ত পরস্পরবিরোধী নয় যাতে সাধারণের মধ্যে মানসিক ব্যবহাব অসাধ্য হযে ওঠে। বাঙালি বাড়ির ভোজে অসংকোচে বাঙালিকে নিমন্ত্রণ করা চলে, অথচ যাদের জন্যে পাত পাড়া হয় তাদের মধ্যে রুচির নিচক সাম্য প্রত্যাশা করা যায় না। মোটের উপর তাদের রসনার অভ্যাস ও প্রবৃত্তি এক বকম ব'লেই খেতে বললে মারতে ওঠা সাধারণত সম্ভব হয় না।

কাব্য সংকলন সেই রকম ভোজের নিমন্ত্রণ। যে সাহিত্যে আমাদের মন অভ্যস্ত, যে শিক্ষায় সেই সাহিত্যকে গড়ে তুলেছে, সেই সাহিত্য এবং শিক্ষার ধারাই আমাদের মনের স্বাদবোধের পথকে প্রতিদিন গভীর করছে। সেই আশ্বাসেই এ রকম যজ্ঞে সকলকে সাহস করে ডাকা যায়। কিন্তু তবুও নির্বিশেষে সকল অভ্যাগতেরই মধ্যে মেজাজ ও মর্জির ষোলো আনা মিল আশা করা যায় না। এখানে সেখানে এর ওর পংক্তিতে কিছু কিছু মুখ-বিকৃতির দিকে লক্ষ্য না রেখেই নিমন্ত্রণকর্তাকে আপন কর্তব্যে প্রবৃত্ত হোতে হয়। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

যিনি সাহিত্যের বাছাই করার ভার নেন তাঁকে অগত্যা ধরে নিতে হয় যে তাঁর রুচি সাধারণ রুচির পরিচায়ক, কিন্তু আর একদিকে তাঁর রুচির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যও সম্পূর্ণ আত্মগোপন করতে পারে না। এই বিশেষত্বের পথে পরিচিত সাহিত্যকে কিছু নূতন করে দেখার অবকাশ

ঘটে। এতে যে কৌতূহলের উদ্রেক করে তার মধ্যে দিয়ে কিছু নতুন আবিষ্কারের পথ পাওয়া যায়। নতুন আবিষ্কার বলতে সকল সময়ে এ বোঝায় না যে পাঠক পূর্বে যা দেখতে পাননি তা দেখতে পান, তাঁর পূর্ব দেখার জিনিসকে আর একজনের দেখার মধ্যে দিয়ে পাওয়াও আবিষ্কার।

ইতিমধ্যেই দেখতে পেয়েছি কেউ কেউ আমার এই অধ্যবসায়ের প্রতি পূর্ব হতেই অবজ্ঞা অনুভব করেছেন। ইংরেজি কাব্য সংকলনের দৃষ্টান্ত সম্মুখে রেখেই বোধ করি তাঁরা ভ্রূকুঞ্চিত করেন। আমি বারে বারে অনুভব করেছি এই তুলনা করবার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁদের নেই। তার প্রধান কারণ ইংরেজি কাব্যসংগ্রহের প্রতি তাঁদের মনের মোহদৃষ্টি আছে। বাল্যকাল থেকেই আমরা ইংরেজের ছাত্র, অভিভূত মন নিয়ে বিশুদ্ধ সত্যের বিচার চলে না।

বর্তমান এই কর্তব্য উপলক্ষ্যে ইদানীং আমাকে অনেক ইংরেজি কাব্যসংকলন পড়তে হয়েছে। তুলনায় খুব বেশি সংকোচ বোধ করিনি। বর্তমান যুগের বিরাট বিক্ষুব্ধ ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল থেকে আমরা দূরে আছি, আমাদের অভিজ্ঞতায় বিশাল ও প্রবল জীবনের ভূমিকার যথেষ্ট অভাব ; নব নব বিপ্লবক্ষুব্ধ পরীক্ষার ও সৃষ্টিতৎপর দ্বন্দ্বপরায়ণ অধ্যবসায়ের নির্ঘোষ দূরের থেকে শুনে আমাদের মন আকৃষ্ট হয়, তার ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করবারও চেষ্টা করি, কিন্তু উদ্যোগী হিসাবে বা দর্শক হিসাবে, বা স্থানীয় ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে সমাজে বা রাষ্ট্রে সে আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয় নয়। এই জন্যে বিচিত্র বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের বাণীর প্রেরণা দুর্বল। এই অনিবার্য দৈন্য আমাদের স্বীকার করতে হবে। কিন্তু দেখতে পাই কাব্য বা শিল্প রচনায় বাঙালির কল্পনাবৃত্তির স্বাভাবিক আকর্ষণ ও লীলানৈপুণ্য আছে। এরই ওজন রাখবার জন্যে কর্মক্ষেত্রেও তার সেই পরিমাণে মুক্তির পথ থাকা উচিত ছিল। যে কারণেই হোক কর্মের দিকে আমাদের অপেক্ষাকৃত অকৃতিত্বের প্রমাণ হয়ে গেছে। কিন্তু সেটা এখানকার আলোচ্য নয়। এ কথা বলতেই হবে, রস-রূপ সৃষ্টি করতে মানুষের যে-কল্পনাবৃত্তি আনন্দ

পায় বাঙালির তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই সংকলনে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। ইংরেজির সঙ্গে তুলনা করবার সময় বাংলাসাহিত্যে কল্পনার সেই স্বাভাবিক আবেগ-স্রোতের প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই, পুঞ্জিত সামগ্রীর প্রতি নয়। ইংরেজি সংকলন গ্রন্থে মাঝারি শ্রেণীর বিস্তর মাল বোঝাই দেখতে পাই। তার মধ্যে অনেক লেখাই দেখা যায় যার উপভোগ্যতা ইংরেজের অভ্যস্ত সংস্কারের উপরই নির্ভর করে। এ দেশে সেগুলির প্রতি যাঁদের ধৈর্যের বা শ্রদ্ধার অভাব দেখিনে, তাঁরা যখন বাংলাকাব্যের যাচাইখানায় অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন তখন সেটাকে আমি প্রণিধানের যোগ্য মনে করিনে।

এই সংকলন গ্রন্থকে আমি বাংলা কাব্য পরিচয় নাম দিয়েছি। মাইকেল মধুসূদন লিখেছেন 'বিরচিব মধুচক্র'। প্রত্যেক জাতির কাব্য-সাহিত্য তার মধুচক্র। এই মৌচাকের সঞ্চয়ের মধ্যে থাকে তার একটি বিশেষ পরিচয়, সে জানিয়ে দেয় বিশ্বজগতে কোন্ কোন্‌খানে তার মন খুঁজে পেয়েছে আপ্ মধু। তার এই মৌচাকে জমা হয় শরৎ বসন্ত বর্ষার বিচিত্র দান। "মধু দ্যৌঃ," "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"—আকাশে আছে মধু, পৃথিবীর ধূলিও মধুময়,—মন মধু আহরণ করে স্বপ্ন থেকে আকাশকুসুমের মধু, পৃথিবীর ধূলিও ভুঁইচাঁপা ফোটায়, তার থেকেও মধুর সন্ধান মেলে। বাঙালি কী পেয়েছে কী চেয়েছে যার মধ্যে আছে অনির্বচনীয়ের স্বাদ, যাকে সে আপন অন্তরের রসে মিশিয়ে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করেছে এইটি পাওয়া যায় তার কাব্য থেকে। পদ্মও হোতে পারে তার আকাঙ্ক্ষিত মধুর আধার, গ্রামের পথপার্শ্বে ভাঁটি ফুলও হোতে পারে।

এই সংকলনগ্রন্থে পরিচয়ের একটি প্রধান অংশ অসম্পূর্ণ। এর থেকে আদিরসের কবিতা বাদ পড়েছে। তাতে অনেক ভালো রচনার অভাব ঘটল সে কথা মানব। কিন্তু তাতে লাভের বিষয় এই যে, এ বই অসংকোচে ও নির্বিচারে সর্বজনের হাতে দেওয়া যেতে পারবে। শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্যে সাহিত্য আলোচনার যে প্রয়োজন আছে তার সুযোগকে যথাসম্ভব অবাধ ও ব্যাপক করে দিলে দেশের সংস্কৃতি সাধনার বৃহৎ ভূমিকা করে দেওয়া হয়। আদিরসবর্জিত এই কাব্যসংগ্রহে

উপভোগ্যতার অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে ব'লে আমার মনে হয়নি, যদি হোত তবে সেটাকে সাহিত্যের দৈন্যের লক্ষণ ব'লে মানতে হোত। মানুষের যে প্রবৃত্তি সহজেই অত্যন্ত প্রবল, পাঠকের মন অল্পেই তাতে সাড়া দেয়, তাকে স্বাদু করে তুলতে অধিক নৈপুণ্যের দরকার হয় না। এই কারণেই গৃহিণীর রন্ধনবিদ্যায় যথার্থ গুণপণা প্রকাশ পায় তাঁর নিরামিষ রান্নায়।

যাঁরা বাংলাকাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহ একটা কথা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। [আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ে অপবাদ দেওয়া হয় যে, এ সব জিনিস ন্যাশন্যাল নয়। তার মানে যদি এই হয় যে এ সব কাব্য স্বভাবতই বাঙালি জাতির রুচি-বিরুদ্ধ, তাহলে তো এ জমিতে স্বতই উঠত না এর অঙ্কুর, উঠলেও শিকড়সুদ্ধ দুদিনে যেত শুকিয়ে, বলা বাহুল্য তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।] আলু ফসলটা আদিম উৎপত্তি হিসাবে ন্যাশন্যাল নয়, কিন্তু ন্যাশন্যাল জমিতে এর প্রচুর চাষ চলছে এবং ন্যাশন্যাল ভোজে সাবেক দিশি মেটে আলু জাতীয় ভোজ্যকে বহুগুণে গেছে ছাড়িয়ে। [ন্যাশনাল কুলশীলের দোহাই দিয়ে সেকালের পাঁচালি কবিতার যতই গুণকীর্তন করি না কেন কোনো দেশাত্মবোধী সব ছাড়িয়ে বিশেষভাবে এই পাঁচালিই ন্যাশন্যাল বিদ্যালয়ে চালাবার হুকুম করেন না। নদীর স্রোত আপনার পথ আপনিই কেটে নেয়, রাজকীয় বিভাগের খাল কাটা পথ তার পথ নয়। আধুনিক কাব্য আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে নিচ্ছে।]

বঙ্কিম একদিন দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা বিষবৃক্ষ নিয়ে নিবেদন করেছিলেন বাংলা ভাষা ভারতীকে। বলা বাহুল্য তার ভাব তার ভঙ্গী তার ছাঁচ ইংরেজি সাহিত্যের অনুবর্তী। পণ্ডিতেরা তার ভাষারীতিকে বিদ্রূপ করেছেন, সমাজদরদীরা তাকে নিন্দা করেছেন এই ব'লে যে, সামাজিক রীতি পদ্ধতি থেকে এই সব গল্প দেশের মন ভুলিয়ে নিয়ে

তাকে অশুচি করে তুলেছে। কিন্তু দেখা গেল প্রবীণ নিষ্ঠাবতী গৃহিণীরাও পুত্রবধূদের অনুরোধ করতে লাগলেন এই সব বই তাঁদের পড়ে শোনাতে। বটতলায় ছাপা পুরাণ-কথা থেকে তাঁদের দড়ি দিয়ে বাঁধা চশমা ক্রমশই পথান্তরিত হয়েছে। এ সমস্ত বিদেশী আমদানি ভালো লাগা উচিত নয় ব'লে এদের প্রতি অরুচি জন্মাতে কেউ পারলে না।

সকলের চেয়ে দুঃসাহসিকতা দেখালেন আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের প্রথম দ্বারমোচনকারী মাইকেল মধুসূদন। তিনি যে মিলটনি বন্যায় দুরূহ শব্দতরঙ্গে বাংলা ভাষা তরঙ্গিত করে তুললেন তার মতো অপরিচিত অনভ্যস্ত আবির্ভাব বাঙালি পাঠকের কাছে আর কিছুই ছিল না। এ যদি সত্যই সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব হোত, তাহলে এ জিনিসটাকে বাঙালি সর্বান্তঃকরণে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিত। কিন্তু নতুন শিক্ষার জোরে ইংরেজি সাহিত্যরসে বাঙালির তখন মৌতাৎ জমে গেছে। তখনকার ইংরেজি বিদ্যায় পরিপক্ক বাঙালির কাছে মিলটন শেক্‌সপিয়রের আদর আজকের দিনের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। তাই বাংলাভাষার যন্ত্রে মিল্‌টনীয় মীড় মূর্ছনায় মুগ্ধ হয়ে তারা বাহবা দিয়ে উঠল। মধুসূদনের অসামান্য প্রতিভায় বাংলা ভাষার কাব্যরঙ্গভূমিতে প্রথম প্রাচ্যপাশ্চাত্যের মিলন ঘটা সম্ভব হোলো।

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবর্তনা যে এত দ্রুতগতিতে নানা পথে নানা রূপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার কারণ সেই সাহিত্যের আদর্শ হঠাৎ বাঙালির মনকে বাঁধা গণ্ডি থেকে মুক্তি দিয়েছে। তার মধ্যে একটা কৌতূহলী প্রাণশক্তি আছে যা নব নব পরীক্ষার পথে আপনাকে নূতন করে আবিষ্কার করতে উদ্যত। সে চিরাগত প্রথার বাধার উপর দিয়ে বারে বারে উদ্বেল হয়ে চলেছে। এই প্রাণশক্তির জিয়নকাঠি একদিন সমুদ্র পার হয়ে বাংলাভাষাকে স্পর্শ করলে। বন্দিনী যেমন দ্রুত সাড়া দিয়ে জেগে উঠল। ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশে এমন ঘটেনি। তারপর থেকে বাঙালির ভাবপ্রবণ মনের পরিপ্রেক্ষণিকা সাহিত্যসৃষ্টিতে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল; আজ তার রচনাধারা নানা শাখায় দিগন্ত উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। এই জাগরণের যুগে বাঙালি চিত্তের সৃষ্টি-

ক্ষেত্রে যে সকল রসরূপের উদ্ভাবন হয়েছে এই সংকলন গ্রন্থে তার আকার ও প্রকারের পরিচয় পাওয়া যাবে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা এই যে, দেখা যাবে তার সৃষ্টি প্রয়াসের আবেগ। কেননা যে-সৃষ্টি প্রাণবান মনের, কোনো একটিমাত্র ঋতুতে তার ফুলের শেষ ফসল অবসিত হয় না। নূতন ঋতু আসবে, নূতন রূপের বিকাশ হবে এই আশ্বাসবাণী আমাদের পাওয়া চাই; নূতন আবির্ভাবের ভালোমন্দর বিচার পাকা হোতে দেরি ঘটে। আমাদের শাস্ত্রে বলে মানুষ এক জন্মের দেহ ত্যাগ করে, ফের গ্রহণ করে আর জন্মের দেহ; তেমনি মানুষের মন এককালের সংস্কার পেরিয়ে বাঁধা পড়ে আর এক কালের সংস্কারে; যাকে সে আধুনিক বলে সেও তার নতুন খোলোস, সে খোলোসও জীর্ণ হয়। পর্বে পর্বে প্রাণ আপন আবরণ যেমন রচনা করে তেমনি মোচনও করে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। সম্প্রতি বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির কাব্য দেখা দিয়েছে। এটাকে অনধিকার প্রবেশ ব'লে রুখে দাঁড়াবার কোনো আইন নেই। যেমনি প্রাণের রাজ্যে তেমনি সাহিত্য ও কলাসৃষ্টিতে টিঁকে থাকার দ্বারাই তার অধিকার সপ্রমাণ হয়—পুরাতন ও নূতন শাস্ত্রবাক্য দ্বারা নয়, অভ্যাস দিয়ে ঘেরা স্বাদবোধের দ্বারাও নয়। অমিতাক্ষর ছন্দ যেমন তার যতিভাগের অমিতি এবং মিলের অভাব সত্ত্বেও কাব্যের পংক্তিতে চলে গেছে গদ্যকাব্যও যে তেমন চলবে না কারো মুখের কথায় তার স্থির সিদ্ধান্ত হবে না। চিরাচরিত মিতাক্ষররীতির বহু দূর বাইরে গেছে অমিতাক্ষর, আরো বাইরে পদক্ষেপে যে তার চির নিষেধ, অন্তঃপুরচারিণী কবিতা অন্দর থেকে সদরে এলেই যে সে হবে স্বধর্মচ্যুত, সাহিত্যের ঐতিহাসিক নজির দেখলে বোঝা যায় এ কথা আজ যাঁরা বলছেন হয়তো কাল তাঁরা বলবেন না। বস্তুত নৈবচ বলবার শেষ অধিকার আজ তাঁদের নেই, হয়তো আছে কালকের লোকের।

এই সংকলন গ্রন্থে আধুনিক বাংলার গদ্যকাব্য থেকে সংগ্রহ করা হয়নি। সে কাব্যের ভাণ্ডার অতি সংকীর্ণ, তার থেকে বাছাই করে

নেওয়া সহজ নয়। এ কালের পাক ধরার সময় এখনো আসে নি সেজন্য অপেক্ষা করতে হবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রমাণে বলতে পারি, যে, ছন্দে বাঁধা কবিতা যে আগ্রহে লিখেছি, আবাঁধা কবিতাও লিখেছি সেই আগ্রহেই, এবং ব্যক্তিগত রুচির দিক থেকে, বল্‌তে পারি ভালো পদ্যকাব্য আমার তেমনি ভালো লাগে যেমন ভালো লাগে ভালো গদ্যকাব্য। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই ভালো লাগার রসভেদ আছে, যেমন আম ভালো লাগা আর জাম ভালো লাগা।

উপসংহারে স্বীকার করব অনেক ভালো কবিতা আমার গোচর হয় নি ব'লেই এ গ্রন্থে তুলতে পারি নি। সে আমার অজ্ঞানকৃত ত্রুটি।

সবশেষে এই কথা ব'লে বিদায় নিতে চাই যে এই গ্রন্থে আমার পক্ষে কিছু সংকোচের কারণ আছে—সংকলনে আমার নিজের কবিতার পরিমাণ হয়েছে বেশি।

এই বাহুল্যটা গুণ অনুসারে হয় নি পরিমাণের মাত্রা অনুসারেই হয়েছে। বেঁচে আছি দীর্ঘকাল, এবং এই দীর্ঘ সাতাত্তর বছর বয়সের মধ্যে অন্তত ষাট বছর কেটেছে কাব্য রচনায়।

তাই মাথা-গুণতিতে আমার রচনা-বিভাগে আপনিই ভোটের অধিকার বেড়ে গেল। এই গ্রন্থে যাঁদের উপরে আমার কবিতা বাছাইয়ের ভার ছিল তাঁরা যে ফর্দ ধরে দিয়েছিলেন তার উপরে আমার পেন্‌সিলের অতি লম্বা ক্ষতচিহ্ন দেখলে পাঠকেরা বুঝতেন যে, যদি সংকোচের দুর্বলতা প্রকাশ করে থাকি সে লাঘবের পক্ষেই। জোর করে বলি নি যে, বিশেষত্বসূচক কোনো নমুনা বাদ দেওয়া চলবে না। এখনো তাঁরা নালিশের সুরে জানাচ্ছেন যে, নিজের পাঁঠা যে দিকে খুশি এবং যে পরিমাণে খুশি কাটা যায় এ কথাটা এখানে খাটে না, কেননা এ পাঁঠা আমার নয়, এ সর্বসাধারণের।

এই গ্রন্থে কবিতার সংগ্রহকার্যে স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রভূত সাহায্য করেছেন নতুবা এই দায়িত্ব বহন করা আমার পক্ষে অসাধ্য হোত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচী

রামপ্রসাদ সেন

দাশরথি রায়

ঈশ্বর গুপ্ত

কমলাকান্ত

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)

শ্রীধর কথক

কালী মির্জা (মুখোপাধ্যায়)

কৃষ্ণকমল গোস্বামী

হরু ঠাকুর

ছড়া

গগন হরকরা

ঈশান যুগী

জগা কৈবর্ত

বাউল গঙ্গারাম

মদন বাউল

পদ্মলোচন

বিশা ভুঞিমালী

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বিহারীলাল চক্রবর্তী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নবীনচন্দ্র সেন

শিবনাথ শাস্ত্রী

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোবিন্দচন্দ্র দাস

দেবেন্দ্রনাথ সেন

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

অক্ষয়কুমার বড়াল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বামী বিবেকানন্দ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কামিনী রায়

ইন্দিরা দেবী

প্রিয়ম্বদা দেবী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রমথ চৌধুরী

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

সতীশচন্দ্র রায়

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কালিদাস রায়

নিরুপমা দেবী

হেমেন্দ্রকুমার রায়

গিরিজাকুমার বসু

বাংলা কাব্যপরিচয়

আলাওল

ঈশ্বর-স্তোত্র

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার ।
যেই প্রভু জীব-দানে স্থাপিল সংসার ॥
করিল পর্বত আদি জ্যোতির প্রকাশ ।
তার পরে প্রকটিল সেই কবি-লাস ॥
সৃজিলেক আগুন পবন জল ক্ষিতি ।
নানা রঙ্গ সৃজিলেক করে নানা ভাতি ॥
সৃজিলেক পাতাল মহী স্বর্গ নর্ক আর ।
স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিল প্রচার ॥
সৃজিলেক সপ্ত মহী এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড ।
চতুর্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড ॥
সৃজিলেক দিবাকর শশী দিবা রাতি ।
সৃজিলেক নক্ষত্র নির্মল পাঁতি পাঁতি ॥
সৃজিলেক সুশীতল গ্রীষ্ম-রৌদ্র আর ।
করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার ॥
সৃজিলেক সমুদ্র মেরু জলচর-কুল ।
সৃজিলেক শিপিতে মুক্তা রত্ন বহুমূল ॥

সৃজিলেক বন তরু পক্ষী নানা স্বাদ।
সৃজিলেক নানা রোগ নানান ঔষধ॥
সৃজিয়া মানব রূপ করিল মহৎ।
অন্ন আদি নানা বিধি দিয়াছে ভোগত॥
সৃজিলেক নৃপতি ভুঞ্জয়ে সুখে রাজ।
হস্তী অশ্ব নর আদি দিছে তার সাজ॥
সৃজিলেক নানা দ্রব্য এ ভোগ-বিলাস।
কাকে কৈল ঈশ্বর কাহাকে কৈল দাস॥
কাকে দিল সুখ ভোগ সতত আনন্দ।
কেহ দুঃখ-উপবাসী চিন্তাযুক্ত ধন্ধ॥
আপনা-প্রচার-হেতু সৃজিল জীবন।
নিজ-ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ॥
কাকে কৈল ভিক্ষুক কাহাকে কৈল ধনী।
কাকে কৈল নির্গুণ কাহাকে কৈল গুণী॥
সুগন্ধ সৃজিল প্রভু স্বর্গ আকলিতে।
সৃজিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে॥
মিষ্টরস সৃজিলেক কৃপা-অনুরোধ।
তিক্ত কটু কষা সৃজি জানাইল ক্রোধ॥
পুষ্পে জন্মাইল মধু সুগুপ্ত আকার।
সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার॥

এতেক সৃজিতে তিল না হৈল বিলম্ব।
অন্তরীক্ষ গঠিয়া রাখিছে বিনি স্তম্ভ॥
কাকে কৈল নির্বলী কাহাকে বলী আর।
হাড় হস্তে নির্মিয়া করয় পুনি হাড়॥

আলাওল

সেই এক ধনপতি যাহার সংসার।
সকলেরে দেয় দান না টুটে ভাণ্ডার॥
ক্ষুদ্র পিপীলিকা হস্তে ঐরাবত আর।
কাকে নাহি বিস্মরণ দিয়াছে আহার॥
হেন দাতা আছে কোথা শুন জগ-জন।
সবাকে খাওয়ায় পুনি না খায় আপন॥
জীবন-আহার-দানে করিছে আশ্বাস।
সকলের আশা পুরে আপনে নৈরাশ॥
পর্বত করয়ে রেণু দেখে সর্বলোকে।
হস্তীরে করয় পিপীলিকা সমযোগে॥
যেই ইচ্ছা সেই করে কেহ নাহি জানে।
মন বুদ্ধি অন্ধ ধন্ধ তাহার কারণে॥
সেই সে সকল গড়ে সকল ভাঙ্গয়।
ভাঙ্গিয়া গঠয় পুনি যদি মনে লয়॥

প্রকট গোপত আছে সবাকারে ব্যাপি।
ধার্মিক চিনয়ে তাকে না চিনয়ে পাপী॥
বিনি জীবে জীয়ে বিনি করে সব কর্ম।
জীবহীন কর্তা সেই কে বুঝিবে মর্ম॥
পদ বিনে চলে প্রভু কর্ণ বিনে শুনে।
হিয়া বিনে ভূত ভবিষ্যৎ সব গুণে॥
চক্ষু বিনে হেরে পন্থ পাখা বিনে গতি।
কোনো রূপ-সম নহে অনন্ত-মূরতি॥
স্থান-বিবর্জিত সদা আছে সর্ব ঠাম।
রূপ-রেখা-বহির্ভূত নিরমল নাম॥

আর যত দিয়া আছে রত্ন অমূলিত।
নাহি জানে মূর্খ তার মর্ম কদাচিত॥
দরশন-হেতু দিয়া আছে চক্ষুর্জ্যোতি।
শ্রুতি-হেতু দিয়াছে শ্রবণ-মাঝে শ্রুতি।
বাক্য ষড়্‌রস হেতু রসনা প্রসাদ।
হাস্য লাগি দশন লইতে নানা স্বাদ॥
সুস্বর নিমিত্তে করিয়াছে কণ্ঠ দান।
হস্ত পদ আদি প্রভু দিছে স্থানে স্থান॥
ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে নিয়োজিছে সবাকারে।
একের কর্তব্য আনে করিতে না পারে॥

এ সব রতন পাইয়াছে জনে জনে।
তথাপি দাতার মর্যাদা কেবা জানে॥
যাহাকে করিছে প্রভু এক রত্নহীন।
সেই সে জানয়ে মর্ম হই অতি ক্ষীণ॥
যৌবনের মর্ম জানে যার জীর্ণ কায়।
স্বাস্থ্য-মর্ম না জানে অস্বাস্থ্য যার গায়॥
সুখ-মর্ম দুঃখ বিনে না জানে রাজন।
বন্ধ্যা জনে নাহি জানে প্রসব-বেদন॥

অনেক অপার অতি প্রভুর করণ।
কহিতে অকথ্য কথা না যায় বর্ণন॥
সপ্ত মহী সপ্ত-স্বর্গ বৃক্ষ পত্র যত।
সপ্ত শূন্য ভরি যদি সৃজয় জগত॥
যতবিধ নব গৃহ আর বৃক্ষ-শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী-পাখা॥

কৃত্তিবাস ওঝা

পৃথিবীর যত রেণু স্বর্গে যত তারা।
জীব-জন্তু-শ্বাস আর বরিষার ধারা॥
যুগে যুগে বসি যদি স্তুতি এ লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয়॥

কৃত্তিবাস ওঝা

রামায়ণ

অযোধ্যাকাণ্ড

বৃদ্ধ রাজা দশরথ, শিরে শুভ্র কেশ।
আসন বসন শুভ্র, শুভ্র সর্ব বেশ॥
রাজত্ব করেন রাজা বসি সিংহাসনে।
আইল সকল রাজা রাজ সম্ভাষণে॥

ভূপতি বলেন, শুন পাত্র-মিত্র-গণ।
রামে রাজা করিব, করহ আয়োজন॥
নানা পুষ্প-বিকাশ, বসন্ত চৈত্র-মাস।
রাম কালি রাজা হবে, আজি অধিবাস॥
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল সে স্থানে।
আজ্ঞা পেয়ে আয়োজন করে সর্বজনে॥

নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল রাজগণ।
রাম রাজা হবেন, সকলে হৃষ্টমন ॥
পূর্ণ স্বর্ণ-কুম্ভের উপরে আম্রসার।
শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল-আচার ॥
দৈবের নির্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
কে জানে, পড়িবে আসি প্রমাদ কখন ॥
কৈকেয়ীর চেড়ী, ভরতের ধাত্রীমাতা।
রামের দুঃখের হেতু সৃজিল বিধাতা ॥
দশরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী।
রাম রাজা হন দেখি করে ধড়ফড়ি ॥
আকৃতি প্রকৃতিতে কুৎসিত দেখি তারে।
সর্বনাশ করে কুঁজি থাকে যার ঘরে ॥
কৈকেয়ী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে।
সত্বর মন্থরা গিয়া কহিল সেখানে ॥
নির্বুদ্ধি কৈকেয়ী শুয়ে আছ কোন্ লাজে।
তোমার ভরত আজি মনোদুখে মজে ॥
অপমানে মরিবি তুই শোকের সাগরে।
ভরতে এড়িয়া রাজা রামে রাজা করে ॥
ভরতেরে রাজা করো, রাখো নিজ পণ।
রাজারে কহিয়া রামে পাঠাও কানন ॥
কৈকেয়ী বলেন, রাম ধার্মিক তনয়।
কোন্ দোষে রামের করিব অপচয় ॥
রাম রাজা হইলে আমার বহু মান।
শুভবার্তা কহিলি, কী দিব তোরে দান ॥
অঙ্গ হতে অলংকার খুলি শশব্যস্তে।
আদরে কৈকেয়ী দেন মন্থরার হস্তে ॥

কৃত্তিবাস ওঝা

কুপিতা মন্থরা চেড়ী, দুই ওষ্ঠ কাঁপে।
কৈকেয়ীরে গালি পাড়ে অতুল প্রতাপে॥
হাত হতে অলংকার ছড়াইয়া ফেলে।
দুই চক্ষু রাঙ্গা করি কৈকেয়ীরে বলে॥
কৈকেয়ী তোমার দুঃখ আমার অন্তরে।
বলি হিত, বিপরীত বুঝাও আমারে॥
সপত্নী-তনয় রাজা তুমি আনন্দিতা।
কৌশল্যা তোমার চেয়ে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা॥
নিজপুত্রে রাজা করে স্বামীর সোহাগে।
থাকিবা দাসীর ন্যায় কৌশল্যার আগে।
সতীনের আনন্দেতে সানন্দা সতিনী।
হেন অপরূপ কভু না দেখি না শুনি॥
লালিয়া পালিয়া বড়ো করিনু ভরতে।
মাতা পুত্রে পড়িলা সে কৌশল্যার হাতে॥
      শুনিয়া কুঁজীর কথা কৈকেয়ীর আশ।
কুঁজীর বচনে তার হৈল বুদ্ধিনাশ॥
কৈকেয়ী বলেন, কুঁজী তুমি হিতৈষিনী।
রাম মম মন্দকারী, কিছুই না জানি॥
ভরত প্রবাসে, রাম রাজা হবে আজি।
কেমনে অন্যথা করি, যুক্তি বলো কুঁজী॥
      কুঁজী বলে, যুক্তি চাহ যুক্তি দিতে পারি।
হেন যুক্তি দিব যে ভরতে রাজা করি॥
পূর্বকথা সকল আমার আছে মনে।
সে সকল কথা কহি, শুন সাবধানে॥
পূর্বে যুদ্ধ করিল যে দানব সংবর।
সেই যুদ্ধে মহারাজ ক্ষত কলেবর॥

তাহাতে করিলে তাঁর তুমি সেবা-পূজা।
সুস্থ হয়ে বর দিতে চাহিলেন রাজা॥
আরবার রাজার যে হইল বিস্ফোট।
তাপ দিতে মুখের ঠেকিল দুই ঠোঁট॥
তোমার সেবায় রাজা পাইল নিস্তার।
বর দিতে চাহিল তোমারে পুনর্বার॥
তখন বলিলা তুমি রাজার গোচর।
কুঁজী যবে বর চাহে, তবে দিয়ো বর॥
আজি রাম রাজা হবে বেলা অবশেষে।
আগে আসিবেন রাজা তোমার সম্ভাষে॥
পট্টবস্ত্র এড়ি পরো মলিন বসন।
খসাইয়া ফেলো যত গায়ের ভূষণ॥
জিজ্ঞাসা করিবে রাজা কোপের কারণ।
না দিয়া উত্তর তুমি, করিয়ো রোদন॥
বিবিধ-প্রকারে তোমা করিবে সান্ত্বনা।
যাচিবে তোমারে বস্ত্র অলংকার নানা॥
তবে পূর্ব নির্বন্ধ কহিবে তাঁর স্থান।
আগে সত্য করাই পিছে মাগো দান॥
পূর্ব কথা রাজার অবশ্য হবে মনে।
দুই বর মাগিয়ো রাজার বিদ্যমানে॥
এক বরে করাইবে রাজা ভরতেরে।
আর বরে পাঠাইবে অরণ্যে রামেরে॥
চতুর্দশ বর্ষ যদি রাম থাকে বনে।
পৃথিবী পুরাবে তুমি ভরতের ধনে॥
ফিরিল কৈকেয়ী রাণী কুঁজীর বচনে।
অধর্ম অযশ কিছু নাহি কবে মনে॥

কৃত্তিবাস ওঝা

কুঁজীরে কৈকেয়ী কহে অতি হৃষ্ট মনে।
তব তুল্য গুণবতী না দেখি ভুবনে॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তব বিদ্যমানে।
বনে পাঠাইব রামে, দেখহ এক্ষণে॥
হেথা দশরথ রাজা হরষিত-মনে।
চলিলেন কৌতুকে কৈকেয়ী-সম্ভাষণে॥
ভাবিলেন সম্ভাষিয়া আসিয়া সত্বর।
শ্রীরামে করিব আমি ছত্র-দণ্ড-ধর॥
যে ঘরে কৈকেয়ী দেবী লোটে ভূমি 'পরে।
বিধির নির্ব্বন্ধ, রাজা গেল সেই ঘরে॥
সরল-হৃদয় রাজা, এত নাহি বুঝে।
অজগর-সর্প যেন কৈকেয়ী গরজে॥
প্রাণের অধিক রাজা কৈকেয়ীরে দেখে।
উড়িল রাজার প্রাণ কৈকেয়ীর দুখে॥
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন কম্পিত-অন্তরে।
বনে মৃগ ডরে যেন বাঘিনীর ডরে॥
কী হেতু করিলা ক্রোধ, বলো কার বোলে।
কোন্ ব্যাধি শরীরে, লোটাও ভূমিতলে॥
সমস্ত পৃথিবী মধ্যে মম অধিকার।
ধন জন যত আছে, সকলি তোমার॥
কোন্ কার্যে কৈকেয়ী করহ অভিমান।
আজ্ঞা করো, তাহাই তোমারে করি দান॥
এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আশ।
পূর্ব কথা তাঁর আগে করিল প্রকাশ॥
রোগ পীড়া নহে মোর, পাই অপমান।
আগে সত্য করো, পিছে মাগি আমি দান॥

কৈকেয়ী প্রমাদ পাড়ে, রাজা নাহি জানে।
সত্য করে দশরথ প্রিয়ার বচনে॥
 কৈকেয়ী বলেন, সত্য করিলা আপনি।
অষ্টলোকপাল সাক্ষী, শুন সত্য বাণী॥
অবধান করো রাজা, ধারো মোর ধার।
মোর ধার শোধি তুমি সত্যে হও পার॥
যুদ্ধে হয়েছিল তব ক্ষত কলেবর।
সেবিলাম, তাহে দিতে চেয়েছিলে বর॥
দু' বারের দুই বর আছে তব ঠাঁই।
সেই দুই বর রাজা এই ক্ষণে চাই॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন॥
চতুর্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে॥
 দুরন্ত বচনে রাজা হইল কম্পিত।
অচেতন হইলেন নাহিকো সংবিৎ॥
কৈকেয়ী-বচন যেন শেল বুকে ফুটে।
চেতন পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে॥
মুখে ধুলা উঠে, রাজা কাঁপিছে অন্তরে।
হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে॥
পাপীয়সী আমারে বধিতে তব আশ।
স্ত্রী পুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষ॥
রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন।
সেই দিনে সেই ক্ষণে আমার মরণ॥
প্রভাতে বসিব কল্য সভা-বিদ্যমানে।
পৃথিবীর যত রাজা আসিবে সে স্থানে॥

কৃত্তিবাস ওঝা

অধিবাস রামের হইল সবে জানে।
কী বলিয়া ভাণ্ডাইব সে সকল জনে॥
কৈকেয়ী বলেন, সত্য আপনি করিলা।
সত্য করি বর দিতে কাতর হইলা॥
সত্য ধর্ম তপ রাজা করে বহু শ্রমে।
সত্য নষ্ট করিলে কী করিবেক রামে॥
ভূমে গড়াগড়ি রাজা দেয় অভিমানে।
এতেক প্রমাদ-কথা কেহ নাহি জানে॥
অধিবাস হইয়াছে জানে সর্বজন।
সবে বলে বশিষ্ঠ হইল শুভক্ষণ॥
কালি শ্রীরামের হইয়াছে অধিবাস।
আজি কেন বিলম্ব, না জানি সে আভাস॥
পাত্র মিত্র বলে শুন সুমন্ত্র-সারথি।
তোমা বিনা অন্তঃপুরে কারো নাহি গতি।
ঝাট যাহ সুমন্ত্র-সারথি অন্তঃপুরে।
সকল দেশের রাজা আসিয়াছে দ্বারে॥
রাম-অভিষেকে আসিয়াছে দেবগণ।
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার কী কারণ॥
সুমন্ত্র-সারথি গেল সকলের বোলে।
দেখে, রাজা অজ্ঞান, লোটায় ভূমিতলে।
সুমন্ত্র বলিছে কেন লোটাও রাজন।
রামে রাজা করিতে হইল শুভক্ষণ॥
ত্রিলোকের রাজা সব আসিয়াছে দ্বারে।
বিলম্ব না করো রাজা, চলহ বাহিরে॥
রাজা বলিলেন, পাত্র না জানো কারণ।
মোরে বধ করিবারে কৈকেয়ীব মন॥

বুকে শেল মারিয়াছে বলিয়া কুবাণী।
তার সত্যে বন্দী আমি হয়েছি আপনি॥
শীঘ্র রামে আনো গিয়া আমার বচনে।
তুমি আমি রাম যুক্তি করি তিন জনে॥
কৈকেয়ী বলেন, যাহ সুমন্ত্র ত্বরিত।
শীঘ্র রামে আনো, নহে বিলম্ব উচিত॥
শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সারথি।
উপস্থিত হইল যেখানে রঘুপতি॥
বাহিরে থুইয়া রথ গেল অন্তঃপুরে।
জোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে॥
কৈকেয়ীর সঙ্গে রাজা যুক্তি করে ঘরে।
আমারে পাঠাইলেন লইতে তোমারে॥
শ্রীরাম বলেন, পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ধরি।
বিলম্ব না করি আর, চলো যাত্রা করি॥
বাটীর বাহির হইলেন রঘুনাথ।
চারিভিতে ধায় লোক করি জোড়হাত॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে চড়িলেন রথে।
দেখিতে সকল লোক ধায় চারি ভিতে॥
এক বৃহন্দের বহিঃ রহেন লক্ষ্মণ।
ভিতর আবাসে রাম করেন গমন॥
দশরথ রাজা ভূমে লোটে অভিমানে।
কৈকেয়ী রাজার কাছ আছে সেইখানে॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা কহ তো কারণ।
কেন পিতা বিষাদিত, ভূমেতে শয়ন॥
শ্রীরাম সরল, সে কৈকেয়ী পাপহিয়া।
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া॥

কৃত্তিবাস ওঝা

দৈত্যযুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জর।
তাতে সেবিলাম, দিতে চাহিলেন বর॥
বিস্ফোট হইল পুন করি সেবা-পূজা।
তাহে অন্য বর দিতে চাহিলেন রাজা॥
এক বরে ভরতেরে করিব দণ্ডধারী।
আর বরে রাম তুমি হও বনচারী॥
শুনিয়া কহেন রাম সহাস্যবদনে।
তোমার আজ্ঞায় মাতা এই যাই বনে॥
করিয়াছ কোন্ কাজে পিতারে মূর্ছিত।
লঙ্ঘিতে তোমার আজ্ঞা নহে তো উচিত॥
আছুক পিতার কাজ, তুমি আজ্ঞা করো।
তব আজ্ঞা সকল হইতে মহত্তর॥
তব প্রীতি হবে, র'বে পিতার বচন।
চতুর্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন॥
ভরতেরে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ।
ভবত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ॥
    কৈকেয়ী বলেন, রাম আগে যাহ বন।
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন॥
হেঁট মাথা করিয়া শুনেন মহারাজ।
কী কহিব কৈকেয়ীর নাহি হয় লাজ॥
কৈকেয়ীর প্রতি রাম করেন আশ্বাস।
বিলম্ব নাহিকো আজি যাব বনবাস॥
    ভূমে লোটাইয়া রাজা আছেন বিষাদে।
শুনেন দোঁহার বাক্য স্বপ্নসম বোধে॥
রামচন্দ্র পিতার চরণ-দ্বয় বন্দে।
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে॥

পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত।
'হা রাম' বলিয়া রাজা হলেন মূর্ছিত॥
রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে।
প্রাণের দোসর মাত্র লক্ষ্মণ সে জানে॥
করেন কৌশল্যাদেবী দেবতা-পূজন।
ধূপধুনা ঘৃতদীপ জ্বালিয়া তখন॥
হেনকালে শ্রীরাম মায়ের পদবন্দে।
আশীর্বাদ করে রানী পরম-আনন্দে॥
তোমারে দিলেন রাজা নিজ রাজ্য দান।
সুপ্রসন্না রাজলক্ষ্মী করুন কল্যাণ॥
শ্রীরাম বলেন, মাতা হর্ষ করো কিসে।
হাতেতে আইল নিধি, গেল দৈব-দোষে॥
তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হই।
প্রমাদ পাড়িল মাতা বিমাতা কৈকেয়ী॥
বিমাতার বচনে যাইতে হইল বন।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন॥
এত যদি কহিলেন শ্রীরাম মায়েরে।
ফুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা-অন্তরে॥
কাটিলে কদলী যেন লোটায় ভূতলে।
'হা পুত্র' বলিয়া রানী রাম প্রতি বলে॥
পূজিলাম কত শত দেবদেবীগণে।
তার কি এ ফল বাছা তুমি যাও বনে॥
অযশ রাখিল রাজা নারীর বচনে।
স্ত্রী-বাধ্য-পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে॥
স্ত্রীর বাক্যে যিনি পুত্রে পাঠান কাননে।
তেমন পিতার কথা না শুনিয়ো কানে॥

কৃত্তিবাস ওঝা

লক্ষ্মণ বলেন, সত্য তব কথা পূজি।
স্ত্রীবশ-পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজ্য পায় ইহা সবে ঘোষে।
হেন পুত্র বনে রাজা পাঠান কী দোষে॥
বার্ধক্যে দুর্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল।
করিয়াছে বাধ্য তাঁরে কৈকেয়ী কেবল॥
যদি রঘুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই।
ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোমারে দেওয়াই।
আস্ফালন লক্ষ্মণ করেন সাতিশয়।
শ্রীরাম বলেন, তব বুদ্ধি ভালো নয়॥
যত যত্ন করো তুমি রাজ্য লইবারে।
তত যত্ন করি আমি যাইতে কান্তারে॥
দুঃখ না ভুঞ্জিলে কর্ম না হয় খণ্ডন।
সুখ-দুঃখ দেখো ভাই ললাট-লিখন।
প্রবোধ না মানে কালসর্প যেন গর্জে।
সুমিত্রা কুমার শিশু ঘন ঘন তর্জে॥
ধনুকেতে গুণ দিয়া চাহে চারিভিতে।
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর লাগিল কহিতে॥
সন্ন্যাস তপস্যা যত ব্রাহ্মণের কর্ম।
ক্ষত্রিয়ের সদা যুদ্ধ, সেই তার ধর্ম॥
ক্ষত্রিয় কোথায় কে করেছে বনবাস।
শত্রুর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য আশ॥
অকারণে হেরো এ আজানু-বাহু-দণ্ড।
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড॥
অকারণে ধরি খড়্গ চর্ম ভল্ল শূল।
আজ্ঞা করো ভরতেরে করিব নির্মূল॥

শ্রীরাম বলেন, তার নাহি অপরাধ।
ভরত না জানে কিছু এ সব প্রমাদ॥
মায়েরে কহেন রাম প্রবোধ বচন।
আজ্ঞা করো মাতা, আজি যাই আমি বন॥
কৌশল্যা কহেন রামে সজল নয়নে।
না জানি হইবে কবে দেখা তব সনে॥
যে মন্ত্র কৌশল্যা পেয়েছিল আরাধনে।
সেই মন্ত্র দিল রানী শ্রীরামের কানে॥
চতুর্দশ বর্ষ বনে থাকিবে কুশলে।
অষ্টলোকপাল রাখো আমার ছাওয়ালে॥
চৌদ্দ-বর্ষ রহে যদি আমার জীবন।
তবে তোমা সনে পুন হবে দরশন॥
বিদায় হইয়া রাম মায়ের চরণে।
গেলেন লক্ষ্মণ সহ সীতা-সম্ভাষণে॥
শ্রীরাম বলেন সীতা নিজ-কর্মদোষে।
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে॥
তাঁহার বচনে আমি যাই বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ॥
চতুর্দশ বর্ষ আমি থাকি গিয়া বনে।
তাবৎ মায়ের সেবা করো রাত্রি-দিনে॥
জানকী বলেন, দুখে হইয়া নিরাশ।
স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাস॥
প্রাণনাথ কেন একা হবে বনবাসী।
পথের দোসর হব, করে লও দাসী॥
বনে প্রভু ভ্রমণ করিবে নানা ক্লেশে।
দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে॥

কৃত্তিবাস ওঝা

যদি বলো, সীতা বনে পাবে নানা দুখ।
শত দুখ ঘুচে যদি দেখি তব মুখ॥
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি।
তোমার সেবায় দুখ সুখ সম মানি॥
শ্রীরাম বলেন শুন জনক-দুহিতে।
বিষম দণ্ডক বন, না যাইয়ো সাথে॥
সিংহ ব্যাঘ্র আছে তথা, রাক্ষসী রাক্ষস।
বালিকা হইয়া কেন করো এ সাহস॥
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাঁপে।
কহেন রামের প্রতি কুপিত সন্তাপে॥
পণ্ডিত হইয়া বলো নির্বোধের প্রায়।
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায়॥
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে।
দেখো তায় বীর বলে কোন্ ধীর জনে॥
তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ-কাঁটা ফুটে।
তৃণ হেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে॥
তব সঙ্গে থাকি যদি লাগে ধূলি গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব সঙ্গে থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্য স্বর্গ-গৃহ নহে তার সমতুল॥
শ্রীরাম বলেন বুঝিলাম তব মন।
তোমার পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ॥
হইয়াছে বনবাস হেতু তব মন।
খসাইয়া ফেলহ গায়ের আভরণ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ-অন্তরে।
খুলিলেন অলংকার যা ছিল শরীরে॥

সম্মুখে দেখেন যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তা সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ॥
শ্রীরাম বলেন শুন অনুজ লক্ষ্মণ।
দেশেতে থাকিয়া করো সবার পালন॥
পিতা মাতা কাতর হবেন মম শোকে।
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে॥
লক্ষ্মণ বলেন আমি হই অগ্রসর।
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর॥
যেই তুমি, সেই আমি, বিধাতা তা জানে।
যদি আমি থাকি, তুমি কী করিবে বনে॥
সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে।
সেবকে ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুই জনে॥
      শ্রীরাম বলেন, ভাই যদি যাবে বন।
বাছিয়া ধনুকবাণ লহ রে লক্ষ্মণ॥
বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে।
ধনুর্বাণ লহ যেন জয়ী হই রণে॥
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর।
ভালো ভালো বাণ সব বান্ধিলা বিস্তর॥
      রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কাঁদে সবে নিজ বাসে॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিন জন হইলেন পুরীর বাহির॥
স্ত্রী-পুরুষ কাঁদে যত অযোধ্যা-নগরী।
জানকীর পিছে যায় অযোধ্যার নারী॥
যে-সীতা না দেখিতেন সূর্যের কিরণ।
সেই সীতা বনে যান, দেখে সর্বজন॥

কাশীরাম দাস

মহাভারত

রজনী প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সুখে দিব্য সভা মধ্যে করিল গমন॥
একে একে সম্ভাষ করিয়া সর্বজনে।
বসিলেন অপূর্ব কনক-সিংহাসনে॥
হেনকালে শকুনি লইয়া পাশাসারি।
যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি॥
পুরুষের মনোরম দ্যূতক্রীড়া জানি।
দ্যূতক্রীড়া করো আজি ধর্ম নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির বলে, পাশা অনর্থের ঘর।
ক্ষত্র পরাক্রম ইথে না হয় গোচর॥
শকুনি বলিল, তুমি যাহ নিজ স্থানে।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে ক্রীড়া পণ্ডিত সে জানে॥
যদি দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছা নাহিকো তোমার।
নিবর্তিয়া গৃহে তবে যাহ আপনার॥
যুধিষ্ঠির বলে, যবে ডাকিল আমারে।
সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে।
দুর্যোধন বলে, মম মাতুল খেলিবে।
সব রত্ন দিব আমি যতেক হারিবে॥
এইরূপে দুইজনে পাশা আরম্ভিল।
দেখিবারে সর্বজন পাশাতে বসিল॥

ধর্ম বলিলেন, পণ হইল আমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে যত ধন রত্নের ভাণ্ডার॥
নির্ণয় করিয়া সারি ফেলিল শকুনি।
কটাক্ষে সকল রত্ন লইলেক জিনি॥
ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুন করিলেন পণ।
কোটি কোটি যতেক আছয়ে অশ্বগণ॥
শকুনি হাসিয়া ফেলি জিনিলাম কয়।
কী পণ করিবা আর কহ মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির বলে, মম রথ অগণন।
নানারত্ন-বিভূষিত মেঘের গর্জন॥
শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি তত্‌ক্ষণ।
হেরো দেখো জিনিলাম করো অন্য পণ॥
এই মতো প্রবর্তিল কপট দেবন।
একে একে হারিলেন ধর্ম সর্বধন॥
শকুনি বলিল, কহ কী আর বিচার।
বিচারি করেন পণ ধর্মের কুমার॥
ক্ষিতি মধ্যে বিখ্যাত নকুল মহাবীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর॥
সিংহগ্রীব পদ্মপত্র যুগল নয়ন।
এবার সারিতে নকুলেরে করি পণ॥
কপট শকুনি বলে বলি সারোদ্ধার।
তব প্রিয় ভাই এই পাণ্ডুর কুমার॥
কেমনে ইহারে পণ করিবা দেবনে।
এত বলি ফেলি পাশা লইলেক জিনে॥
ধর্ম বলে, সহদেব ধর্মেতে পণ্ডিত।
আমার পরমপ্রিয় জগতে বিদিত॥

কাশীরাম দাস

এবার সারিতে সহদেব করি পণ।
জিনিলাম বলি বলে গান্ধার-নন্দন ॥
পুন যুধিষ্ঠির করিলেন এ উত্তর।
তিন-লোক-খ্যাত যে আমার সহোদর ॥
হেলে তরি পরসৈন্য সাগরের প্রায়।
যেই দুই বীর কর্ণধারের কৃপায় ॥
এ কর্মেতে পণ্যযোগ্য নহে হেন নিধি।
তথাপিহ করি পণ অক্ষ-ক্রীড়া-বিধি ॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে।
ধনঞ্জয়ে জিনিল; হরিষ কুরুকুলে ॥
ধর্ম বলিলেন, পণ করি এইবার।
বলেতে মনুষ্যলোকে সম নাহি আর ॥
ইন্দ্র যেন দৈত্য দলি পালে সুরগণে।
সেই মতো পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে ॥
পাশায় এ পণ্য যোগ্য নহে হেন ধন।
তথাপিহ করি পণ দৈব নিবন্ধন ॥
জিনিলাম বলি তবে বলিল শকুনি।
আর কী আছয়ে পণ করো নৃপমণি ॥
এত শুনি বলিলেন ধর্মের নন্দন।
আমি আছি কেবলি আমারে করি পণ ॥
জিনিয়া শকুনি বলে কপট-আচার।
পাপকর্ম করিলা হে কুন্তীর কুমার ॥
দ্রুপদনন্দিনী পণ করহ এবার।
জিনিয়া করহ রাজা আপনা উদ্ধার ॥
এ সকল থাকিতে আপনা নাহি হারি।
আপন থাকিলে হয় বহু ধন নারী ॥

রাজা বলে, মামা না সম্ভবে এই কথা।
কী মতে করিব পণ দ্রুপদ-দুহিতা॥
শকুনি বলিল, লক্ষ্মী তোমার গৃহিণী।
তাঁর ভাগ্যে কদাচিৎ পড়ে পাশা জানি॥
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
শকুনির বচন যে মানিলেন হিত॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা খেলা আর বার সেই পণ স্থির॥
পুন পাশা ফেলে দুষ্ট ধর্মবাক্য শুনি।
জিনিনু জিনিনু ব'লে হাঁকিল শকুনি॥
শুনি কর্ণ দুর্যোধন হাসে খল খল।
মহা আনন্দিত কুরু-সোদর সকল॥
বিপরীত দেখি কম্প হৈল সভাজন।
ভীষ্ম আর দ্রোণ হইল সজল নয়ন॥
বিমর্ষ বিদুর বসিলেন অধোমুখে।
জ্ঞানবন্ত লোক স্তব্ধ হইল মহাশোকে॥
হৃষ্ট হয়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল।
কে জিনিল কে জিনিল বলি জিজ্ঞাসিল॥
বহুকালে প্রকাশিল কুটিল আচার।
না পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্র আর॥

হাসিয়া বলিল তবে সূর্যের নন্দন।
দেখহ ইহারে হৈল দৈবের ঘটন॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃ-সমুদয়।
সমযোগ্য দাসের বসিতে না জুয়ায়॥

ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভ্রাতৃগণে।
সভাতলে লইয়া বসাও সর্বজনে ॥
আজ্ঞামাত্র ততক্ষণ যত ভ্রাতৃগণ।
উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন ॥
কোন্ লাজে রাজাসনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্য স্থানে সব বৈস গিয়া ॥
দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম-করে ধরি।
চলো চলো বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঢেকা মারি ॥
ক্রোধেতে ধর্মের পুত্র কাঁপে কলেবর।
চক্ষু রক্তবর্ণ লোহ বহে ঝর ঝর ॥
মাথায় ফিরায় গদা চক্রের আকার।
চরণের ভরে ক্ষিতি হয় তো বিদার ॥
ক্রোধ মুখ করি দুঃশাসন পানে ধায়।
অনুমতি লইতে ধর্মের পানে চায় ॥
হেঁট মাথা যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে।
বুঝিয়া অর্জুন গিয়া ধরিলেন তাঁরে ॥
অর্জুন বলেন, ভাই না কহ অনীতি।
কী হেতু হেলন করো ধর্ম-নরপতি ॥
অর্জুনের বচনে হইল শান্ত ক্রোধ।
ফেলিলেন গদা ভীম মানি অনুরোধ ॥
আভরণ পরিধান যতেক আছিল।
পঞ্চ ভাই আপনা আপনি সব দিল ॥
সভাত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূল্যাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে ॥
হেনকালে দুষ্ট কর্ণ কহিল বচন।
দ্রৌপদী আনিতে দূত করহ প্রেরণ ॥

শুনি দুর্যোধন তবে বিদুরে ডাকিল।
হাস্য উপহাসে তারে কহিতে লাগিল॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়া বিচার।
সভা হৈতে গৃহে তবে গেল আপনার॥

দুর্যোধন আজ্ঞায় চলিল প্রতিকামী।
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিল শীঘ্রগামী॥
যথায় পুরীর মধ্যে দ্রৌপদী সুন্দরী।
দ্রৌপদীর আগে কহে করজোড় করি॥
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু-অধিকারী।
সর্বস্ব হারিল দ্যূতে তোমা আদি করি।
অবধানে মহাদেবী শুনহ বিধান।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল দ্যূতে হতজ্ঞান॥
ধৃতরাষ্ট্র-গৃহে চলো করো যথা কর্ম।
শুনি দ্রৌপদীর ভাঙ্গিল নিজ মর্ম॥
দ্রৌপদী বলেন, হেন কভু নাহি শুনি।
রাজপুত্র হারিয়াছে আপন গৃহিণী॥
করজোড়ে প্রতিকামী বলে সবিষাদ।
অবধান মহাদেবী হইল প্রমাদ॥
অস্ত হৈল কুরুকুল, বুঝিলাম মনে।
সভাতে তোমারে লৈতে বলিল যখনে॥
দ্রৌপদী বলিল, শুন সঞ্জয় নন্দন।
ধর্মরাজ কী বলেন কিবা দুর্যোধন॥
যাহ প্রতিকামী গিয়া জিজ্ঞাসো রাজায়।
নিশ্চয় কি তাঁর মন যাইতে তথায়॥

কাশীরাম দাস

এত শুনি প্রতিকামী চলিল সত্বর।
রাজারে কহিল আসি কৃষ্ণার উত্তর ॥
প্রতিকামী-প্রতি পুন দুর্যোধন বলে।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অগ্নি হেন জ্বলে ॥
আমি যাহা বলি তাহা নাহি লয় মনে।
পুন পুন আইস দ্রৌপদী-দ্যূতপণে ॥
যাহ শীঘ্র দ্রৌপদীরে আনহ এস্থানে।
এত শুনি প্রতিকামী ভীত হৈল মনে ॥
বিচারিয়া বাহুড়িল সঞ্জয় নন্দনে।
করজোড়ে বলে দুর্যোধনের সদনে ॥
তব আজ্ঞাবশে যাই কৃষ্ণা আনিবারে।
না আইলে কী করিব আজ্ঞা করো মোরে ॥
শুনি দুঃশাসনে ডাকি বলে দুর্যোধন।
পাণ্ডবের ভয় করে সঞ্জয়নন্দন ॥
এ কর্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আনো শীঘ্রগতি ॥
সভামধ্যে কেশে ধরি আনহ তাহারে।
নিস্তেজ হয়েছে শত্রু কী আর বিচারে ॥
আজ্ঞামাত্রে দুঃশাসন হয়ে হৃষ্টচিত।
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে চলিল ত্বরিত ॥
দুঃশাসন দুষ্টবুদ্ধি দেখি গুণবতী।
সক্রোধ বদন আর বিকৃত-আকৃতি ॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থরথর।
শীঘ্রগতি উঠি গেল ঘরের ভিতর ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছু গোড়াইল ॥

গৃহদ্বারে কুন্তীদেবী ভুজ প্রসারিয়া।
সবিনয়ে দুঃশাসনে বলে বিনাইয়া॥
কুলবধূ লয়ে যাবে মধ্যেতে সবার।
কুলের কলঙ্ক-ভয় নাহিকো তোমার॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া॥
অচেতন হয়ে দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে॥
পুর হৈতে বাহির করিল শীঘ্রগতি।
দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতী॥
কেশে ধরি লৈয়া যায় পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কিনা লাগে॥
কৃষ্ণা বলে, গুরুজন আছয়ে সভাতে।
কিমতে দাণ্ডাব আমি সভার অগ্রেতে॥
না লহ সভাতে মোরে করো পরিহার।
আরে মন্দমতি কেশ ছাড়হ আমার॥
কৃষ্ণার বচন শুনি দুঃশাসন হাসে।
পুন আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে॥
ঝাকরিয়া বলেতে লইল সভাস্থল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণা হইয়া বিকল॥
উপুড় হইয়া চাহে ভূমি ধরিবারে।
না লও সভাতে মোরে বলয়ে কাতরে॥
দুঃশাসন টানে ঘন কেশেতে আকর্ষি।
পরিহাস ক'রে কেহ বলে এসো দাসী॥
সাধু দুঃশাসন, বলে রাধেয় শকুনি।
সজল নয়নে কান্দে দ্রুপদনন্দিনী॥

কাশীরাম দাস

ধর্মরূপে জগৎপতি, রাখিতে এলেন সতী,
সত্যধর্ম করিতে পালন ॥
আকাশ-মার্গেতে রয়ে বিবিধ বসন লয়ে,
দ্রৌপদীরে সঘনে জোগায় ।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে,
আচ্ছাদন করি সর্বগায় ॥
লোহিত পিঙ্গল পীত, নীল, শ্বেত বিরচিত,
নানা চিত্র বিচিত্র বসনে ।
বিবিধ বর্ণের শাড়ি, দুঃশাসন ফেলে কাড়ি,
পুঞ্জ পুঞ্জ করি স্থানে স্থানে ॥
পর্বত প্রমাণ বাস, দেখি লোকে হৈল ত্রাস,
চমৎকার হইল সভাতে ।
কভু নাহি দেখি শুনি সভাজন বলে বাণী,
ধন্য ধন্য দ্রুপদদুহিতে ॥

অদ্ভুত দেখিয়া সভাজন হৈল স্তব্ধ ।
সাধু সাধু দ্রৌপদী চৌদিকে হৈল শব্দ ॥
পূর্বে কভু নাহি শুনি না দেখি নয়নে ।
দুর্যোধনে নিন্দা বহু করে সভাজনে ॥
ভ্রাতৃগণ-মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর ।
মহাদর্পে গর্জিয়া উঠিল ক্রুদ্ধতর ॥
সভাসদ নিবারিয়া কহে সর্বজনে ।
মম বাক্য শুন যত আছ রাজগণে ॥
সত্য করি কহি আমি সভার অগ্রেতে ।
যাহা কহি তাহা যদি না পারি করিতে ॥

পিতৃপিতামহ গতি না পায় কখনে।
এই তো ভারত-কুলাধম দুঃশাসনে॥
রণমধ্যে ধরি বক্ষ করিয়া বিদার।
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার॥
শুনিয়া সভার লোক হইল কম্পিত।
প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত॥
তবে দুঃশাসন বড়ো হইল লজ্জিত।
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র দেখি হইল বিস্মিত॥
পরিশ্রান্ত হইয়া বসিল ভূমিতলে।
মলিন বদন হইল যত কুরুবলে॥

কান্দে যাজ্ঞসেনী তিতিল অবনী,
নয়নের নীরধারে।
চতুর্দিকে যত, কৌরব উন্মত্ত,
নানা উপহাস করে॥
এ হেন সময়, অন্ধের আলয়,
নানা অমঙ্গল দেখি।
মহাঘোর ধ্বনি, বায়স শকুনি,
ডাকয়ে পেচক পাখি॥
দেখি বিপরীত, চিত্ত উচাটিত,
ধর্মভীত বৃদ্ধজন।
ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা সুবল-দুহিতা,
অন্ধে কৈল নিবেদন॥

কাশীরাম দাস

শুন কুরু রায়, অন্তকাল প্রায়,
নিকট হইল দেখি।
অতি অকুশল, অলক্ষ্মী কেবল,
তোমার গৃহেতে এ কী॥
তোমার নন্দন, দুষ্ট আচরণ,
দুর্যোধন বহু কৈল।
দ্রুপদ-দুহিতা, সতী পতিব্রতা,
সভামাঝে আনাইল॥
যতেক করিল, দ্রৌপদী সহিল,
সবাকার উপরোধ।
শীঘ্র করো রায়, ইহার উপায়,
যাবৎ না হয় ক্রোধ॥
শুনি অন্ধ বীর, হইল অস্থির,
আনাইল যাজ্ঞসেনী।
মধুর সম্ভাষে, বহু প্রীতি-ভাষে,
কহে অন্ধ নৃপমণি॥
বধূগণ-মধ্যে, তোমা গণি সাধ্বে,
শ্রেষ্ঠা সুশীলা সুব্রতা।
তোমার চরিত্র, পরম পবিত্র,
ত্রিজগতে হইল খ্যাতা॥
দেখো বধূ মোকে, কর্মের বিপাকে
দুষ্ট পুত্রগণ পাইল।
লোকে অপকীর্তি, জগতে দুর্বৃত্তি
সব পুত্র হৈতে হৈল॥

দূর করো রোষ, হইয়া সন্তোষ,
মাগো বর মম স্থান।
মাগো মাগো বর, ক্ষমো কটূত্তর,
হয়ে প্রসন্ন বদন ॥
শুনিয়া সুন্দরী, কর জোড় করি,
বর মাগিল তখন।
পাণ্ডবের গতি, ধর্ম নরপতি,
দাসত্ব করো মোচন ॥
ধর্ম মহারাজ, যেন ক্ষিতিমাঝ
দাস বলি ক্ষিতিতলে।
আমার নন্দনে, যেন শিশুগণে,
দাসসুত নাহি বলে ॥
বর দিয়া অন্ধ, হইয়া সানন্দ,
পুন বলে মাগো বর।
নহে এক বর, তব যোগ্যতর,
তুমি মাগো অন্য বর ॥
দ্রৌপদী বলিল, কৃপা যদি হৈল,
মাগি যে তোমার পায়।
সশস্ত্র-বাহন, আর চারিজন,
মুক্ত করহ সবায় ॥
বলে কুরুপতি মাগো গুণবতী,
যেই লয় মনে আর।
তুমি কুলাশ্রয়, মম ভাগ্যোদয়,
দিব যে বর তোমার ॥

করি জোড়পাণি, বলে যাজ্ঞসেনী,
  শুনহ মোর বচন।
মুক্ত হই তবে, পুণ্য থাকে যবে,
  পুন অর্জিবেক ধন ॥
দ্রৌপদী-বচন শুনিয়া রাজন,
  প্রশংসি প্রমাণ কৈল।
পাণ্ডুর নন্দন, দাসত্ব মোচন,
  শুনি সবে তুষ্ট হৈল ॥
ভারত-কবিতা মহাপুণ্য-কথা
  প্রচার হৈল সংসারে।
কাশীদাস কয়, নাহিকো সংশয়,
  শ্রবণে বিপদ তরে ॥

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

ঘুম-পাড়ানি গান

বাছা আয় রে আয়।
কী লাগিয়া কান্দে মোর শ্রীমন্ত রায় ॥
আনিব তুলিয়া গগন-ফুল।
এক এক ফুলের লক্ষেক মূল ॥
সে ফুল গাঁথিয়া পরাব হার।
সোনার বাছারে না কান্দ আর ॥

খাও ক্ষীরখণ্ড মাখাব চুয়া।
কর্পূরাদি পান সরস গুয়া॥
তুরংগম রথ যৌতুক দিয়া।
রাজার ঢু কন্যা করাব বিয়া॥
কপালেতে দিব সে চান্দ ফোঁটা।
খেলাইতে দিব সোনার ভেঁটা॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত॥

মেঘে কৈল অন্ধকার

মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
চিনিতে না পারি ভাই তনু আপনার॥
ঈশানে উড়িলা মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে ঘন ডাকে তুরতুর॥
নিমিষেকে আচ্ছাদিল গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পুখুর হৈল হারা॥
দাবামিনি সম চারি মেঘের গর্জ্জন।
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥
পরিচ্ছিন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
সোঙরে সকল লোক জৈমুনি জৈমুনি॥

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

পূর্ব হৈতে আল্য বন্যা নামেতে ধবল।
সাত তাল কর‍্যা ফেলে মগরার জল॥
ঝঞ্ঝনা চিকুর যেন কামান কৃপাণ।
ভাঙিয়া নৌকার ঘর করে খান খান॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সংগীত।

বারমাস্যা

বৈশাখে বসন্ত ঋতু সুখের সময়।
প্রচণ্ড-তপন-তাপ তনু নাহি সয়॥
চন্দনাদি তৈল দিব হয়্যা সহচরী।
সামলী গামছা দিব সুবাসিত বারি॥
পুণ্য বৈশাখ মাস, পুণ্য বৈশাখ মাস।
দান দিয়া পুরিবে দ্বিজের অভিলাষ॥
নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
খাওয়াব তোমাকে হে নবাত আম্ররসে॥
আষাঢ়ে গর্জ্জয়ে মেঘ নাচয়ে ময়ুর।
নব জলে মদে মত্ত ডাকয়ে দাদুর॥
আমার মন্দিরে থাকো না চলিহ নায়।
সাল্য অন্ন ক্ষীরখণ্ড ভুঞ্জাব তোমায়॥
আষাঢ় সুখ-হেতু হে আষাঢ় সুখ-হেতু।
নিদাম বরিষা হিম একা তিন ঋতু॥

সংকট সময় নাথ ধারা শ্রাবণ।
সাধ লাগে দিতে অঙ্গে রবির কিরণ॥
ভাদ্রপদ মাসে ঝড় দুরন্ত বাদল।
নদনদী একাকার আটদিগে জল॥
ডাঁশমশা নিবারিতে দিব হে মশারি।
চামর-বাতাস দিব হয়্যা সহচরী॥
সুন্দর মন্দিরে তব করাইব বাসা।
আর না করিহ দূর বাণিজ্যের আশা॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে।
ষোল উপচারে মেষ ছাগল মহিষে॥
যত চাহি ধন দিব করো তুমি দান।
সিংহলের লোক যত সাধিব সম্মান॥
আমি বুঝাব রাজায়, আমি বুঝাব রাজায়।
আনাইব তোমার জননী বিমাতায়॥
বরষা টুটিয়া নাথ আইল কার্তিক মাস।
দিবসে দিবসে হবে হিমের প্রকাশ॥
তুলি পাটি পাছুড়ি করাব নিয়োজিত।
অর্ধরাজ্য দিব বাপে করিয়া ইঙ্গিত॥
সকল নতুন শস্য হবে এই মাসে।
ধান্য চাল্য যুগ মাস পুরিবে আওাসে॥
রাজাকে বলিয়া দিব শস্তেক খামার।
ধরাইব রাজপদ কী দুঃখ তোমার॥
পুণ্য অগ্রহায়ণ মাস, পুণ্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জনম তার যার নাই চাষ॥
পৌষ মাসেতে শীত যদি করে পীড়া।
তুলি পাটি দিব আর পাটের পাছড়া॥

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

গোঙাইব শীতপ্রস্থ করিয়া প্রকারে।
মৎস্য মাংস মধু মূলা নানা উপহারে॥
সুখে গোঙাইব হিম, সুখে গোঙাইব হিম।
উজানি নগরকে বাসিবে যেন নিম॥
মাঘ মাসে প্রভাতে করিবে স্নান দান।
সুপাঠক আন্যা দিব শুনিতে পুরাণ॥
মিষ্ট পিষ্ট যোগাইব দিবসে দিবসে।
আনন্দে গোঙাইব নাথ মাঘ নিরামিষে॥
মাঘ মাসে কুতূহলে, মাঘ মাসে কুতূহলে।
সিতল যোগাব আমি বিছান বৈকালে॥
ফাল্গুনে ফুটিবে পুষ্প মোর উপবনে।
তথি দোলমঞ্চ নাথ করিব নির্মাণে॥
হরিদ্রা কুঙ্কুম চুয়া করিয়া ভূষিত।
ফাগু দোলে আনন্দে গোঙাব নিত নিত॥
সখীগণ মেলিয়া আমরা গাব গীত।
আনন্দ হইয়া শুন কৃষ্ণের চরিত॥
মধুমাসে মলয়-মারুত মন্দ মন্দ।
মালতিয়ে মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥
মালতী মল্লিকা চাঁপা বিছায়্যা শয়নে।
মধুমাসে আমোদিত গোঙাব দুজনে॥
সুশীলার বিনয় শুনিয়া সদাগর।
হেটমুখে শ্রীয়পতি দিলেন উত্তর॥
সর্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ।
বারমাস্যা গান দ্বিজ শ্রীকবিকঙ্কণ॥

———

বিদ্যাপতি

আনন্দ

কী কহব রে সখি আনন্দ-ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া-মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওড়নী পিয়া গীরেষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি॥

চণ্ডীদাস

কী আর বলিব

বঁধু, কী আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরানে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥

ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটি কমল পায়।
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিকো মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তবে সে পরানে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

জ্ঞানদাস

গোষ্ঠযাত্রা

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়াল-পাড়া॥
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহিরে॥

আজি বড়ো গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন চালাঞা সভে চলিলা এক সাথে॥
চারিদিকে সব শিশু মধ্যে রামকানু।
কাঁচনি পাঁচনি কারু হাতে শিঙ্গাবেণু॥
সভার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ।
তারাগণ বেঢ়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ॥
ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥

মুরলীশিক্ষা

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশি অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশি সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা-শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটয়ে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে-ফলে॥

কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম-স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহএ হাসি হাসি।
রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশি॥

গোবিন্দ দাস

বিলম্বিতা

গুরুজন জাগল ভৈ গেল বিহান।
গৃহে নিজ কাজ সমাপনে যান॥
কোই সখী দধি-মন্থন করু তাহি।
ঘন ঘন গরজন উপমা নাহি॥
কোই সখী গুরুজন-সেবন কেল।
কনক-কুম্ভ লেই কোই চলি গেল॥
কুসুম তোড়ি কোই গাঁথই হার।
কোই ঘর বাহির করত বিহার॥
নিতি নিতি ঐছন করতহি রীত।
গোবিন্দদাস কহ অনুপচরীত॥

বলরাম দাস

প্রত্যাবর্তন

চাঁদ-মুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণু ঊর্ধ্বমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
অবসান বেণুরব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজ-সুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র কৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে ॥
শ্বেত-কান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভালো শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘন-শ্যাম ॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-খুর-রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥

বলরাম দাস

রাখাল রাজা

গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে বাছুরি চরাব॥
চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে।
আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাঁড়াইয়া রাজপথে॥
পীতধড়া দে গো মা গলায় দেহ মালা।
মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা॥
শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী।
সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি॥
অঙ্গে বিভূষিত কৈল রতন-ভূষণ।
কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীত বসন॥
কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি।
পুষ্প গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ চূড়ার টালনি॥
চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে।
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ রত্ন-হার গলে॥
বলরাম দাসে কয় সাজাইয়া রানী।
নেহারে গোপালের মুখ কাতর পরানি॥

যাদবেন্দ্র

আশঙ্কিতা

আমার শপতি লাগে　　　　না ধাইহ ধেনুব আগে
পরানের পরান নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু　　　　পুরিহ মোহন বেনু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে　　　　আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইয়　　　　সঙ্গ ছাড়া না হইয়
মাঠে বড়ো রিপুভয় আছে॥
খুধা হৈলে লইয়া খাইয়　　　　পথ পানে চাহি যাইয়
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড়ো ধেনু　　　　ফিরাইতে না যাইয় কানু
হাত তুলি দেহ মোব মাথে॥
থাকিবে তরুব ছায়　　　　মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায়।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয়　　　　বাধা পানই হাতে থুইয়
বুঝিয়া জোগাবে রাঙ্গা পায়॥

রসময় দাস

বন্ধু

বাহুড়িয়া আইস বন্ধু পরান-পুতলি।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ করিছে বিকুলি॥
কত আঁখি পসারিব মথুরার পথে।
পাপিয়া পরান নাহি গেল তোমার সাথে॥
হেদে হে গোকুল-প্রাণ জীবন-ধন শ্যাম।
এক বেরি দরশন দিয়া রাখো প্রাণ॥
জনম অবধি দুখ আছে হিয়া ভরি।
দেখিলে তোমার মুখ সকলি পাসরি॥
এক বায় বাহুড়িয়া আইস ব্রজপুরে।
নিরখি তোমার মুখ দুখ যাউক দূরে॥
শীতল মন্দির মাঝে তোমা বসাইব।
যত মনের দুখ-কথা সকল কহিব॥
কতদিনে পুরিবে হিয়ার অভিলাষ।
শ্যাম নিয়ড়ে চলু রসময় দাস॥

শেখর

দূতী

কহিয় কানুরে সই কহিয় কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
নিকুঞ্জে রাখিলু মোর এই গলার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥

এই তরুশাখায় রহিল শারী শুকে ।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে ॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী ।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী ॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা ।
ইহা সভার সনে তার পুন হবে দেখা ॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী ।
আসিতে যাইতে তার নাহিকো শকতি ॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন ।
কহিয় বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥
শুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর ।
কী কহিব শেখর বচন না ফুর ॥

উদ্ধব দাস

পসারী

একদিন মথুরা হৈতে ফল লৈয়া আচম্বিতে
আইলা সে ফল বেচিবারে ।
ফল লেহ ফল লেহ ডাকে পুন পুন সেহ
নামাইলা নন্দের দুয়ারে ॥
ব্রজ-শিশু শুনি তায় ফল কিনিবারে ধায়
বেতন লইয়া পরতেকে ।
কিনি কিনি ফল খায় আনন্দিত হিয়ায়
পসারি বেড়িয়া একে একে ॥

শুনি কৃষ্ণ কুতূহলী ধান্য লইয়া একাঞ্জলি
কর হৈতে পড়িতে পড়িতে।
পসারি নিকটে আসি ফল দেও বলে হাসি
ধান্য দিল ফলাহারী হাতে॥
ধান্য লৈয়া ফলাহারী পুন পুন মুখ হেরি
নিমিষ তেজিল পসারিণী।
এ দাস উদ্ধব কয় কহিলে কহিল নয়
ভুবনমোহন রূপখানি॥

মাধব দাস

গোচারণ

প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গো-খুর-রেণু
শুনি সভার হরষিত মন॥
আগে আগে বৎস পাল পাছে ধায় ব্রজ-বাল
হৈ হৈ শবদ ঘনরোল।
মধ্যে নাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়া বিভোর॥
নবীন রাখাল সব আবা আবা কলরব
শিরে চূড়া নটবর-বেশ।
আসিয়া যমুনা-তীরে নানারঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ॥

কেহো যায় বৃষ-ছান্দে কেহো কারো চড়ে কান্ধে
কেহো নাচে কেহো গান গায়।
এ দাস মাধব বলে কী শোভা যমুনা-কূলে
রামকানাই আনন্দে খেলায়॥

ঘনরাম দাস

বেসাতি

ফল লেহ ফল লেহ ডাকে ফলাহারী।
চ্যুত ধান্য শুধা করে আইলা শ্রীহরি॥
পসারে পেলিয়া ধান্য ফল দেহ বোলে।
অনিমিখে পসারিণী সে মুখ নেহালে॥
নয়নে গলয়ে ধারা দেখি মুখখানি।
কার ঘরের শিশু তুমি যাইয়ে নিছনি॥
কোন্ পুণ্যবতী তোমা করিলেক কোলে।
কাহারে বলিয়া মা স্তন পান কৈলে॥
ঘনরাম দাসে বোলে শুন পসারিণি।
ফলের সহিত কবো জীবন নিছনি॥

দধি-মন্থন

দধি মন্থ-ধ্বনি শুনইতে নীলমণি
আওল সঙ্গে বলরাম।
যশোমতি হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে চান্দ-বয়ান॥

দ্বিজ কানাই

কহে শুন যাদুমণি তোরে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে।
নবনী-লোভিত হরি মায়ের বদন হেরি
কর পাতি নবনীত মাগে ॥
রানী দিল পুরি' কর খাইতে রঙ্গিমাধর
অতি সুশোভিত ভেল তায়।
খাইতে খাইতে নাচে কটিতে কিঙ্কিনী বাজে
হেরি হরষিত ভেল মায় ॥
নন্দ-দুলাল নাচে ভালি।
ছাড়িল মন্থন-দণ্ড উথলিল মহানন্দ
সঘনে দেই করতালি ॥
দেখো দেখো রোহিণি গদ গদ কহে রানী
যাদুয়া নাচিছে দেখো মোর।
ঘনরাম দাসে কয় রোহিণী আনন্দময়
দুহুঁ ভেল প্রেমে বিভোর ॥

দ্বিজ কানাই

ময়মনসিংহ-গীতিকা

মহুয়া

এক দুই তিন করি ভালা ছয় মাস গেল।
ভালা হইয়া নদ্যার ঠাকুর উঠিয়া বসিল ॥
ঝরনীর জল আনে কন্যা আনে বনের ফল।
তা খাইয়া নদীয়ার চান্দের গায়ে হইল বল ॥

পার ডিঙ্গাইয়া যায় নন্থার ঠাকুর সাথে।
অনক দূরতে দুই জনা গেল এই মতে॥
বাড়ি নাইরে ঘর নাইরে বান্ধা যথায় তথায় থাকি।
উইরা ঘুইরা ফিরি যেমন বনের পশু পংখি॥
সামনে পাহাড়িয়া নদী সাঁতার দিয়া যায়।
বনের কোহিল পক্ষী ডালে বইসা গায়॥
এইখানে বাঁধো কন্যা নিজের বাসা ঘর।
এইখানে থাকিয়া মোরা কাটাইব দিন॥
সামনে সুন্দর নদী ঢেউয়ে খেলায় পানি।
এইখানে বঞ্চিব মোরা দিবস রজনী॥
চৌদিকেতে রাঙ্গা ফুল ডালে পাকা ফল।
এইখানেতে আছয়ে কন্যা মিঠা ঝরনীর জল॥

অজ্ঞাত

মলুয়া

ঘাটেতে আছিল বান্ধা মন পবনের নাও—
দুপুরিয়া কালে কন্যা নাওয়ে দিল পাও।
ঝলকে ঝলকে উঠে ভাঙ্গা নাও সে পানি।
কত দূরে পাতাল পুরী আমি নাহি জানি॥
উঠুক উঠুক আরও জল নায়ের বাতা বাইয়া।
বিনোদের ভগ্নী আইল জলের ঘাটে ধাইয়া॥
"শুন শুন বধূ ওগো কইয়া বুঝাই তোরে।
ভাঙ্গা নাও ছাইড়া তুমি আইস মোদের ঘরে॥"

অজ্ঞাত

"না যাইব ঘরে আরি শুনহে ননদিনী।
তোমরা সবের মুখ দেইখ্যা ফাটিছে পরানী ॥
উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
জন্মের মতো মলুয়ারে একবার দেইখ্যা যাও ॥"
দৌইড়া আইল শ্বাশুরি আউলা মাথার কেশ।
বস্ত্র না সম্বরে মাও পাগলিনীর বেশ ॥
"শুন গো পরান বধূ কইয়া বুঝাই তরে।
ঘরের লক্ষ্মী বউ যে আমার ফিইরা আইস ঘরে ॥
ভাঙ্গা ঘরের চান্দের আলো আন্ধাইর ঘরের বাতি।
তোমারে না ছাইড়া থাকিবাম এক দিবা রাতি ॥"
"উঠুক উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
বিদায় দেও মা জননী ধরি তোমার পাও ॥"
ভাঙ্গা নায়ে উঠল পানি করি কল কল।
পাড়ে কান্দে হাউড়ি নাও অর্ধেক হইল তল ॥
একে একে দৌইড়া আইল গর্ভ-সোদর ভাই।
জ্ঞাতি বন্ধু আইল যত লেখা যুখা নাই ॥
পঞ্চ ভাইয়ে ডাইক্যা কয় সোনা বইনের কাছে।
"ভাঙ্গা নায়ে উইঠ্যা বইন কোন বা কার্য আছে ॥
বাপের বাড়ি যাইতে সোয়াদ কও সত্য করিয়া।
পঞ্চ ভাইয়ে লইয়া যাইব সোনার পান্‌সি দিয়া ॥"
"না যাইবাম না যাইবাম ভাই আর সে বাপের বাড়ি।
ভাইয়ের কাছে বিদায় মাগে মলুয়া সুন্দরী ॥
উঠুক উঠুক উঠুক জল ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
মলুয়ারে রাইখ্যা তোমরা আপন ঘরে যাও ॥"
বাতা বইয়া উঠে পানি ডুবে ভাঙ্গা নাও।
"দৌইড়া আসো চান্দ বিনোদ দেখতে যদি চাও ॥"

দৌইড়া আইস্তা চান্দ বিনোদ নদীর পাড়ে খাড়া।
"এমন কইরা জলে ডোবে আমার নয়ন তারা॥
চান্দ সুরুজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর তো নাই চাই॥
তুমি যদি ডুব কন্যা আমায় সঙ্গে নেও।
একটিবার মুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও॥
ঘরে তুইল্যা লইবাম তোমায় সমাজে কাজ নাই।
জলে না ডুবিয়ো কন্যা ধর্মের দোহাই॥"
"গত হইয়া গেছে দিন আর তো নাই বাকি।
কিসের লাইগ্যা সংসারে কাজ আর কেন বা থাকি॥
আমি নারী থাকতে তোমার কলঙ্ক না যাবে।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে তোমায় সবাই ঘাটিবে॥
কলঙ্ক জীবন মোর ভাসাইব সাগরে।
এখান হইতে সোওয়ামি মোর চইল্যা যাও ঘরে॥
ঘরে আছে সুন্দর নারী তার মুখ চাইয়া।
সুখে করো গির-বাস তাহারে লইয়া॥
উঠুক উঠুক পানি ডুবুক ভাঙ্গা নাও।
অভাগীরে রাইখ্যা তুমি আপন ঘরে যাও॥
বাতা বাইয়া উঠুক পানি মাইজ দরিয়ার কোলে।"
জ্ঞাতিবন্ধু জনে কন্যা ডাক দিয়া বলে॥
"বড়ো দোষের দোষী যেই সেও যায় চলি।
খোঁটা উষ্ঠা যত দোষ আমার সকলি॥
কপালে আছিল দুঃখ না যায় খণ্ডনে।
কোন দোষের দোষী নয় আমার সোয়ামি জনে॥"
"শুন গো শাশুরি মোর শত জন্মের মাও।
এইখানে থাইক্যা পন্নাম আমি জানাই তোমার পাও॥"

সুন্দরী মলুয়া কয় সতীনে ডাকিয়া।
"সুখে করো গির-বাস সোয়ামি লইয়া।
আজি হইতে না দেখিবা মলুয়ার মুখ।
আমার দুঃখ পাশরিবা দেইখ্যা স্বামীর মুখ॥"
পুবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠে দেওয়া।
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥
ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কত দূর।
ডুইব্যা দেখি কত দূরে আছে পাতালপুর॥
পুবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও॥
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মন পবনের নাও॥

ভারতচন্দ্র রায়

মানসিংহের সেনা-নিবাসে ঝড়-বৃষ্টি

দশদিক আন্ধার করিল মেঘগণ।
দুন হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনি বিদ্যুৎ চকমকি।
হুড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি॥
ঝড় ঝড়ি ঝড়ের জলের ঝরঝরি।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরি॥
থরথরি স্থাবর বজ্রের কড়মড়ি।
ঘুট ঘুট আঁধার শিলার তড়তড়ি॥

ঝড়ে উড়ে কানাৎ দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাঁই ডুবিল তাম্বুতে এল বান ॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতি।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ি উট আর সাতি ॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলওয়ার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার ॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মালমাত্তা উরুদু বাজার ॥
বকরি বকরা মরে কুঁকড়ি কুঁকড়া।
কুজড়ানি কোলে করি ভাসিল কুজড়া ॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানি ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা ভাসে ॥
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি ॥
বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কান্দে লোক প্রাণ যায় যায় ॥
কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গলায় এসে।
শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে ॥
এইরূপে লস্করে দুষ্কর হইল বৃষ্টি।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইলা সৃষ্টি ॥

রামপ্রসাদ সেন

দুঃখজয়ী

আমি কি দুখেরে ডরাই।
ভবে দেও দুঃখ মা আর কত চাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা,
যদি কোনোখানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো,
বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী
বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখো, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই।

নিষ্ঠুরা

জগৎ জননী তুমি গো তারা।
জগৎকে তরালে আমাকে ডুবালে
আমি কি গো মা জগৎছাড়া।

দিবা অবসানে রজনীর কালে
দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা ব'লে,
মম জীর্ণ তরী মা আছে কাণ্ডারী
তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা।
দ্বিজ রামপ্রসাদ ভাবিয়ে সারা,
মা হয়ে পাঠাইলে মাসির পারা,
কোথায় গিয়েছিলে এ ধর্ম শিখিলে
মা হয়ে সন্তান ছাড়া গো তারা।

অভিমানী

মা মা ব'লে আর ডাকব না—
ওমা দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা ব'লে আর কোলে যাব না।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে
মা বিদ্যমানে এ দুখ সন্তানে
মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না।
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের এ কি সূত্র
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু,
দিবা নিশি ভাবি আর কী করিবি
দিবি দিবি পুন জঠর-যন্ত্রণা॥

দাশরথি রায়

ভালবাসা

নিতান্ত ঐ পদপ্রান্তে অনুগত আমি।
তোমার অন্তরের অন্ত কিছু পাইনে অন্তর্যামী ॥
আশার অধিক দেয় যদি, তাকেই বলি দান।
পণ্ডিতে যারে মান্য করে, তাকেই বলি মান ॥
দরিদ্র দুর্বলে দয়া, তাকেই বলি পুণ্য।
স্বনামে বিক্রীত হয়, তাকেই বলি ধন্য ॥
দেবতায় করে বশীভূত, তাকেই বলি সাধ্য।
ভোজনে অমিত গুণ, তাকেই বলি খাদ্য ॥
ব্যাধির না রাখে শেষ, তাকেই বলি ঔষধি।
সর্বত্র সম্মত হয়, তাকেই বলি বিধি ॥
ঋণ-প্রবাস-রোগ-বর্জিত—তাকেই বলি সুখী।
নিত্য-ভিক্ষে, প্রাণ রক্ষে, তাকেই বলি দুঃখী ॥
বাহুবলে করে যুদ্ধ, তাকেই বলি বীর।
আখের ভেবে কর্ম করে তাকেই বলি ধীর ॥
ইশারায় করে কার্য তাকেই বলি বশ।
মফঃস্বলে ব্যাখ্যা করে, তাকেই বলি যশ ॥
দশের কাছে দূষ্য হয় না, তাকেই বলি ভাষা।
অন্তরেতে ভালবাসে, সেই তো ভালবাসা ॥

কাণ্ডারীহীন

কে চালাবে তরী নাবিক বিনে।
ডুবিলাম বুঝি ঘোর তুফানে।
যদি আসিয়ে ত্বরায় লাগায় কিনারায়
তবে রই সই আর ডুবিনে।
মলয়ের সমীরণে
নদীর তুফান বাড়িছে দিনে দিনে,
ভেঙে গেল হাল, ছিঁড়ে গেল পাল,
কত থাকে আর আশা-গুণে।

স্বপ্ন

গিরি গৌরী আমার এসেছিল
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে
চৈতন্য-রূপিণী কোথায় লুকাল।
কাঁদিছে শিখরী কী করি অচল,
নাহি চলাচল হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মতো জীবন চঞ্চল
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাল।
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার
মায়ের প্রতি মায়া নেই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কী দোষ অভয়ার
পিতৃ-দোষে মেয়ে পাষাণী হোলো।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

সংগীত

আর কবে ভাই মানুষ হবে।
দেখে তোর আকার প্রকার, আচার বিচার
মানুষ কবে, মানুষ কবে ?
হোতে চাও মানুষ যদি ভ্রান্তি নদী
এই বেলা পার হও রে তবে।
মনেরে বলে কয়ে, শুদ্ধ হয়ে
ডুব দিয়ে আয় শান্তি-শবে ॥
নয়নে ছোটো বড়ো দেখবে যারে
তুষবে তারে প্রিয়-রবে।
জাতে হাড়ি মুচি সবাই শুচি,
সমভাবে ভাববে সবে ॥
স্বভাবে হও রে সোজা ভূতের বোঝা
আর কতদিন মাথায় ববে ?
ছাড়বে ভোগের আশা, পুন আসা,
হবে না এই ভ্রমের ভবে ॥
চরমে হবে ভালো গুপ্ত আলো
প্রভাকরে টেনে লবে ॥

কমলাকান্ত

অন্তর্দৃষ্টি

আপনারে আপনি দেখো যেয়ো না মন কারু ঘরে,
যা চাবে এখানে পাবে খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন পরশমণি যে অসংখ্য ধন দিতে পারে
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচত্বয়ারে।
তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ মন উচাটন হয়ো নারে
তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে শীতল হও না মূলাধারে।
কী দেখো কমলাকান্ত মিছে বাজি এ সংসারে
ওরে বাজিকরে চিনলে না কেউ, তোমার ঘটে বিরাজ করে॥

ভ্রমর

মজ্‌ল আমার মনভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
(শ্যামাপদ নীলকমলে, কালীপদ নীলকমলে)
বিষয় মধু তুচ্ছ হোলো কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল।
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এতদিনে
সুখ দুখ সমান হোলো আনন্দ সাগর উথলে।

রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু)

অতুলনীয়

তোমার তুলনা তুমিই হে এ মহীমণ্ডলে,
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে।
সৌরভে গৌরবে কে তব তুলনা হবে,
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে ॥

শ্রীধর কথক

ভালবাসিবে ব'লে

ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে
আমার এই রীতি, তোমা বই জানিনে।
বিধু মুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি, দেখা দিতে আসিনে ॥

কালীমির্জা (মুখোপাধ্যায়)

তুলনা

চাহিয়ে চাঁদের পানে তোরে হয় মনে,
তুল না হইলে দোঁহে তুলনা হবে কেমনে ॥
যদি সমতুল করি নয়নে নয়নে
মৃগাঙ্ক হইয়া শশী লুকায় তব বদনে ॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী

প্রতীক্ষমনা

কুঞ্জের দ্বারে ঐ দাঁড়ায়ে কে।
দেখ্ দেখি গো ও বিশখা কে দেখ্ দেখি গো—
ওকি বারিধর কি গিরিধর,
ওকি নবীন মেঘের উদয় হোলো।
দেখ্ দেখি ওগো ললিতে—
নাকি মদনমোহন ঘরে এল।
ওকি ইন্দ্রধনু যায় দেখা
নব জলধরের মাঝে
নাকি চূড়ার উপর ময়ূর পাখা।
ওকি বকশ্রেণী যায় চলে
নিশ্চয় করিতে নারি গো—
নাকি মুক্তার মালা গলে দোলে।
ওকি সৌদামিনী মেঘের গায়
দেখ্ দেখি গো সহচরী
নাকি পীতবসন দেখা যায়।
ওকি মেঘের গর্জন শুনি
বল্ দেখি গো ও সজনি
নাকি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি॥

—————

হরু ঠাকুর

আবির্ভাব

তুমি কার প্রাণ দেহ শূন্য করি এলে—
হেরে যে রূপ বাসনা করে—
করি পরিত্যাগ আপন প্রাণ
সেইখানে রাখি তোমারে।
পদার্পণে যে কমলে পূর্ণিত করিলে বসুমতী,
জ্ঞান হয় যেন তেমতি—
নয়ন-কটাক্ষে কুমুদ প্রকাশ
পাইত হে তব অম্বরে।

ছড়া

"যাদু এ তো বড়ো রঙ্গ, যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥"
"কাক কালো কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ॥"

"যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চারি ধলো দেখাতে পারো যাবো তোমার সঙ্গ॥"
"বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে তোমার হাতের শঙ্খ॥"

"যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চারি রাঙা দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥"
"জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুম ফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর॥"

"যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ, যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চারি তিতো দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥"
"নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতীনের ঘর॥"

"যাদু এ তো বড়ো রঙ্গ, যাদু এ তো বড়ো রঙ্গ॥
চারি হিম দেখাতে পারো যাব তোমার সঙ্গ॥"
"হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতল পাটি।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি॥"

ছড়া

"ও পারেতে কালো রং,
বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,
এ পারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুক্ টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে॥"
"এ মাসটা থাক্, দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কি সাজিয়ে॥"
"হাড় হোলো ভাজা-ভাজা, মাস হোলো দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥"

ছড়া

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদায়ে ॥
মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে।
সেই যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে ॥
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে।
সেই যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্ধুক সাজায়ে ॥
মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হেঁসেলে বসিয়ে।
সেই যে মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে ॥
পিসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে।
সেই যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে ॥
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আল্না সাজিয়ে।
বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধ'রে
সেই যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামী-খাগী ব'লে ॥

ছড়া

পুঁটু যাবে শ্বশুর বাড়ি সঙ্গে যাবে কে।
ঘরে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে ॥
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
চার মিন্‌সে কাহার দেব পাল্‌কি বহাতে ॥
সরু-ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।
চার মাগি দাসী দেব পায়ে তেল দিতে।
উড়্‌কি ধানের মুড়্‌কি দেব শাশুড়ি ভুলাতে ॥

ছড়া

চাঁদ কোথা পাব বাছা, যাদুমণি।
মাটির চাঁদ নয় গড়ে দেব,
গাছের চাঁদ নয় পেড়ে দেব,
তোর মতন চাঁদ কোথায় পাব।
তুই চাঁদের শিরোমণি।
ঘুমো রে আমার খোকামণি।

ছড়া

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমাদের বাড়ি যেয়ো,
বাটা ভরে পান দেব, গাল ভরে খেয়ো।
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
উড়্কি ধানের মুড়্কি দেব পথে জলপান খেতে।
আয় ঘুম ঘুম যায় ঘুম ঘুম বাঁদরে তেঁতুল খায়,
তারা নুন কোথায় পায়।
গঙ্গার জল বালি তারা নুন ব'লে ব'লে খায়।
খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গি এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে॥

গগন হরকরা

আমি কোথায় পাব তারে

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে॥
লাগি সেই হৃদয় শশী
সদা প্রাণ রয় উদাসী,
পেলে মন হোত খুশি,
দেখতাম নয়ন ভ'রে॥
আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে, নিভাই কেমন ক'রে,
মরি হায়, হায় রে।
ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে,
ওরে দেখ্ না তোরা হৃদয় চিরে।
দিব তার তুলনা কী
যার প্রেমে জগৎ সুখী,
হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
সামান্যে কি দেখতে পারে তারে॥
তারে যে দেখেছে সেই মজেছে ছাই দিয়ে সংসারে।
মরি হায়, হায়রে।
ও সে না জানি কী কুহক জানে অলক্ষ্যে মন চুরি করে।

কুল মান সব গেল রে
তবু না পেলাম তারে,
প্রেমের লেশ নাই অন্তরে।
তাই তো মোরে দেয় না দেখা সে রে।
ও তার বসত কোথায়
না জেনে তায়
গগন ভেবে মরে।
মরি হায় হায় রে।
ও সে-মানষের উদ্দেশ জানিস যদি
(কৃপা করে)
(আমার সুহৃৎ হয়ে)
(ব্যথায় ব্যথিত হয়ে)
আমায় বলে দে রে।

ঈশান যুগী

তোর আপন মুখের ফুঁক

ধন্য আমি—বাঁশিতে তোর
আপন মুখের ফুঁক।
এক বাজনে ফুরাই যদি
নাইরে কোনো দুখ॥
ত্রিলোক ধাম তোমার বাঁশি,
আমি তোমার ফুঁক।

ঈশান যুগী

ভালো মন্দ রঙ্গে বাজি,
বাজি সুখ আর দুখ ॥
সকাল বাজি সন্ধ্যা বাজি,
বাজি নিশুইত রাত।
ফাগুন বাজি, শাওন বাজি,
তোমার মনের সাথ ॥
একবারেতেই ফুরাই যদি
কোনো দুঃখ নাই।
এমন সুরে গেলাম বাইজা
আর কী আমি চাই ॥

মনের তরঙ্গ

আমি মজেছি মনে।
না জানি মন মজল কিসে, আনন্দে কি খোদ্-মরণে।
ওগো এখন আমায় ডাকা মিছে,
আমার নাই যে হিসাব আগে পিছে,
আনন্দে এই মন নাচিছে
শোন্ তার নূপুর বাজে রাত্রে দিনে।
(আজব ব্যাপার তাজব লেগেছে,)
কই সে সাগর, কই এ নদী,
তবু চলছে খবর নিরবধি,
এ তরঙ্গ দেখবি যদি
মিলা হৃদয় নয়ন সনে।
(এত রঙ্গ দেখবি যদি, মিলা মন হৃদয়-নয়নে)

জগা কৈবর্ত

ডাক যে শুনা যায়

অচিন ডাকে নদীর বাঁকে
ডাক যে শুনা যায়
(কূলে ভিড়া, ক্ষণেক জিরা)
অকূল পাড়ি থামতে নারি
সদাই ধারা ধায় ॥
ধারার টানে তরী চলে
ডাকের চোটে মন যে টলে
(ও গুরু ধরো তুমি হাল)
টানাটানি ঘুচাও জগার
হৈল বিষম দায় ॥

বাউল গঙ্গারাম

পরান আমার সোতের দীয়া

পরান আমার সোতের দীয়া।
(আমায় ভাসাইলে কোন্ ঘাটে।)
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার
আন্ধার নিশুইত ঢালা,—
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে
লহরেরি মালা (গো)।

বাউল গঙ্গারাম

তার তলেতে কেবল চলে
নিশুইত রাতের ধারা ;
সাথের সাথী চলে বাতি
নাই গো কূল-কিনারা।
(দিবারাতি চলে গো)
(বাতি জ্বলে সাথে সাথে গো)
দরিয়ার সাগর ওগো অকূলের কূল সখা
আর কয় বাঁকে, কেমন ডাকে,
পাইমু গো দেখা।
তোমার কোলে লইবা তুলে
জুড়াইমু জ্বালা।
(তোমার বুকে নিবুম সুখে
জুড়াইমু জ্বালা)।

প্রাণ রসনায় দেখ্‌রে চাখ্যা

নয়ান দেখে গায়ে ঠেকে ধুলা আর মাটি,
প্রাণ রসনায় দেখ্‌রে চাইখ্যা রসের সাঁই খাঁটি।
রূপের রসের ফুল ফুইট্যা যায়,
পরান-সুতা কই।
বাইরে বাজে সাঁইয়ের বাঁশি
আমি শুইন্যা উদাস হই।
আমার মিলনমালা হইল না রে,
আমি লাজে পথ হাঁটি।

আমি চলি দূর আর দূর,
তবু সমান শুনি সুর,
কত দূর আর যাবি পাগল
সবই সাঁইয়ের পুর।
আরে যেই সমুদ্র সেই দরিয়া, সেই ঘাটের ঘাটী।

মদন বাউল

তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে।
ও তোর ডাক শুনি সাঁই চলতে না পাই—
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুর্‌শেদে॥
ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায়
তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়,
বল্‌তো গুরু কোথায় দাঁড়ায়
(তোমার) অভেদ সাধন মরল ভেদে॥
তোর দুয়ারেই নানান্ তালা—
পুরাণ কোরান তসবি মালা
ভেখ পথই তো প্রধান জ্বালা,
কাঁইন্দা মদন মরে খেদে॥

নিঠুর গরজী

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে।
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহনে?
দেখ্‌না আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, (তার) তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড
তাই ভরসা দণ্ড,
এর আছে কোন্ উপায়। (রে গরজী
কয় যে মদন
শোন্ নিবেদন,
দিসনে বেদন
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সহজ ধারা
আপন হারা
তাঁর বাণী শুনে।
(রে গরজী)

পদ্মলোচন

ডুবল নয়ন রসের তিমিরে

আমার   ডুবল নয়ন রসের তিমিরে—
কমল যে তার গুটাল দল আঁধারের তীরে।
গভীর কালোয় যমুনাতে চলছে লহরী,
(কালোয় ঢালা যমুনাতে—রসের লহরী—)
ও তার   জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী।
(ও তার   জলে ভাসে কানে আসে সাঁইয়ের বাঁশরী।)
আমি   বাইরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পাশরি
(আমি বাহিরে ছুটি ঘর ছাড়িয়ে)
শুধু কেঁদে মরি—ভাসাই কুন্ত রসের নীরে।
আমার   ডুবল নয়ন রসের তিমিরে।
গোঁসাই দাসের চরণ ঘিরে ফুটেছে কমল
ও সেই দুলছে কমল টল টলাটল
রাতের শিশির জল (গো৷
ও সে টিকবে কিনা পড়বে টলে অগাধ জলে॥

বিশা ভুঞিমালী

মুক্তি কোথাও নাই

হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি,
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কী করি।
ফুটে ফুটে ফুটে কমল, ফুটার না হয় শেষ ;
এই কমলের যে-এক মধু, রস যে তার বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই,
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই।
(রে বন্ধু মুক্তি কোথাও নাই।)
(তুমি) পারো যদি যাও না ছেড়ে (তুমি) ছাড়বে কী করি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী

[বিদর্ভাধিপতি ভীষ্মকরাজপুত্রী রুক্মিণী দেবীকে পৌরাণিকেরা সর্বত্র স্বয়ং লক্ষ্মী-অবতার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তিনি আজন্ম বিষ্ণু-পরায়ণা ছিলেন। তদীয় যৌবনাবস্থায় তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ রুক্মী, চেদীশ্বর শিশুপালের সহিত তাঁহার পরিণয়ার্থে উদ্‌যোগী হইলে, রুক্মিণীদেবী নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি দ্বারকায় বিষ্ণু-অবতার দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে প্রেরণ করেন। রুক্মিণী-হরণ-বৃত্তান্ত এ স্থলে ব্যক্ত করা বাহুল্য।]

শুনি নিত্য ঋষিমুখে ; হৃষিকেশ, তুমি
যাদবেন্দ্র, অবতীর্ণ অবনীমণ্ডলে
খণ্ডিতে ধরার ভার দণ্ডি' পাপি-জনে।
চাহে পদাশ্রয়, নমি' ও রাজীবপদে,
রুক্মিণী,—ভীষ্মক-পুত্রী চিরদাসী তব ;—
তারো, হে তারক, তারে এ বিপত্তি-কালে ;
কেমনে মনের কথা কহিব চরণে,
অবলা কুলের বালা আমি, যদুমণি,
কী সাহসে বাঁধি বুক, দিব জলাঞ্জলি
লজ্জাভয়ে। মুদে আঁখি, হে দেব, শরমে ;
না পারে আঙুল-কুল ধরিতে লেখনী,
কাঁপে হিয়া থরথরে। না জানি কী করি,
না জানি কাহারে কহি এ দুঃখকাহিনী।

শুনি তুমি, দয়াসিন্ধু ; হায়, তোমা বিনা
নাহি গতি অভাগীর আর এ সংসারে।
নিশার স্বপনে হেরি পুরুষ-রতনে
কায়-মন অভাগিনী সঁপিয়াছে তাঁরে,
দেবে সাক্ষী করি, বরি দেবনরোত্তমে
বরভাবে। নারী দাসী, নারে উচ্চারিতে
নাম তাঁর, স্বামী তিনি ; কিন্তু কহি শুন,
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ জপেন সতত
সে নাম,—জগৎ-কর্ণে সুধার লহরী।
কে যে তিনি, জন্ম তাঁর কোন্ মহাকুলে,
অবধান করো, প্রভু, কহিব সংক্ষেপে
তুলিয়া কুসুমরাশি, মালিনী যেমতি
গাঁথে মালা, ঋষিমুখ-বাক্যচয় আজি
গাঁথিব নাথ, দেহ পদ-ছায়া।
গ্রহিলা পুরুষোত্তম জন্ম কারাগারে ;—
রাজদ্বেষে পিতামাতা ছিলা বন্দীভাবে,
দীনবন্ধু।—তেঁই জন্ম নাথের কুস্থলে।
খনিগর্ভে ফলে মণি, মুক্তা শুক্তিধামে।
হাসিলা উল্লাসে পৃথ্বী সে শুভ নিশীথে ;
শত শরদের শশী-সদৃশী শোভিল
বিভা। গন্ধামোদে মাতি স্বনিলা সুস্বনে
সমীরণ। নদ-নদী কলকলকলে
সিন্ধুপদে সুসংবাদ দিলা দ্রুতগতি ;
কল্লোলিলা জলপতি গম্ভীর-নিনাদে।
নাচিল অপ্সরা স্বর্গে ; মর্ত্যে নর-নারী।
সংগীত-তরঙ্গ রঙ্গে বহিল চৌদিকে।

বৃষ্টিলা কুসুম দেব, পাইল দরিদ্র
রতন, জীবন পুন জীব-শূন্য জন।
পুরিল অখিল বিশ্ব জয় জয় রবে।
জন্মান্তে জনমদাতা, ঘোরনিশাযোগে,
গোপরাজ-গৃহে লয়ে রাখিলা নন্দনে
মহাযত্নে। মহারত্নে পাইলে যেমতি
আনন্দ-সলিলে ভাসে দরিদ্র, ভাসিলা
গোকুলে গোপ-দম্পতি আনন্দ-সলিলে।
আদরে পালিলা বালে গোপ কুল-রানী
পুত্রভাবে। বাল্য-কালে বাল্য-খেলা যত
খেলিলা রাখাল-রাজ, কে পারে বর্ণিতে।
কে ক'বে, কী ছলে শিশু নাশিলা মায়াবী
পূতনাবে। কাল-নাগ কালিয়, কী দেখি
লইল আশ্রয় নমি' পাদপদ্ম-তলে।
কে ক'বে, বাসব যবে রুষি' বরষিলা
জলাসার, কী কৌশলে গোবর্ধনে তুলি',
রক্ষিলা গোকুল, দেব, প্রলয়-প্লাবনে।
আর আর কীর্তি যত বিদিত জগতে।
এইরূপে কতকাল কাটাইলা সুখে
গোপ-ধামে, গুণনিধি ; পরে, বিনাশিয়া
পিতৃ-অরি, অরিন্দম, দূর-সিন্ধু-তীরে
স্থাপিলা সুন্দরী পুরী। আর কব কত।
দেখো চিন্তি, চিন্তামণি, চেনো যদি তারে।
না পারো চিনিতে যদি, দেহ আজ্ঞা তবে,
পীতাম্বর, দেখি, যদি পারে হে বর্ণিতে
সে রূপ-মাধুরী দাসী। চিত্রপটে যেন,

চিত্রিত সে মূর্তি চির, হায়, এ হৃদয়ে,
নবীন-নীরদ-বর্ণ ; শিখি-পুচ্ছ শিরে ;
ত্রিভঙ্গ, সুগল-দেশে বর গুঞ্জামালা ;
মধুর অধরে বাঁশি ; বাস পীত-ধড়া ;
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-চিহ্ন রাজীব-চরণে ;
যোগীন্দ্র-মানস-পদ্ম ; মোক্ষ-ধাম ভবে।
যতবার হেরি, দেব, আকাশ মণ্ডলে
ঘনবরে, শক্র-ধনু চূড়ারূপে শিরে,—
তড়িৎ সুধড়া অঙ্গে,—পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি' আমি পূজি ভক্তিভাবে।
ভ্রান্তিমদে মাতি কহি,—'প্রাণকান্ত মম
আসিছেন শূন্যপথে তুষিতে দাসীরে।'
উড়ে যদি চাতকিনী, গঞ্জি তারে রাগে।
নাচিলে ময়ূরী, তারে মারি, যদুমণি ;
মন্দ্রে যদি ঘনবর, ভাবি, আঁখি মুদি,
গোপ-কুল-বালা আমি, বেণুর সুরবে,—
ডাকিছেন সখা মোরে যমুনা-পুলিনে।
কহি শিখিবরে ;—'ধন্য তুই পক্ষিকুলে,
শিখণ্ডি, শিখণ্ড তোর মণ্ডে শিরঃ যাঁর,
পূজেন চরণ তাঁর আপনি ধূর্জটি।'
আর পরিচয় কত দিব পদযুগে।
শুন এবে দুঃখ-কথা। হৃদয়-মন্দিরে
স্থাপি' সে সুশ্যাম-মূর্তি, সন্ন্যাসিনী যথা
পূজে নিত্য ইষ্টদেবে গহন-বিপিনে
পূজিতাম আমি নাথে। এবে ভাগ্য-দোষে
চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে,

(শুনি জনরব) না কি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হায়, অভাগীরে।
কী লজ্জা। ভাবিয়া দেখো, হে দ্বারকাপতি।
কেমনে অধর্ম-কর্ম করিবে রুক্মিণী।
স্বেচ্ছায় দিয়াছে দাসী, হায়, একজনে
কায়মন; অন্যজনে—ক্ষমো, গুণনিধি।—
উড়ে প্রাণ, পোড়া কথা পড়ে যবে মনে।
কী পাপে লিখিলা বিধি এ যাতনা ভালে।
আইস গরুড়-ধ্বজে, পাঞ্চজন্য নাদি',
গদাধর। রূপ-গুণ থাকিত যদ্যপি
এ দাসীর,—কহিতাম, 'আইস, মুরারি,
আইস, বাহন তব বৈনতেয় যথা
হরিল অমৃতরস পশি চন্দ্রলোকে,
হরো অভাগীরে তুমি প্রবেশি এদেশে।'
কিন্তু নাহি রূপ-গুণ, কোন্ মুখ দিয়া
অমৃতের সহ দিব আপন তুলনা।
দীন আমি; দীনবন্ধু তুমি, যদুপতি,
দেহ লয়ে রুক্মিণীরে সে পুরুষোত্তমে,
যার দাসী করি বিধি সৃজিলা তাহারে।
রুক্মী নামে সহোদর,—দুরন্ত সে অতি;
বড়ো প্রিয়পাত্র তার চেদীশ্বর বলী।
শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা। চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবানিশি,—
নীরবে দুজনে কাঁদি সভয়ে বিরলে।
লইনু শরণ আজি ও রাজীব-পদে;—

বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণো বিঘ্নে মোরে।
কী ছলে ভুলাই মন, কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি কহিব, শ্রীপতি।
বহে প্রবাহিনী এক রাজ-বন-মাঝে
যমুনা, বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি, কূলে তার কত যে রোপিছি
তমাল কদম্ব,—তুমি হাসিবে শুনিলে।
পুষিয়াছি সারী শুক, ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জবনে; অলিকুল গুঞ্জরে সতত;
কুহরে কোকিল ডালে; ফোটে ফুলরাজি।
কিন্তু শোভাহীনবন প্রভুর বিহনে।
কহ কুঞ্জবিহারীরে, হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু্ বাজাইয়া;
কিংবা মোরে লয়ে, দেব, দেহ তাঁর পদে।
আছে বহু গাভী গোষ্ঠে; নিজ করে দিয়া
সেবে দাসী তা সবারে। কহ রে রাখালে
আসিতে সে গোষ্ঠগৃহে, কহ, যদুমণি।
যতনে চিকণি নিত্য গাঁথি ফুলমালা;
যতনে কুড়ায়ে রাখি, যদি পাই পড়ি'
শিখিপুচ্ছ ভূমিতলে—কত যে কী করি,
হায়, পাগলিনী আমি, কী কাজ কহিয়া।
আসি উদ্ধারহ মোরে, ধনুর্ধর তুমি,
মুরারি। নাশিলা কংসে, শুনিয়াছে দাসী,
কংসজিৎ। মধুনামে দৈত্য-কুল-রথী,
বধিলা মধুসূদন, হেলায় তাহারে।
কে বর্ণিবে গুণ তব, গুণনিধি তুমি।

কালরূপে শিশুপাল আসিছে সত্বরে—
আইস তাহার অগ্রে। প্রবেশি এদেশে
হরো মোরে—হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মন যিনি নিশার স্বপনে।

নীলধ্বজের প্রতি জনা

[মাহেশ্বরী-পুরীর যুবরাজ প্রবীর অশ্বমেধ-যজ্ঞাশ্ব ধৃত করিলে পার্থ তাহাকে রণে নিহত করেন। মহারাজ নীলধ্বজ পার্থের সহিত বিবাদে পরাঙ্মুখ হইয়া সন্ধি করাতে রাজ্ঞী জনা পুত্রশোকে একান্ত-কাতরা হইয়া নিম্নলিখিত পত্রিকাখানি রাজসমীপে প্রেরণ করেন। পাঠকবর্গ মহাভারতীয় অশ্বমেধ পর্ব পাঠ করিলে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিবেন।]

বাজিছে রাজ-তোরণে রণবাদ্য আজি ;
হ্রেষে অশ্ব ; গর্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু, মুহুর্মুহুঃ হুংকারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য,—কিন্তু কোন্ হেতু।
সাজিছ কি, নররাজ যুঝিতে সদলে
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে।
এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু, যাও বেগে, গজরাজ যথা
যমদণ্ডসম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে,
টুটো কিরীটির গর্ব আজি রণস্থলে,
খণ্ড মুণ্ড তার আনো শূল-দণ্ড শিরে।

অন্যায়-সমরে মূঢ় নাশিল বালকে ;
নাশো, মহেষ্বাস, তারে,—ভুলিব এ জ্বালা,—
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে।
জন্মে মৃত্যু,—বিধাতার এ বিধি জগতে।
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখ-সমরে পড়ি গেছে, স্বর্গধামে,—
কী কাজ বিলাপে, প্রভু। পালো মহী, পালো
ক্ষত্রধর্ম—ক্ষত্রধর্ম সাধো ভুজবলে।
হায়, পাগলিনী জনা। তব সভামাঝে
নাচিছে নর্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি, তব সিংহাসনে
বসেছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে।
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
কী লজ্জা। দুঃখের কথা হায়, কব কারে।
হতজ্ঞান আজি কি হে পুত্রের বিহনে,
মাহেশ্বরী-পুরীশ্বর নীলধ্বজ রথী।
যে দারুণ বিধি, রাজা, আঁধারিলা আজি
রাজ্য, হরি পুত্রধনে, হরিলা কি তিনি
জ্ঞান তব। তা না হোলে, কহ মোরে, কেন
এ পাষণ্ড পাণ্ডুরথী পার্থ তব পুরে
অতিথি। কেমনে তুমি, হায়, মিত্রভাবে
পরশো সে কর যাহা প্রবীরের লোহে
লোহিত। ক্ষত্রিয়ধর্ম এই কি নৃমণি।
কোথা ধনু, কোথা তূণ, কোথা চর্ম অসি।
না ভেদি রিপুর বক্ষ তীক্ষ্ণতম শরে
রণক্ষেত্রে, মিষ্টালাপে তুষিছ কি তুমি

কর্ণ তার সভাতলে। কী কহিবে কহ,—
যবে দেশ-দেশান্তরে জনরব লবে
এ কাহিনী ;—কী কহিবে, ক্ষত্রপতি যত।
জানি আমি, কহে লোক রথিকুল-পতি
পার্থ। মিথ্যাকথা, নাথ, বিবেচনা করো,
সূক্ষ্ম বিবেচক তুমি বিখ্যাত জগতে।
ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে ছলিল দুর্মতি
স্বয়ংবরে। যথাসাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোন্ ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে। রাজদলে তেঁই সে জিনিল।
দহিল খাণ্ডব দুষ্ট কৃষ্ণের সহায়ে।
শিখণ্ডীর সহকারে কুরুক্ষেত্র-রণে
পৌরব-গৌরব ভীষ্ম বৃদ্ধ পিতামহে
সংহারিল মহাপাপী। দ্রোণাচার্য গুরু—
কী কুছলে নরাধম বধিল তাঁহারে,
দেখো স্মরি। বসুন্ধরা গ্রাসিল সরোষে
রথচক্র যবে, হায়, যবে ব্রহ্মশাপে
বিকল সমরে, মরি, কর্ণ মহাযশা,
নাশিল বর্বর তাঁরে। কহ মোরে শুনি,
মহারথি-প্রথা কি হে এই, মহারথি।
আনায়-মাঝারে আনি মৃগেন্দ্রে কৌশলে
বধে ভীরুচিত ব্যাধ ; সে মৃগেন্দ্র যবে
নাশে রিপু আক্রমে সে নিজ পরাক্রমে।
কী না তুমি জানো, রাজা। কী কব তোমারে।
আত্মশ্লাঘা মহারথী ? হায়রে, কী পাপে,
রাজ-শিরোমণি রাজা নীলধ্বজ আজি

নতশির, হে বিধাতঃ, পার্থের সমীপে।
কোথা বীরদর্প তব। মানদর্প কোথা।
চণ্ডালের পদধূলি ব্রাহ্মণের ভালে?
কুরঙ্গীর অশ্রুবারি নিবায় কি কভু
দাবানলে। কোকিলের কাকলী-লহরী,
উচ্চনাদী প্রভঞ্জনে নীরবয়ে কবে।
ভীরুতার সাধনা কি মানে বাহুবল।
কিন্তু বৃথা এ গঞ্জনা; গুরুজন তুমি,
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীনা। নাহি শক্তি মিটাই স্ববলে
এ পোড়া মনের বাঞ্ছা। দুরন্ত ফাল্গুনী
(এ কৌন্তেয় যোধে ধাতা সৃজিলা নাশিতে
বিশ্বসুখ।) নিঃসন্তানা করিল আমারে।
তুমি পতি, ভাগ্যদোষে বাম মম প্রতি
তুমি। কোন্ সাধে প্রাণ ধরি ধরাধামে।
হায় রে, এ জনাকীর্ণ ভবস্থল আজি,
বিজন জনার পক্ষে। এ পোড়া ললাটে
লিখিলা বিধাতা যাহা, ফলিল তা কালে।
হা প্রবীর। এই হেতু ধরিনু কি তোরে,
দশমাস দশদিন নানা কষ্ট সয়ে,
এ উদরে। কোন্ জন্মে, কোন্ পাপে পাপী
তোর কাছে অভাগিনী, তাই দিলি, বাছা,
এ তাপ। আশার লতা তাই রে ছিঁড়িলি?
হা পুত্র, শোধিলি কি রে তুই এইরূপে
মাতৃধার। এই কি রে ছিল তোর মনে।—

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কেন বৃথা, পোড়া আঁখি, বরষিস্ আজি
বারিধারা। রে অবোধ, কে মুছিবে তোরে।
কেন বা জ্বলিস মন। কে জুড়াবে আজি
বাক্য সুধারসে তোরে। পাণ্ডবের শরে
খণ্ড শিরোমণি তোর; বিবরে লুকায়ে,
কাঁদি খেদে মর, অরে মণিহারা ফণি।—
যাও চলি, মহাবল, যাও কুরুপুরে
নরমিত্র পার্থ সহ। মহাযাত্রা করি
চলিল অভাগী জনা পুত্রের উদ্দেশে।
ক্ষত্রকুলবালা আমি, ক্ষত্র-কুল-বধূ,
কেমনে এ অপমান সবো ধৈর্য ধরি।
ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে;
দেখিব বিস্মৃতি যদি কৃতান্ত নগরে
লভি অন্তে। যাচি চির-বিদায় ও পদে ।
ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, "কোথা জনা," বলি ডাকো যদি,
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি "কোথা জনা," বলি'।

বসন্ত

ফুটিল বকুলফুল কেন লো গোকুলে আজি
কহ তা স্বজনি।
আইলা কি ঋতুরাজ, ধরিলা কি ফুলসাজ,
বিলাসে ধরণী।

মুছিয়া নয়ন জল, চল লো সকলে চল,
শুনিব তমালতলে বেণুর সুরব ;—
আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব।

যে কালে ফুটে লো ফুল, কোকিল কুহরে, সই,
কুসুম কাননে,
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ-মনে,
সে কালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুল ভবন।
চল লো নিকুঞ্জ বনে পাইব সে ধন।

স্বন-স্বন-স্বনে, শুন, বহিছে পবন, সই,
গহন-কাননে,
হেরি শ্যামে পাই প্রীতি, গাইছে মঙ্গলগীতি,
বিহঙ্গমগণে।
কুবলয়-পরিমল, নহে এ, স্বজনি, চল,—
ও সুগন্ধ দেহগন্ধ বহিছে পবন।
হায় লো, শ্যামের বপু সৌরভ-সদন।

উচ্চ-বীচিরবে, শুন ডাকিছে যমুনা ওই
রাধায়, স্বজনি।
কল-কল-কল-কলে, সুতরঙ্গ দলে চলে
যথা গুণমণি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সুধাকর-কররাশি, সম লো শ্যামের হাসি,
শোভিছে তরল-জলে ; চল ত্বরা করি—
ভুলিগে বিরহ-জ্বালা হেরি প্রাণহরি।

ভ্রমর গুঞ্জরে যথা, গায়, পিকবর, সই,
সুমধুর—বোলে ,
মরমরে পাতাদল, মৃদুরবে বহে জল,
মলয়-হিল্লোলে ;—
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশদিশ বাসে,—
কী সুখ লভিব, সখি, দেখো ভাবি মনে,
পাই যদি হেনস্থলে গোকুল রতনে।

কেন অধোমুখে কাঁদো, আবরি বদনচাঁদ,
কহ রূপবতি।
সদা মোর সুখে সুখী, তুমি, ওলো বিধুমুখি।
আজি লো এ রীতি তব কিসের কারণে।
কে বিলম্বে হেনকালে। চল কুঞ্জবনে।

কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমল পদ,
চল ত্বরা করি,
দেখিব কী মিষ্ট হাসে, শুনিব কী মিষ্ট-ভাষে
তোষেন শ্রীহরি—
দুঃখিনী দাসীরে ; চল হইনু লো হতবল,
ধীরে ধীরে ধরি মোরে চল লো স্বজনি !—
শুধু মধুশূন্য-কুঞ্জে কী কাজ, রমণি।

কুসুম

কেন এত ফুল তুলিলি, স্বজনি,—
ভরিয়া ডালা।
মেঘাবৃত হোলে, পরে কি রজনী
তারার মালা।
আর কি যতনে কুসুম-রতনে
ব্রজের বালা।
আর কি পরিবে কভু ফুলহার
ব্রজকামিনী।
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার—
বন শোভিনী।
অলি বঁধু তার কে আছে রাধার—
হতভাগিনী।
হায় লো দোলাবি, সখি, কার গলে
মালা গাঁথিয়া।
আর কি নাচে লো তমালের তলে
বনমালিয়া।
প্রেমের পিঞ্জর ভাঙ্গি পিকবর,—
গেছে উড়িয়া।
আর কি বাজে লো মনোহর বাঁশি
নিকুঞ্জ-বনে।
ব্রজ-সুধানিধি শোভে কি লো হাসি'
ব্রজ গগনে।
ব্রজ-কুমুদিনী, এবে বিলাপিনী
ব্রজ-ভবনে।

মাইকেল্ মধুসূদন দত্ত

হায় রে, যমুনে, কেন না ডুবিল
তোমার জলে।
অদয় অক্রূর, যবে সে আইল
ব্রজ মণ্ডলে।
ক্রূর দূত হেন বধিলে না কেন
বলে কি ছলে।
হরিল অধম মম প্রাণ হরি
ব্রজ-রতনে।
ব্রজ-বন-মধু নিল ব্রজ অরি
দলি' ব্রজবনে।
কবি মধু ভণে, পাবে ব্রজাঙ্গনে,
মধুসূদনে।

বঙ্গভাষা

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি',
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি'
অনিদ্রায়, অনাহারে সঁপি কায়মন ;
মজিনু বিফল-তপে অবরণ্যে বরি';—
কেলিনু শৈবালে ভুলি' কমল কানন।

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি।
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

কপোতাক্ষ

সতত, হে নদ, তুমি পড়ো মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে,
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে—
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।

বহু-দেশে দেখিয়াছি বহু-নদ-দলে
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে।
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে।

আর কি হে হবে দেখা।—যত দিন যাবে
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে
বারিরূপ কর তুমি, এ মিনতি, গাবে
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সংগীতে।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

হিমালয়

অসীম নীরদ নয় ;
ও-ই গিরি হিমালয় ।
উথ্‌লে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি ।
ব্যেপে দিগ্‌ দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি ।

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কী এক দাঁড়ায়ে আছে,
কী এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান ব্যাপার
কী এক মহান মূর্তি,
কী এক মহান স্ফূর্তি,
মহান উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার ।

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য সোম,
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে,
সমুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে ।

কত শত অভ্যুদয়,
কতই বিলয় লয়,
চক্ষের উপর যেন ঘটে ক্ষণে ক্ষণে ;
হরহর হরহর
সুর নর থরথর
প্রলয়-পিনাক-রাব বাজে না শ্রবণে ।

ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে
বুকে খেলা করে ধেয়ে
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে ।
জ্বলন্ত-অনল-ছবি
ধ্বক ধ্বক জ্বলে রবি,
কিরণ-জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে ।

কালের করাল হাসি
দমকে দামিনী রাশি,
কক্কড় দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ ;
ত্রিজগৎ ত্রাহি ত্রাহি ;
কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাহি ;
কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে।
কে আছে কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে॥

ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাবে রঙ্গে।
এখন গগনে গরজে ঘন, বহে খর সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন, মরিতে আতঙ্কে॥

মনে করি কূলে ফিরি. বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক-তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দধীচির তনুত্যাগ

এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন,—
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,
গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন-মাঝে, কৈলা অধিষ্ঠান

সুনিবিড় সুশীতল, পল্লবশোভিত,
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা
সাশ্রুনেত্রে শিষ্যবৃন্দ আকুল-হৃদয়,
যোগাসন গাঙ্গেয় সলিল-সুবাসিত।
জ্বালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল,
সর্জরস, সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।
তেজঃপুঞ্জ তনুকান্তি, জ্যোতি সুবিমল
নির্মল নয়নদ্বয়ে, গণ্ড ওষ্ঠাধরে।
সুললাটে আভা নিরুপম, বিলম্বিত
চারুশ্মশ্রু, পুণ্ডরীক-মাল্য বক্ষস্থলে।
বসিলা ধীমান—আহা ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে।
চাহি শিষ্যকুল-মুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;—কী কারণ,
হে বৎসমণ্ডলী, হেন সৌভাগ্য আমার
করো সবে অশ্রুপাত। এ ভবমণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কয় জন।
হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?
হায় রে অবোধ প্রাণী, এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিবে।
লভি' জন্ম নরকুলে কী ফল হে তবে।
অনুক্ষণ জীবনের স্রোতোধারা ক্ষয়,
হায়, সে কতই রূপে। কেন তবে হেন,

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘটে যদি কারো ভাগ্যে সে দুর্লভ যোগ,
কাতর নরের চিত্ত সে ব্রত-সাধনে ?
হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী,
জগত-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্মপালনে ;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"
ঋষিবৃন্দে আলিঙ্গন দিলা এত বলি
আশীষিলা শিষ্যগণে ; কহিলা বাসবে—
"হে দেবেন্দ্র, কৃপা করি অন্তিমে আমার
করো শুচি, দেহ মম বারেক পরশি।"
অগ্রসরি শচীপতি সহস্র-লোচন,
তপোধন-শির স্পর্শি স্বকর-কমলে,
কহিলা আকুল-স্বরে—শুনি ঋষিকুল
হরষ-বিষাদে মুগ্ধ—কহিলা বাসব—
"সাধু শিরোরত্ন ঋষি, তুমিই সাত্ত্বিক,
তুমিই বুঝিলা সার জীবের সাধন।
তুমিই সাধিলা ব্রত এ জগতীতলে
চির-মোক্ষফলপ্রদ নিত্য হিতকর।
জীবময় নররূপী—অকূল জলধি
ভাসিছে মিশিছে তায় জলবিম্বপ্রায়
জীবদেহ অনুদিন। এ ভবমণ্ডলে
অক্ষয় তরঙ্গময় জীবন-প্রবাহ।
ক্ষুদ্র প্রাণি-দেহ-ক্ষয়ে এ সিন্ধু-সলিল
হ্রাস-বৃদ্ধি নাহি জানে নিয়ত গভীর
স্রোতোময়। অহিত জগতে নহে তায়,
অহিত নিষ্ফলে প্রাণী দেহের নিধনে।

প্রাণী-মাত্রে কী মহৎ, কিবা ক্ষুদ্রতম—
সাধিতে পারয়ে নিত্য মানবের হিত,
সাধিতে পারয়ে নিত্য অহিত নরের,
আপন আপন কার্যে জীবন-ধারণে।
বালিবৃন্দ যথা নিত্য রেণু-পরিমাণে
বাড়ে দিবা-বিভাবরী, সাগর গর্ভেতে,
ক্রমে স্তূপ—দ্বীপাকার—ক্রমশ বিস্তৃত
বৃহৎ বিপুল দেশ তরু-গিরিময়,
তেমতি এ নরকুল উন্নত সদাই,
সাধু-কার্যে মানবের প্রতি অহরহ।
কর্তব্য নরের নিত্য স্বার্থ পরিহার,
জীবকুল কল্যাণ-সাধন অনুদিন।
পরহিত-ব্রত ঋষি ধর্ম যে পরম;
তুমিই বুঝিয়াছিলে উদ্‌যাপিলে আজ।
মুছ অশ্রু ঋষিবৃন্দ, ঋষিকুলচূড়া
দধীচি পরম পুণ্য লভিলা জগতে।
কী বর অর্পিব আমি নিষ্কাম তাপস,
না চাহিলা কোনো বর, এ সুকীর্তি তব
প্রাতঃস্মরণীয় নিত্য হবে নরকুলে।
তব বংশে জনমি' মহর্ষি দ্বৈপায়ন
করিবে জগতে খ্যাত এ আশ্রম তব—
পুণ্য বদরিকাশ্রম পুণ্যভূমি মাঝে।"
বলিয়া রোমাঞ্চ তনু হইলা বাসব,
নিরখি মুনীন্দ্র-মুখে শোভা নিরমল।
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্বেদ গান
উচ্চৈহরিসংকীর্তন মধুর গম্ভীর—

বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানে মগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনিশোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল-রশ্মি, স্নিগ্ধ নভস্থল,
সমূহ অরণ্য ভেদি সৌরভ-উচ্ছ্বাস,
বন-লতা তরুকুল শোক-অবনত।
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি
নিরপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ জুড়ি'
পুষ্পসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি।—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

নবীনচন্দ্র সেন

প্রভাস

নির্মল আনন্দ রাশি, নির্মল আনন্দ হাসি,
প্রভাসের মহাসিন্ধু: আনন্দ নির্মল,—
জলরাশি, হাসি,—লীলা তরঙ্গ চঞ্চল।
অপরাহ্ণ,—বসন্তের শুক্লাচতুর্দশী।
আনন্দ রবির কর, আনন্দ সুনীলাম্বর,
প্রকৃতি আনন্দময়ী ষোড়শী রূপসী।
আনন্দের সচঞ্চল লীলা রত্নাকর।
আনন্দের অচঞ্চল লীলা নীলাম্বর।

৭

নীলিমায় নীলিমায়, মহিমায় মহিমায়,
মিশাইয়া পরস্পরে মহা আলিঙ্গন।
মহাদৃশ্য,—অনন্তের অনন্ত মিলন।
নীলসিন্ধু, শ্বেতবেলা ; বেলায় তরঙ্গ-খেলা ;
দিতেছে বেলায় সিন্ধু শ্বেত পুষ্পহার,
গাহিয়া আনন্দ গীতি, চুম্বি অনিবার।
সিন্ধুবক্ষে বেলা, যেন বিষ্ণুবক্ষে বাণী,
সান্ধ্য রবিকরে হাসে বেলা সিন্ধুরানী।

শিবনাথ শাস্ত্রী

গভীর নিশীথে

কী ঘোর গভীর নিশি। আঁধার-সাগরে
মগ্ন ধরা ; চারিদিক এমনি সুস্থির,
প্রহরী কুকুর ডাকে, তার সেই রব
শহরের প্রান্ত হতে আর প্রান্তে যায়।
যেন প্রতিধ্বনি তার, প্রাসাদেরা মিলে
লোফালুফি করে ; এ কী ভয়ংকর ভাব।
অগাধ জলধি-তলে—শৈবাল-কুহরে
কীটাণু-নিবসে যথা,—আমি সেইরূপ
আঁধার-সাগর গর্ভে—আপন-কুটীরে
ডুবে আছি ;—পরিজন সকল নিদ্রিত।
কী ঘোর নিস্তব্ধ দিক। নিশার আকাশে,

অদৃশ্য প্রহরী কেহ যেন ঘোর রবে
ফুকারিছে—সাঁ সাঁ করে; বিশ্ব চমকিত।
কে আমি।—পড়িয়ে এই জলধির তলে
সভয়ে জিজ্ঞাসা করি—কে আমি রজনি।
ভূতধাত্রি,—গিরি, নদী, গ্রাম, জনপদ,
তরুলতা জীবজন্তু, কোটি কোটী লয়ে
ফিরিতেছ; আগে শুনি—কে তুমি, ধরণি।
এ বিশ্বে তো রেণু তুমি।—তবে আমি কোথা।
কল্পনে, ভারতি, স্মৃতি,—মোর প্রিয় ধন,
তোমরা কী।—কবি আমি করি অহংকার।
আমি কই।—এই বিশ্বে যাই যে মিলায়ে।
বিশ্বদেব, তুমি তবে কিরূপ অদ্ভুত।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্রদর্শন

চিত্রা বলে, "সম্মুখে যে চিত্র-খানি,
বিরাজিছে অমল কমল-বনে দেবী বীণা-পাণি।
যুবতী নবীনা
বাজাইছে বীণা,
মনোময় স্বর্গ হতে ভাব-সুধা আনি'॥

"গড়ায় সরসী, দিগন্ত পরশি';
চক্ চক্ করিছে অরুণ আভা তদুপরি খসি';

হংস-হংসী তায়,
ভাসি' গায়-গায়,
পদ্মবনে ভিড়িছে মৃণাল অভিলষি' ॥

"হেরো এই, সভার সমক্ষে সতী
মুদিয়া সজল আঁখি, প্রাণত্যাগ নিবেশিছে মতি।
কালা অভিমান
রোষে কম্পমান,
আর কি কোমল প্রাণ তিষ্ঠে একরতি।

"হেরো এই, কতগুলা শুষ্ক দূত
বলিতেছে পরস্পর 'কুল-নারী এ কী অদ্ভুত।
চণ্ডিকা-তরুণী
হাসিতেছে শুনি ;
গর্জিছে কেশরী যেন প্রলয়-জীমূত ॥

"হেরো এই খেলিতেছে তপোবনে
কুশ-লব ; জানকী দেখিছে বসি' পূজার আসনে ;
এ আঁখি-কমল
বরষিছে জল,
এ আঁখি মুদিছে বামা বল্কল-বসনে ॥

হেরো এই, নিরখিয়া হারা-ধন
যশোদা ধাইয়া আসি' চুম্বিতেছে কৃষ্ণের বদন।
শিশু ক্রোড়-তরে
আঁকু-বাঁকু করে ;
বাৎসল্যে মুদিতপ্রায় রানীর নয়ন ॥

"হেরো এই অর্জুন, নির্ভয়-হিয়া,
রথধ্বজে বাঁধিছে বিরাট-সুতে বিরক্ত হইয়া ;
বালক বেচারা
ভয়ে জ্ঞান-হারা,
বীরের বদন পানে আছয়ে চাহিয়া ॥

"হেরো এই দিব্য তপোবন-দ্বারে,
সিংহেরে বলিছে শকুন্তলা-শিশু মুখ মেলিবারে।
শকুন্তলা তায়
ভয়ে মৃতপ্রায়,
কাঁপিতেছে দাঁড়াইয়া, ফুকারিতে নারে ॥"

এইরূপ কত দেখাইল দৃশ্য,
সংখ্যা নাই তাহার, নূতন যেন আরেকটি বিশ্ব।
বীর বিশ্ব-জয়ী
মাতা স্নেহময়ী,
সুন্দরী যুবতি যার নাহিকো সাদৃশ্য ॥

গোবিন্দচন্দ্র দাস

শ্মশানে নিশান

(১)

শ্রাবণের শেষ দিন—মেঘে অন্ধকার,
দিনমান প্রায় শেষ, ব্যাপিয়া আকাশ দেশ,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিছে আবার

উলঙ্গ—এলায়ে চুল, হাতে নিয়ে মহাশূল,
বিকট ভৈরব নাদে ছাড়িয়া হুংকার।
নয়নে কালাগ্নি ঢালি, উন্মত্তা শ্মশান-কালী,
ধাইছে রাক্ষসী-সন্ধ্যা মূর্তি তাড়কার।
উড়িছে মেঘের কোলে বলাকা উজ্জালা,
ভৈরবীর কালকণ্ঠে মহাশঙ্খমালা।

(২)

নিরখি সে ভীমছায়া, দিগন্ত বিস্তৃত কায়া,
ভয়ে যেন ব্রহ্মপুত্র গেছে মসী হয়ে,
আতঙ্কে কাঁপিছে বুক, নাহি শান্তি একটুক,
তরঙ্গ তুফান তার ছুটিছে হৃদয়ে।
আজি তারা শশধর উঠেনি গগন পর,
অমর পেয়েছে ডর মরণের ভয়ে,
এমনি ভীষণ দৃশ্য, বুঝিবা ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব,
এখনি হইবে ধ্বংস মহান প্রলয়ে।

(৩)

ভূতের ভৈরব কণ্ঠ কাঁপায়ে বিমান,
বিঘোর ভৈরব রাগে ছাড়িল সে তান।
"জয় মরণের জয়, জয় শ্মশানের জয়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার ভয়ে কম্পমান,
কী দেব দানব নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
অমর কথার কথা বোঝে না অজ্ঞান।
বাসবের বজ্র ছার বৃথা তার অহংকার,
আপনি করিলে পাপ ভোগে ভগবান।

যত কিছু এই ঠাঁই, হইবেক ভস্ম ছাই,
দেখোরে মোহান্ধ জীব নির্বোধ অজ্ঞান।"
শ্মশান-নিশান-মূলে চিতাভস্ম তুলে তুলে
বাজায়ে মড়ার মাথা ভূত করে গান,
উড়িতেছে "পত পত" "শ্মশানে নিশান।"

দেবেন্দ্রনাথ সেন

মা

তবু ভরিল না চিত্ত ; ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম। বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে ; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া ;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী সংগমে ;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি' ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে
রাধাশ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বর গুঞ্জ-মালা।
তবু ভরিল না চিত্ত ; সর্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

গ্রাম্যছবি

মাটিতে নিকানো ঘর, দাওয়াগুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটির উঠান।
খড়ো চালখানি ছাঁটা, লতিয়া করলা-লতা
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান।
পিঁজারায় বদ্ধ বাঁধা, 'বউ কথা' কহে কথা,
বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে ;
মঞ্চে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা,
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।
কানে দুল দুল-দুল, গাছভরা পাকা কুল,
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বোনে।
ছোটো হাতে জোর করে শাখাটি নোয়ায়ে ধরে
কাঁটা ফুটে, হাত লয় টেনে।
পুকুরে নির্মল জল, ঘেরা কলমীর দল
হাঁস দুটি করে সন্তরণ,
পুকুরের পারে বাঁশ-বন।
শূন্য জন-কোলাহল, কিচিমিচি পাখিদল,
সাঁই-সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদটুকু সোনার বরন।
লুটায়ে চুলের গোছা বালা দুটি হাতে গোঁজা
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে।

শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গরু চরে ;
তরুতলে রাখাল শয়ান ;
সরু মেঠো রাস্তা বেয়ে পথিক চলেছে গেয়ে
মনে পড়ে সেই মিঠে তান।
আজি এই দ্বিপ্রহরে, বাল্য-স্মৃতি মনে পড়ে,—
মনে পড়ে ঘুঘুর সে গান।
সুধাময়ি জন্মভূমি, তেমতি আছ কি তুমি,
শান্তিমাখা, স্নিগ্ধ শ্যাম-প্রাণ।

অক্ষয়কুমার বড়াল

আহ্বান

(১)

হেরো প্রিয়া এই ধরা—তরু-লতা-পুষ্প ভরা
গিরি-নদী-সাগর-শোভনা—
নগ্ন দেহে, মুক্ত প্রাণে চাহিয়া আকাশ-পানে ,
নাহি লজ্জা, নাহিকো ছলনা।

হেরো ওই মহাকাশ—লয়ে মেঘ রাশ রাশ,
লইয়া আলোক অন্ধকার—
কী গাঢ় গভীর সুখে পড়িয়া ধরার বুকে ;
নাহি ঘৃণা, নাহি অহংকার।

শিরে শূন্য পদে ভূমি মধ্যে আছি আমি তুমি—
কল্প-কল্প বিকাশ-বারতা।
আছে দেহ—আছে ক্ষুধা, আছে হৃদি খুঁজি সুধা।
আছে মৃত্যু—চাহি অমরতা।

আছে দুঃখ, আছে ভ্রান্তি, আছে সুখ, আছে শ্রান্তি,
আছে ত্যাগ, আছে আহরণ;
তুমি সাগরের প্রায় পারিবে কি ঝটিকায়
উঠিতে পড়িতে আমরণ।

(২)

আজি করে কর দিয়া বুঝিছ আমারে প্রিয়া ?
বুঝিছ কি মন প্রাণ সব।
নহে মৃৎ, নহে শূন্য, নহে পাপ নহে পুণ্য,—
আত্মায় আত্মার অনুভব।

বুঝিছ কি এ আনন্দ—এত আলো, এত ছন্দ,
এত গন্ধ, এত গীতিগান।
কত জন্ম-মৃত্যু দিয়া, কত স্বর্গ-মর্ত্য নিয়া
করি আজ তোমারে আহ্বান।

বিস্ময়ে কাতর চক্ষে হেরো এ কম্পিত বক্ষে
কত শোভা—কত ধ্বংস, প্রিয়া।
শত শত ভগ্ন স্তূপ—কী বিরাট— অপরূপ—
জন্ম-জন্ম আশা-স্মৃতি নিয়া।

চিত্রে শিল্পে কাব্যে গানে মগন তোমার ধ্যানে
তুচ্ছ করি' কালের গরিমা।
পাষাণে পাষাণে রেখা—তোমার প্রণয়-লেখা,
মর জড়ে অমর মহিমা।

(৩)

আসে সন্ধ্যা মৃদুগতি, আকাশ কোমল অতি,
জল স্থল নিস্পন্দ নির্বাক,
পশু পক্ষী গেছে ফিরে, ফুটে তারা ধীরে ধীরে,
শ্রান্ত ধরা—শ্লথ বাহু-পাক।

এসো, এ হৃদয়ে মম, অস্ফুট চন্দ্রিকা সম,
প্রেমে স্তব্ধ, স্নিগ্ধ করুণায়।
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসমতা, অক্ষমতা
জড়ায়ে—ছড়ায়ে আপনায়।

লয়ে প্রেম-সুধারাশি এসো দেবী, এসো দাসী,
এসো সখী, এসো প্রাণপ্রিয়া।
এসো, সুখ-দুঃখ-দূরে, জন্ম-মৃত্যু ভেঙ্গে চুরে,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এবার ফিরাও মোরে

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ন তরুচ্ছায়ে
দূর বনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্তবায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ্ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা। কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি'
জাগাতে জগৎ-জনে। কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন্ অন্ধকারা মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়। স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি' করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লানমুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি',
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি',
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি' কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। (এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা) ডাকিয়া বলিতে হবে,
মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ-কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে॥

কবি, তবে উঠে এসো, যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি॥

এবার ফিরাও মোরে লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী, দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায়

রেখো না বসায়ে। দিন যায়, সন্ধ্যা হয়ে আসে।
অন্ধকারে ঢাকে দিশি, নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন। বাহিরিনু হেথা হতে
উন্মুক্ত অম্বরতলে, ধূসরপ্রসর রাজপথে
জনতার মাঝখানে। কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও,
আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও।
বলো মোরে নাম তব, আমারে কোরো না অবিশ্বাস।
সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গীহীন রাত্রি দিন, তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর, তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ,
বক্ষে জ্বলে ক্ষুধানল। যে দিন জগতে চ'লে আসি,
কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি।
বাজাতে বাজাতে তাই মুগ্ধ হয়ে আপনার সুরে
দীর্ঘ দিন দীর্ঘ রাত্রি চলে গেনু একান্ত সুদূরে
ছাড়ায়ে সংসার সীমা। সে বাঁশিতে শিখেছি যে সুর
তাহারি উল্লাসে যদি গীতশূন্য অবসাদপুর
ধ্বনিয়া তুলিতে পারি, মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীতে
কর্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে
শুধু মুহূর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি';—তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লভিবে নির্বাণ॥

কী গাহিবে, কী শুনাবে, বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি', তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে, জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।—কে সে। জানি না কে, চিনি নাই তারে,
শুধু এইটুকু জানি তারি লাগি' রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
সংকট আবর্তমাঝে, দিয়াছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি। মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব প্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি' জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন।
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম অর্ঘ্য উপহারে
ভক্তিভরে জন্ম শোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি' প্রাণ। শুনিয়াছি তারি লাগি'
রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ দহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাঙ্কুর, করিয়াছে তারে অবিশ্বাস
মূঢ় বিজ্ঞজনে, প্রিয়জন করিয়াছে পরিহাস

অতিপরিচিত অবজ্ঞায়, গেছে সে করিয়া ক্ষমা
নীরবে করুণ নেত্রে, অন্তরে বহিয়া নিরুপমা
সৌন্দর্য প্রতিমা। তারি পদে, মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি তাহারি মহান
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে,
তাহারি অঞ্চলপ্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে,
তারি বিশ্ববিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেমমূর্তিখানি
বিকাশে পরমক্ষণে প্রিয়জনমুখে। শুধু জানি
সে বিশ্বপ্রিয়ার প্রেমে ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব অসম্মান,
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নতমস্তক উচ্চে তুলি'
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্ক-তিলক। তাহারে অন্তরে রাখি'
জীবন কণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী,
সুখে দুঃখে ধৈর্য ধরি', বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতিদিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি'
সুখী করি' সর্বজনে। তার পরে দীর্ঘ পথ শেষে
জীবযাত্রা অবসানে ক্লান্ত পদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশ্যে
দুঃখহীন নিকেতনে। প্রসন্ন বদনে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্তকণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্মপরশনে শান্ত হবে সর্ব দুঃখ গ্লানি
সব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি' দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুচির সঞ্চিত আশা সমুখে করিয়া উদ্ঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা,
তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্ব প্রেমতৃষা॥

দুঃসময়

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্ দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥
এ নহে মুখর বন-মর্মর গুঞ্জিত,
এ যে অজাগর-গরজে সাগর ফুলিছে।
এ নহে কুঞ্জ কুন্দ-কুসুমরঞ্জিত,
ফেন-হিল্লোল কল-কল্লোলে দুলিছে।
কোথা রে সে তীর ফুল-পল্লব-পুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়-শাখা।
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

এখনো সমুখে রয়েছে সুচির শর্বরী,
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত-অচলে।
বিশ্ব জগৎ নিশ্বাসবায়ু সম্বরি',
স্তব্ধ আসনে প্রহর গনিছে বিরলে।
সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি'
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥
ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি' অঙ্গুলি
ইঙ্গিত করি' তোমা পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি'
শত তরঙ্গে তোমা পানে উঠে ধাইয়া।
বহুদূর তীরে কা'রা ডাকে বাঁধি' অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ মিনতি-মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥
ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা ব'সে ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুল-শেজ-রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহা নভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-আঁকা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেবতার গ্রাস

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর-সংগমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি'
কত বাল বৃদ্ধ নরনারী, নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে ॥

পুণ্য-লোভাতুর
মোক্ষদা কহিল আসি, "হে দাদাঠাকুর,
আমি তব হব সাথী।" বিধবা যুবতী,
দু'খানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে। অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো। "স্থান কোথা আর"
মৈত্র কহিলেন তারে। "পায়ে ধরি তব,"
বিধবা কহিল কাঁদি', "স্থান করি লব
কোনোমতে একধারে।" ভিজে গেল মন,
তবু দ্বিধাভরে তারে শুধাল ব্রাহ্মণ,
"নাবালক ছেলেটির কী করিবে তবে।"
উত্তর করিলা নারী, "রাখাল, সে র'বে
আপন মাসির কাছে। তার জন্ম পরে
বহুদিন ভুগেছিনু সূতিকার জ্বরে,
বাঁচিব ছিল না আশা, অন্নদা তখন
আপন শিশুর সাথে দিয়ে তারে স্তন
মানুষ করেছে যত্নে, সেই হতে ছেলে
মাসির আদরে আছে মার কোল ফেলে।

দুরন্ত মানে না কারে, করিলে শাসন
মাসি আসি' অশ্রুজলে ভরিয়া নয়ন
কোলে তারে টেনে লয়। সে থাকিবে সুখে
মার চেয়ে আপনার মাসিমার বুকে ॥"
সম্মত হইল বিপ্র। মোক্ষদা সত্বর
প্রস্তুত হইল বাঁধি' জিনিসপত্তর,
প্রণমিয়া গুরুজনে, সখীদলবলে
ভাসাইয়া বিদায়ের শোক-অশ্রুজলে।
ঘাটে আসি' দেখে, সেথা আগেভাগে ছুটি'
রাখাল বসিয়া আছে তরী 'পরে উঠি'
নিশ্চিন্ত নীরবে। "তুই হেথা কেন ওরে,"
মা শুধাল, সে কহিল, "যাইব সাগরে।"
"যাইবি সাগরে, আরে, ওরে দস্যু ছেলে,
নেমে আয়।" পুনরায় দৃঢ় চক্ষু মেলে
সে কহিল দুটি কথা—"যাইব সাগরে।"
যত তার বাহু ধরি' টানাটানি করে
রহিল সে তরণী আঁকড়ি'। অবশেষে
ব্রাহ্মণ করুণ স্নেহে কহিলেন হেসে,
"থাক্ থাক্ সঙ্গে থাক্।" মা রাগিয়া বলে,
"চল্ তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।"
যেমনি সে কথা গেল আপনার কানে
অমনি মায়ের বক্ষ অনুতাপবাণে
বিঁধিয়া কাঁদিয়া উঠে। মুদিয়া নয়ন
"নারায়ণ নারায়ণ" করিল স্মরণ।
পুত্রে নিল কোলে তুলি'। তার সর্বদেহে
করুণ কল্যাণ হস্ত বুলাইল স্নেহে।

মৈত্র তারে ডাকি' ধীরে চুপি চুপি কয়,
"ছি ছি ছি, এমন কথা বলিবার নয়।"
রাখাল যাইবে সাথে স্থির হোলো কথা,
অন্নদা লোকের মুখে শুনি' সে বারতা
ছুটে আসি বলে, "বাছা, কোথা যাবি ওরে।"
রাখাল কহিল হাসি', "চলিনু সাগরে,
আবার ফিরিব মাসি।" পাগলের প্রায়
অন্নদা কহিল ডাকি', "ঠাকুর মশায়
বড়ো যে দুরন্ত ছেলে রাখাল আমার,
কে তাহারে সামালিবে। জন্ম হতে তার
মাসি ছেড়ে বেশিক্ষণ থাকেনি কোথাও,
কোথা এরে নিয়ে যাবে, ফিরে দিয়ে যাও।"
রাখাল কহিল, "মাসি, যাইব সাগরে
আবার ফিরিব আমি।" বিপ্র স্নেহস্বরে
কহিলেন, "যতক্ষণ আমি আছি ভাই,
তোমার রাখাল লাগি' কোনো ভয় নাই।
এখন শীতের দিন শান্ত নদীনদ;
অনেক যাত্রীর মেলা, পথের বিপদ
কিছু নাই, যাতায়াতে মাস দুই কাল,
তোমারে ফিরায়ে দিব তোমার রাখাল।"
শুভক্ষণে দুর্গা স্মরি' নৌকা দিল ছাড়ি'।
দাঁড়ায়ে রহিল ঘাটে যত কুলনারী
অশ্রুচোখে। হেমন্তের প্রভাত-শিশিরে
ছলছল করে গ্রাম চূর্ণী নদীতীরে।
যাত্রীদল ফিরে আসে, সাঙ্গ হোলো মেলা।
তরণী তীরেতে বাঁধা অপরাহ্ন বেলা

জোয়ারের আশে। কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
মাসির কোলের লাগি'। জল, শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছলভরা, তুলি' লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রবসহা আনন্দভবন
শ্যামল কোমলা। যেথা যে-কেহই থাকে
অদৃশ্য দুবাহু মেলি' টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্ত-বিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ পানে।

চঞ্চল বালক আসি' প্রতি ক্ষণে ক্ষণে
অধীর উৎসুককণ্ঠে শুধায় ব্রাহ্মণে,
"ঠাকুর, কখন্ আজি আসিবে জোয়ার।"
সহসা স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার
দুই কূল চেতাইল আশার সংবাদে।
ফিরিল তরীর মুখ; মৃদু আর্তনাদে
কাছিতে পড়িল টান, কলশব্দ গীতে
সিন্ধুর বিজয়-রথ পশিল নদীতে;

আসিল জোয়ার। মাঝি দেবতারে স্মরি'
ত্বরিত উত্তরমুখে খুলে দিল তরী।
রাখাল শুধায় আসি' ব্রাহ্মণের কাছে,
"দেশে পঁহুছিতে আর কতদিন আছে।"

সূর্য অস্ত না যাইতে, ক্রোশ দুই ছেড়ে
উত্তর বায়ুর বেগ ক্রমে উঠে বেড়ে।
রূপনারানের মুখে পড়ি' বালুচর
সংকীর্ণ নদীর পথে বাধিল সমর
জোয়ারের স্রোতে আর উত্তর সমীরে
উত্তাল উদ্দাম। "তরণী ভিড়াও তীরে,"
উচ্চকণ্ঠে বারংবার কহে যাত্রীদল।
কোথা তীর, চারিদিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে, এক দিকে যায় দেখা
অতি দূর তটপ্রান্তে নীল বনরেখা।
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি'
উদ্ধত বিদ্রোহভরে। নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ়সম। তীব্র শীত পবনের সনে
মিশিয়া ত্রাসের হিম নরনারীগণে
কাঁপাইছে থরহরি। কেহ হতবাক,
কেহ বা ক্রন্দন করে ছাড়ি' ঊর্ধ্বডাক,

ডাকি' আত্মজনে। মৈত্র শুষ্ক পাংশুমুখে
চক্ষু মুদি' করে জপ। জননীর বুকে
রাখাল লুকায়ে মুখ কাঁপিছে নীরবে।
তখন বিপন্ন মাঝি ডাকি কহে সবে,
"বাবারে দিয়েছে ফাঁকি তোমাদের কে'
যা মেনেছে দেয় নাই তাই এত ঢেউ,
অসময়ে এ তুফান। শুন এই বেলা,
করহ মানৎ রক্ষা, করিয়ো না খেলা,
ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।" যার যত ছিল
অর্থ বস্ত্র যাহা কিছু জলে ফেলি দিল
না করি' বিচার। তবু তখনি পলকে
তরীতে উঠিল জল দারুণ ঝলকে।
মাঝি কহে পুনর্বার,—"দেবতার ধন
কে যায় ফিরায়ে লয়ে এই বেলা শোন্।"
ব্রাহ্মণ সহসা উঠি কহিলা তখনি
মোক্ষদারে লক্ষ্য করি', "এই সে রমণী
দেবতারে সঁপি দিয়া আপনার ছেলে
চুরি করে নিয়ে যায়।" "দাও তারে ফেলে"
একবাক্যে গর্জি' উঠে তরাসে নিষ্ঠুর
যাত্রী সবে। কহে নারী, "হে দাদাঠাকুর,
রক্ষা করো, রক্ষা করো।" দুই দৃঢ় করে
রাখালেরে প্রাণপণে বক্ষে চাপি' ধরে।
ভৎর্সিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,
"কেরে তোর রক্ষাকর্তা; রোষে নিশ্চেতন
মা হয়ে আপন পুত্র দিলি দেবতারে,
শেষকালে আমি রক্ষা করিব তাহারে;

শোধ্ দেবতার ঋণ, সত্য ভঙ্গ ক'রে
এতগুলি মানুষ কি ডুবাবি সাগরে।"

মোক্ষদা কহিল, "অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে, ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হোলো? সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝোনি ঠাকুর,
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা,
শোনোনি কি জননীর অন্তরের কথা।"
বলিতে বলিতে যত মিলি' মাঝি দাঁড়ি
বল্ করি' রাখালেরে নিল ছিঁড়ি' কাড়ি'
মার বক্ষ হতে। মৈত্র মুদি' দুই আঁখি
ফিরায়ে রহিল মুখ কানে হাত ঢাকি',
দন্তে দন্ত চাপি' বলে। কে তাঁরে সহসা
মর্মে মর্মে আঘাতিল বিদ্যুতের কশা,
দংশিল বৃশ্চিক দংশ। "মাসি, মাসি, মাসি"
বিন্ধিল বহ্নির শলা রুদ্ধ কর্ণে আসি'
নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাক।
চীৎকারি' উঠিল বিপ্র "রাখ্ রাখ্ রাখ্।"
চকিতে হেরিল চাহি' মূর্ছি আছে প'ড়ে
মোক্ষদা চরণে তাঁর। মুহূর্তের তরে
ফুটন্ত তরঙ্গ মাঝে মেলি' আর্ত চোখ
"মাসি" বলি' ফুকারিয়া মিলাল বালক
অনন্ত তিমির-তলে। শুধু ক্ষীণ মুঠি
বারেক ব্যাকুল বলে ঊর্ধ্বপানে উঠি'

আকাশে আশ্রয় খুঁজি' ডুবিল হতাশে।
"ফিরায়ে আনিব তোরে" কহি' ঊর্ধ্বশ্বাসে—
ব্রাহ্মণ মুহূর্তমাঝে ঝাঁপ দিল জলে।
আর উঠিল না। সূর্য গেল অস্তাচলে॥

সুপ্রভাত

রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি
 এসেছে দুয়ার ভেদিয়া;
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ
 স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।
ভাবিতেছিলাম উঠি কি না উঠি,
অন্ধতামস গেছে কি না ছুটি';
রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
 তন্দ্রা-জড়িমা মাজিয়া।
এমন সময়ে, ঈশান তোমার
 বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।

বাজে রে গরজি বাজে রে
দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে
 দীপ্ত গগন মাঝে রে।
চমকি জাগিয়া পূর্ব ভুবন
 রক্ত বদন লাজে রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ,
      ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী ;
রুদ্র-বীণায় এই কি বাজিল
      সুপ্রভাতের রাগিণী।
মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে,
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে।
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
      অমানিশা গেল ফাটিয়া
তোমার খড়্গ আঁধার মহিষে
      দুখানা করিল কাটিয়া।

ব্যথায় ভুবন ভরিছে ;
ঝর ঝর করি' রক্ত-আলোক
            গগনে-গগনে ঝরিছে ;
কেহ বা জাগিয়া উঠিছে কাঁপিয়া
            কেহ বা স্বপনে ডরিছে।
তোমার শ্মশান-কিঙ্কর-দল
            দীর্ঘ নিশায় ভুখারী,
শুষ্ক অধর লেহিয়া-লেহিয়া
            উঠিছে ফুকারি'-ফুকারি'।
অতিথি তারা যে আমাদের ঘরে,
করিছে নৃত্য প্রাঙ্গণ-পরে,
খোলো খোলো দ্বার, ওগো গৃহস্থ,
            থেকো না থেকো না লুকায়ে,—
যার যাহা আছে আনো বহি আনো,
            সব দিতে হবে চুকায়ে।

ঘুমায়ো না আর কেহ রে।
হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাণ্ড ভরিয়া দেহ রে।
ওরে দীন প্রাণ, কী মোহের লাগি'
রেখেছিস মিছে স্নেহ রে।
উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
"ভয় নাই, ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"
হে রুদ্র, তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি' দাও স্বামী,
মরণ-নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয় ডমরু বাজাব।
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাব।
এসেছে প্রভাত এসেছে।
তিমিরান্তক শিব-শঙ্কর
কী অট্টহাস হেসেছে।
যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে
ভীম আনন্দে ভেসেছে॥
জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়,
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি' জয়।
ভালোই হয়েছে ঝঞ্ঝার বায়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভালোই হয়েছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে,—
মিলন-যজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে
বজ্রশিখার দাহনে।
তিমির রাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে,
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।

হতভাগ্যের গান

কিসের তরে অশ্রু ঝরে কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি
আমরা দুখের বক্রমুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয় বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

হে অলক্ষ্মী রুক্ষকেশী, তুমি দেবী অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি নাহি জানো ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা নাইকো তাহে প্রতারণা,
টানো যখন মরণ ফাঁসি বলোনাকো মিষ্টভাষ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
ধরার যারা সেরা সেরা মানুষ তারা তোমার ঘরে।
তাদের কঠিন শয্যাখানি তাই পেতেছ মোদের তরে।
আমরা বরপুত্র তব, যাহাই দিবে তাহাই লব,
তোমায় দিব ধন্যধ্বনি মাথায় বহি' সর্বনাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা লক্ষ্মীছাড়ার সিংহাসনে।
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধভালে প্রলয়শিখা দিক মা এঁকে তোমার টীকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহারা জীর্ণ কন্থা ছিন্নবাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
লুকোক তোমার ডঙ্কা শুনে কপট সখার শূন্য হাসি;
পালাক ছুটে পুচ্ছ তুলে মিথ্যা চাটু মক্কা কাশী।
আত্মপরের প্রভেদ-ভোলা জীর্ণ দুয়োর নিত্য খোলা,
থাকবে তুমি থাকব আমি সমানভাবে বারো মাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
শঙ্কা তরাস লজ্জা শরম চুকিয়ে দিলেম স্তুতি-নিন্দে।
ধুলো, সে তোর পায়ের ধুলো, তাই মেখেছি ভক্তবৃন্দে।
আশারে কই, "ঠাকুরাণী, তোমার খেলা অনেক জানি,
যাহার ভাগ্যে সকল ফাঁকি তারেও ফাঁকি দিতে চাস।"
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মৃত্যু যেদিন বলবে "জাগো প্রভাত হোলো তোমার রাতি,"
নিবিয়ে যাব আমার ঘরের চন্দ্রসূর্য দুটো বাতি।
আমরা দোঁহে ঘেঁষাঘেঁষি চিরদিনের প্রতিবেশী,
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ,
বিদায় কালে অদৃষ্টেরে করে যাব পরিহাস।

হিমালয়

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ অভ্রভেদী তোমার সংগীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড় পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কী জানি কী বাণীর সন্ধানে।
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষ প্রান্তে উঠি' আপনার
সহসা মুহূর্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর—সামগীত শব্দহারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণী ধারা।

হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দম অগ্নিতাপ বেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ।
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজ মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া।

কল্যাণী

বিরল তোমার ভবনখানি পুষ্পকানন মাঝে,
হে কল্যাণী নিত্য আছ আপন গৃহকাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি আকুল হর্ষভরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে॥

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে, পূজার সাজি ভরি',
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির বরণডালা ধরি'।
সদা তোমার ঘরের মাঝে একটি নীরব শঙ্খ বাজে,
কাঁকন দুটির মঙ্গল গীত উঠে মধুর স্বরে॥

রূপসীরা তোমার পায়ে রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায় পরায় বরমালা।
ভালে তোমার আছে লেখা পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি হাসে চোখের 'পরে॥

তোমার নাহি শীতবসন্ত, জরা কি যৌবন;
সর্বঋতু সর্বকালে তোমার সিংহাসন।
নিভেনাকো প্রদীপ তব, পুষ্প তোমার নিত্য নব,
অচলাশ্রী তোমায় ঘেরি' চির বিরাজ করে॥

নদীর মতো এসেছিলে গিরিশিখর হতে,
নদীর মতো সাগর পানে চলো অবাধ স্রোতে।
একটি গৃহে পড়ছে লেখা সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্য শীতল তীর্থ সলিল ঝরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তোমার শান্তি পান্থজনে ডাকে গৃহের পানে ;
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্য কুঞ্জবনে কত অধীর সমীরণে,
কত যে ফুল, কত আকুল মুকুল খসে পড়ে ॥

বীরপুরুষ

মনে করো যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্‌কিতে মা, চ'ড়ে
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগবগিয়ে তোমার পাশে পাশে,
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে ॥

সন্ধ্যে হোলো সূর্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়াদিঘির মাঠে।
ধূ ধূ করে যেদিক পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ, ভাবছ এলেম কোথা।
আমি বলছি, ভয় কোরো না মাগো
ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা ॥

চোর কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।
গোরুবাছুর নাইকো কোনোখানে
সন্ধ্যে হোতেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্ছি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো,
তুমি যেন বললে আমায় ডেকে,
"দিঘির ধারে ঐ যে কিসের আলো॥"

এমন সময় "হা রে রে রে রে রে",
ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে।
তুমি ভয়ে পাল্‌কিতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ করছ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটাবনে,
পাল্‌কি ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো।
আমি যেন তোমায় বলছি ডেকে,
"আমি আছি ভয় কেন মা করো॥"

হাতে-লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কানে তাদের গোঁজা জবাব ফুল।
আমি বলি, "দাঁড়া খবরদার,
এক পা কাছে আসিস যদি আর
এই চেয়ে দেখ্‌ আমার তলোয়ার,
টুকরো করে দেব তোদের সেরে।"
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে
চেঁচিয়ে উঠল, "হারে রে রে রে রে॥"

তুমি বললে, "যাসনে খোকা ওরে,"
আমি বলি, "দেখো না চুপ ক'রে।"
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলাম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কী ভয়ানক লড়াই হোলো মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক-যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।

এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি ম'রে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বলছি এসে, "লড়াই গেছে থেমে,"
তুমি শুনে পাল্‌কি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে।
বলছ, "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দশাই হোত তা না হোলে॥"
রোজ কত কী ঘটে যাহা-তাহা,
এমন কেন সত্যি হয় না আহা।
ঠিক যেন এক গল্প হোত তবে,
শুনত যারা অবাক হোত সবে,
দাদা বল্‌ত, "কেমন ক'রে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে।"
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে,
"ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে॥"

অনাবশ্যক

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে,
আমি এসে শুধাই তারে ডেকে
"একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে,
আমার ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।"

গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল, "ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।"
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে॥
ভরা সাঁজে আঁধার হয়ে এলে
আমি এসে শুধাই ডেকে তারে
"তোমার ঘরে সকল আলো জেলে
এ দীপখানি সঁপিতে যাও কারে,
আমার ঘরে হয়নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।"

আমার মুখে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে রৈল চেয়ে ভুলে,

সে কহিল, "আমার এ যে আলো
আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।"
চেয়ে দেখি শূন্য গগন কোণে
প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে॥
অমাবস্যা আঁধার দুই পহরে
শুধাই আমি তাহার কাছে গিয়ে
"ওগো তুমি চলেছ কার তরে
প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে,
আমার ঘরে হয়নি প্রদীপ জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।"

অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক মোরে দেখলে চেয়ে তবে,
সে কহিল, "এনেছি এই আলো
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।"
চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে
দীপখানি তার জ্বলে অকারণে॥

বলাকা

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হোলো, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার

এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হোলো সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট ক'রি',
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।

সহসা শুনিনু সেইক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।
উঠিল শিহরি'
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার-বন ॥

মনে হোলো এ পাখার বাণী
দিল আনি'

শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হোতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'
সুদূরের লাগি',
হে পাখা বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
"হেথা নয় হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।"

হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার-নিচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি·আজি
এই গিরিরাজি,

এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে,
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনেরাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখি ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।"

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে চলছিল সাবধানী॥

আমি ছিলাম ছাতে
তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে
দেখতে গেলেম ছুটে।
সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তারে, "কী হয়েছে বামি ;"
সে কেঁদে কয় নিচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি।"

তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হোলো আকাশ পানে চেয়ে
আমার বামির মতোই যেন অম্‌নি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি॥"

শিশুর জীবন

ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস
আছে কি এক ফোঁটা,
তাই তো এমন বুড়ো হয়েই মরি।
তিলে তিলে জমাই কেবল,
জমাই এটা ওটা,
পলে পলে বাক্স বোঝাই করি।

কালকেদিনের ভাবনা এসে
আজ দিনেরে মারলে ঠেসে
কাল তুমি ফের পরদিনের বোঝা।
সাধের জিনিস ঘরে এনেই
দেখি, এনে ফল কিছু নেই,
খোঁজের পরে আবার চলে খোঁজা।

ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত
দেখতে না পাই পথ,
তাকিয়ে থাকি পরশু দিনের পানে,
ভবিষ্যৎ তো চিরকালই
থাকবে ভবিষ্যৎ,
ছুটি তবে মিলবে বা কোন্‌খানে।
বুদ্ধি-দীপের আলো জ্বালি,
হাওয়ায় শিখা কাঁপছে খালি,—
হিসেব ক'রে পা টিপে পথ হাঁটি।
মন্ত্রণা দেয় কত জনা,
সূক্ষ্ম বিচার বিবেচনা,
পদে-পদে হাজার খুঁটিনাটি।

শিশু হবার ভরসা আবার
জাগুক আমার প্রাণে,
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,
ভবিষ্যতের মুখোসখানা
খসাব এক-টানে,
দেখব তারেই বর্তমানের কালে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছাদের কোণে পুকুর-পারে
জানব নিত্য অজানারে
মিশিয়ে র'বে অচেনা আর চেনা ;
জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরি হবে আমার খেলা,
সুখ র'বে মোর বিনা মূল্যেই কেনা।

বড়ো হবার দায় নিয়ে, এই
বড়োর হাটে এসে
নিত্য চলে ঠেলাঠেলির পালা।
যাবার বেলায় বিশ্ব আমার
বিকিয়ে দিয়ে শেষে
নেব কি হায় ফাঁকা কথার ডালা।
কোন্‌টা শস্তা, কোন্‌টা দামী
ওজন করতে গিয়ে, আমি
বেলা আমার বইয়ে দেব দ্রুত,
সন্ধ্যা যখন আঁধার হবে
হঠাৎ মনে লাগবে তবে
কোনোটাই না হোলো মনঃপূত।

বাল্য দিয়ে যে-জীবনের
আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হোক না তাহা সারা।
জলে স্থলে সঙ্গ আবার,
পাক্ না বাঁধন-হীন
ধুলায় ফিরে আসুক না পথহারা।

সম্ভাবনার ডাঙা হতে
অসম্ভবের উতল স্রোতে
দিই না পাড়ি স্বপন-তরী নিয়ে।
আবার মনে বুঝি না এই,
বস্তু ব'লে কিছুই তো নেই
বিশ্ব গড়া যা-খুশি তাই দিয়ে।

প্রথম যে দিন এসেছিলেম
নবীন পৃথ্বীতলে
রবির আলোয় জীবন মেলে দিয়ে,
সে যেন কোন্ জগৎ-জোড়া
ছেলেখেলার ছলে,
কোথা থেকে কেই-বা জানে কী এ।
শিশির যেমন রাতে রাতে,
কে যে তা'রে লুকিয়ে গাঁথে,
ঝিল্লি বাজায় গোপন ঝিনিঝিনি।
ভোর বেলা যেই চেয়ে দেখি
আলোর সঙ্গে আলোর এ কি
ইশারাতে চলছে চেনাচিনি।

সেদিন মনে জেনেছিলেম
নীল আকাশের পথে
ছুটির হাওয়ায় ঘুর লাগাল বুঝি।
যা-কিছু সব চলেছে ঐ
ছেলেখেলার রথে
যে-যার আপন দোসর খুঁজি' খুঁজি'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাছে খেলা ফুল-ভরানো,
ফুলে খেলা ফল-ধরানো,
ফলের খেলা অঙ্কুরে অঙ্কুরে।
স্থলের খেলা জলের কোলে,
জলের খেলা হাওয়ার দোলে,
হাওয়ার খেলা আপন বাঁশির সুরে।

ছেলের সঙ্গে আছ তুমি
নিত্য ছেলেমানুষ,
নিয়ে তোমার মাল-মস্‌লার ঝুলি।
আকাশেতে ওড়াও তোমার
কত রকম ফানুষ
মেঘে বোলাও রং-বেরঙের তুলি।
সেদিন আমি আপন মনে
ফিরেছিলেম তোমার সনে,
খেলেছিলেম হাত মিলিয়ে হাতে।
ভাসিয়েছিলেম রাশি রাশি
কথায় গাঁথা কান্না-হাসি
তোমারি সব ভাসান্‌-খেলার সাথে।

ঋতুর তরী বোঝাই করো
রঙিন ফুলে ফুলে,
কালের স্রোতে যায় তা'রা সব ভেসে।
আবার তা'রা ঘাটে লাগে
হাওয়ায় দুলে দুলে
এই ধরণীর কূলে কূলে এসে।

মিলিয়েছিলেম বিশ্ব-ডালায়
তোমার ফুলে আমার মালায়,
সাজিয়েছিলেম ঋতুর তরণীতে ;
আশা আমার আছে মনে
বকুল কেয়া শিউলি সনে
ফিরে ফিরে আসব ধরণীতে।

সেদিন যখন গান গেয়েছি
আপন মনে নিজে,
বিনা কাজে দিন গিয়েছে চলে,
তখন আমি চোখে তোমার
হাসি দেখেছি যে,
চিনেছিলে আমায় সাথী ব'লে।
তোমার ধুলো তোমার আলো
আমার মনে লাগত ভালো,
শুনেছিলেম উদাস-করা বাঁশি।
বুঝেছিলে সে ফাল্গুনে
আমার সে গান শুনে শুনে
তোমারো গান আমি ভালবাসি।

দিন গেল ঐ মাঠে বাটে,
আঁধার নেমে প'ল ;
এপার থেকে বিদায় মেলে যদি
তবে তোমার সন্ধ্যেবেলার
খেয়াতে পাল তোলো,
পার হব এই হাটের ঘাটের নদী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবার ওগো শিশুর সাথী
শিশুর ভুবন দাও তো পাতি'
করব খেলা তোমায় আমায় একা।
চেয়ে তোমার মুখের দিকে
তোমায়, তোমার জগৎটিকে
সহজ চোখে দেখব সহজ দেখা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব দ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়,
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-পরে।
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্রকরে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে,
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টিকা; কবি আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি' তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি'

উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সংগীত তব দ্বারে।

জানি তুমি প্রাণ খুলি'
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তা'রে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত; যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তা'র পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নি বাণ সম;
তুমি সত্য বীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,
করুণ কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রী-পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা, আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়েছ সংগীত তব, কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেছ আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গ ভূমে
যে-তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নব জীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি', অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানা সূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি।

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে ক'রে গেলে দান
দূর কালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ তা'রা যা হারাল তা'র সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা। বন্ধু-মিলনের দিনে বারংবার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হ'তে হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি' উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আসো নাই ব'লে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি' দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই, আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈলের তলে আজি

১০

নবসূর্য-বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে। সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রু সাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি, আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা; কতবার তারি সারি-গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুন আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি'
ঝ'রে-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ-বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়া-'পরে করি' ভর,
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে;
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখি-জাগা বসন্ত-প্রভাতে;
নব মল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায়; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে; হেমন্তের দিনান্ত বেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি', সর্ব আবরণ করি' লীন
চিরন্তন হোলে তুমি, মর্ত্য কবি ; মুহূর্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দ-হীন সংগীত-ধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার, যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে কোন্ রূপে। যেমনি অপূর্ব হোক নাকো,
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখো
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি মর্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্য লোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা।

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা।
পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি'
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি'
দৈবাগত দিনে।
শুধু কি চাহিব শূন্যে, কেন নিজে নাহি লব চিনে'
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি' দৃঢ় বল্গা পাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি' পণ।
যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিণী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন
সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,
ফেলে দেব আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।
দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে।
তরঙ্গ গর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয় ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে
মাথার গুণ্ঠন খুলি' কব তারে, মর্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্রপাখির পক্ষে সেইক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি',
সপ্তর্ষি আলোক যবে যাবে তা'র পন্থা অনুমানি'।
হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত মাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হোক সে-নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে॥

প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা ব'লে গেল, ক্ষমা করো সবে, ব'লে গেল, ভালবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো।—
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে,
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি-ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,—
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে—
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে'॥

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাইতো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো॥

———

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নতুন কাল

কোন্ সে কালের কণ্ঠ হতে এসেছে এই স্বর—
"এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।"

অনেক বাণীর বদল হোলো, অনেক বাণী চুপ,
নতুন কালের নটরাজা নিল নতুন রূপ।
তখন যে সব ছেলেমেয়ে শুনেছে এই ছড়া,
তা'রা ছিল আরেক ছাঁদে গড়া।
প্রদীপ তা'রা ভাসিয়ে দিত পূজা আনত তীরে,
কী জানি কোন্ চোখে দেখত মকরবাহিনীরে।
তখন ছিল নিত্য অনিশ্চয়,
ইহকালের পরকালের হাজার রকম ভয়।
জাগ্‌ত রাজার দারুণ খেয়াল, বর্গি নাম্‌ত দেশে,
ভাগ্যে লাগ্‌ত ভূমিকম্প হঠাৎ এক নিমেষে।
ঘরের থেকে খিড়কি ঘাটে চলতে হোত ভয়,
লুকিয়ে কোথায় রাজদস্যুর চর।
আঙিনাতে শুন্‌ত পালাগান,
বিনা দোষে দেবীর কোপে সাধুর অসম্মান।
সামান্য ছুতায়
ঘরের বিবাদ গ্রামের শত্রুতায়
গুপ্ত চালের লড়াই যেত লেগে,
শক্তিমানের উঠত গুমর জেগে।

হারত যে তার ঘুচ্‌ত পাড়ায় বাস,
ভিটেয় চল্‌ত চাষ।
ধর্ম ছাড়া কারো নামে পাড়বে যে দোহাই
ছিল না সেই ঠাঁই।
ফিস্‌ফিসিয়ে কথা কওয়া সংকোচে মন ঘেরা,
গৃহস্থবৌ, জিব কেটে তার হঠাৎ পিছন ফেরা;
আল্‌তা পায়ে, কাজল চোখে, কপালে তার টিপ,
ঘরের কোণে জ্বালে মাটির দীপ।
মিনতি তার জলেস্থলে, দোহাই-পাড়া মন,
অকল্যাণের শঙ্কা সারাক্ষণ।
আয়ুলাভের তরে
বলির পশুর রক্ত শিশুর লাগায় ললাট 'পরে।
রাত্রিদিবস সাবধানে তার চলা,
অশুচিতার ছোঁয়াচ কোথায় যায় না কিছুই বলা।
ওদিকেতে মাঠে বাটে দস্যুরা দেয় হানা,
এদিকে সংসারের পথে অপদেব্‌তা নানা।
জানা কিংবা না-জানা সব অপরাধের বোঝা,
ভয়ে তারি হয় না মাথা সোজা।

এরি মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে উঠল কাহার স্বর—
"এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।"
সেদিনো সেই বইতেছিল উদার নদীর ধারা,
ছায়া-ভাসান দিতেছিল সাঁঝ-সকালের তারা।
হাটের ঘাটে জমেছিল নৌকো মহাজনী,
রাত না যেতে উঠেছিল দাঁড়-চালানো ধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্ত প্রভাত কালে
সোনার রৌদ্র পড়েছিল জেলেডিঙির পালে।
সন্ধ্যেবেলায় বন্ধ আসা-যাওয়া,
হাঁসবলাকার পাখার ঘায়ে চম্‌কেছিল হাওয়া।
ডাঙায় উন্নুন পেতে
রান্না চড়েছিল মাঝির বনের কিনারেতে।
শেয়াল ক্ষণে ক্ষণে
উঠতেছিল ডেকে ডেকে ঝাউয়ের বনে বনে।

কোথায় গেল সেই নবাবের কাল,
কাজির বিচার, শহর কোতোয়াল।
পুরাকালের শিক্ষা এখন চলে উজান-পথে,
ভয়ে-কাঁপা যাত্রা সে নেই বলদটানা রথে।
ইতিহাসের গ্রন্থে আরো খুলবে নতুন পাতা,
নতুন রীতির সূত্রে হবে নতুন জীবন গাঁথা।
যে হোক রাজা যে হোক মন্ত্রী কেউ র'বে না তা'রা,
বইবে নদীর ধারা,
জেলেডিঙি চিরকালের, নৌকো মহাজনী,
উঠবে দাঁড়ের ধ্বনি।
প্রাচীন অশথ আধা ডাঙায় জলের 'পরে আধা,
সারারাত্রি গুঁড়িতে তার পান্‌সি রইবে বাঁধা।
তখনো সেই বাজবে কানে যখন যুগান্তর—
"এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর।"

প্রণতি

প্রণাম আমি পাঠানু গানে
উদয়-গিরি-শিখর পানে
অস্তমহাসাগর তট হতে—
নবজীবন যাত্রাকালে
সেখান হতে লেগেছে ভালে
আশিস খানি অরুণ-আলোস্রোতে।
প্রথম সেই প্রভাত দিনে
পড়েছি বাঁধা ধরার ঋণে,
কিছু কি তার দিয়েছি শোধ করি'।
চিররাতের তোরণে থেকে
বিদায়বাণী গেলেম রেখে
নানা রঙের বাষ্প-লিপি ভরি'।

বেসেছি ভালো এই ধরারে
মুগ্ধ চোখে দেখেছি তারে
ফুলের দিনে দিয়েছি রচি' গান,
সে গানে মোর জড়ানো প্রীতি,
সে গানে মোর রহুক স্মৃতি,
আর যা আছে হউক অবসান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রোদের বেলা ছায়ার বেলা
করেছি সুখদুখের খেলা
সে খেলাঘর মিলাবে মায়াসম ;
অনেক তৃষ্ণা অনেক ক্ষুধা,
তাহারি মাঝে পেয়েছি সুধা,
উদয়গিরি প্রণাম লহ মম।

বরষ আসে বরষ শেষে
প্রবাহে তারি যায়রে ভেসে
বাঁধিতে যারে চেয়েছি চিরতরে।
বারেবারেই ঋতুর ডালি
পূর্ণ হয়ে হয়েছে খালি
মমতাহীন সৃষ্টিলীলা ভবে।
এ মোর দেহ পেয়ালাখানা
উঠেছে ভরি' কানায় কানা
রঙিন রসধারায় অনুপম।
একটুকুও দয়া না-মানি'
ফেলায়ে দেবে জানি তা জানি,—
উদয়গিরি তবুও নমো নম।

কখনো তার গিয়েছে ছিঁড়ে,
কখনো নানা সুরের ভিড়ে
রাগিণী মোর পড়েছে আধো চাপা।
ফাল্গুনের আমন্ত্রণে
জেগেছে কুঁড়ি গভীর বনে
পড়েছে ঝরি' চৈত্রবায়ে কাঁপা।

অনেক দিনে অনেক দিয়ে
ভেঙেছে কত গড়িতে গিয়ে
ভাঙন হোলো চরম প্রিয়তম,
সাজাতে পূজা করিনি ত্রুটি,
ব্যর্থ হোলে নিলেম ছুটি,
উদয়গিরি প্রণাম লহ মম।

স্বামী বিবেকানন্দ

সখার প্রতি

ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ, কৃপা পাত্র হয়ে কিবা ফল—
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
"দাও, দাও"—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।
ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, করো সখে এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি' কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সমুদ্রের প্রতি

(পুরীতে)

হে সমুদ্র, আমি আজি এইখানে বসি তব তীরে,
ঠিক তীরে নয়, এই সুপ্রশস্ত ঘরের বাহিরে,
বারান্দায়, আরাম-আসনে বসি' সুখে এই ক্ষণে,
'দুনিয়াটা মন্দ নয়' এই কথা ভাবিতেছি মনে।
হায় শুদ্ধ অন্নচিন্তা যদি না থাকিত, ও অন্ততঃ
দিবায় ছয়টি ঘণ্টা পরদাস্য না করিতে হোত ;
সে আরামাসনে বসি' নাসিকার অগ্রভাগ তুলি'
সংসারকে দেখাইতে পারিতাম জোরে বৃদ্ধাঙ্গুলি ;
ভুলিতাম দেশ, কাল, পাত্র, মর্মদুঃখ শত শত,
ধর্মনীতি, রাজনীতি, সামাজিক মিথ্যা দ্বন্দ্ব যত,
প্রভুর তাড়না, স্ত্রীর অভিমান, সন্তানের রোগ,
ও তার আনুষঙ্গিক অন্য অন্য নানা কর্মভোগ।
সত্যটি বলিলে লোকে চটে, তাই চেপে যাই সিন্ধু।
কিন্তু মনুষ্যত্বে আর ভক্তিশ্রদ্ধা নাই এক বিন্দু ;
দেখি সকলেই বেশ আপনার আহারটি খোঁজে,
আর সেটা পেতে হয় কী রকমে তাও বেশ বোঝে ;
কার কাছে কতখানি কী রকমে নিতে হয় কেড়ে,
'চেয়ে চিন্তে' 'ধরে বেঁধে' 'ফাঁকি দিয়ে' তাও বোঝে বেড়ে'।

—না না এ ভাষাটা কিছু বেশি গ্রাম্য হয়ে গেল ঐ হে।
কিন্তু গ্রাম্য কথাগুলো মাঝে মাঝে ভারি লাগসৈ হে।
ভারি অর্থপূর্ণ ;—নয় ?—হে সমুদ্র,—বলো ভাই, বলো,
মাফ কোরো কথাগুলো ; অশ্লীলটা না হোলেই হোলো ;
তোমার যে প্রাপ্য মান্য তার আমি করিব না হানি ;—
যারে যেটা দেয়—সেটা—রত্নাকর, আমি বেশ জানি।
শোনো এক কথা, তুমি বেড়াইছ সদা কারে খুঁজি ?
কাহারো যে তক্কা তুমি রাখোনাকো সেটা বেশ বুঝি ;
কিন্তু তাই ব'লে এই তোমার যে—'দিন রাত নাই'—
তর্জন গর্জন আর মত্ত খেলা ভালো হচ্ছে ভাই ?
কাহার উপরে ক্রুদ্ধ সেইটেই বলো নাহে খুলে ;
কেন ধেয়ে আসে ঐ শুভ্রফণা ফেনরাশি তুলে।
ধরণীর উপরে কি ক্রুদ্ধ। যে সে তব ভার্যা হয়ে,
তোমার ও রাক্ষসী স্বভাব ছেড়ে, ধরিছে হৃদয়ে
স্নেহময়ী মাতৃসমা, দীনা সেই, সহিষ্ণু সে নারী,
ধরিছে হৃদয়ে শস্যফল পুষ্প স্নিগ্ধ মিষ্টবারি,
পালিছে সন্তানগুলি ধীরে ধীরে সযতনে একমনে,
তোমার ও রুক্ষ বক্ষে এত প্রেম সহিবে কেমনে।
কিংবা তব স্বেচ্ছাচার প্রেমে বুঝি চায় রোধিবারে ;
উত্তালতরঙ্গভঙ্গে তাই ধাও বিচূর্ণিতে তারে ?
তাই গর্জ দস্যুবর ? ইচ্ছা বুঝি গিয়া তারে গ্রাসো,
ক্ষুধা-অন্ধ হিংস্র জন্তু সম তাই বুঝি ধেয়ে আসো
বার বার, বর্বর, ভাঙিতে তার অসহায় বুকে ?
—এত নির্যাতন, সিন্ধু। তবু যার বাণী নাহি মুখে।
শোনো। তুমি শুনি যে হে পৃথিবীর তিন পোয়া জুড়ে'
বসে আছ, তা কি ভালো। হাঁ হাঁ, বটে তুমি নও কুড়ে,

সেটা মানি ; শুধু ঘুরে অহোরাত্র বেড়াইছ টো টো,
নির্বিবাদে, বেখরচে, ইউরোপে আফ্রিকায় ছোটো,
তাও জানি। কিন্তু কোন্ কাজে লাগো, যাক দেখি শোনা ;
এত খানি নীল জল-রাশি বটে, কিন্তু সব লোনা।
দিন রাত ভাঙো শুধু বিশ্ব জুড়ে বসুধার তীর ;
বালুরাশি দিয়ে ঢাকো শস্যশ্যামলতা পৃথিবীর,
ক্রূর সম ঢেকে রাখো গিরিশৃঙ্গ তুঙ্গ কিংবা ক্ষুদ্র ;
—উপরেতে মোলায়েম, যেন কিছু জানো না সমুদ্র ;
একটু বাতাসে মত্ত ; ঝটিকায় দেখো না তো চক্ষে,
--অভাগা সে জাহাজ, যে সে সময়ে থাকে তব বক্ষে।
তুমি রত্নগর্ভ ? কিন্তু রাখো রত্নে দুর্গম গহ্বরে।
তুমি পোষো জলা-জীবে ? তারা কার উপকার করে।
তুমি ভীমপরাক্রম ? কিন্তু দেখি ব্যক্ত তাহা নাশে।
তুমি নীল বারিনিধি ? কিন্তু তাতে কার যায় আসে,
কী।—তুমি অপরিসীম ?—আকাশ তো তার চেয়ে বড়ো।
ও !—তুমি স্বাধীন ?—তবে আর কী আমার ঘাড়ে চড়ো।
তুমি যে হে গর্জিছই। চটো কেন। শুন পারাবার।
দুটো কথা বলি শোনো। তোমার যে ভারি অহংকার।
শোনো এক কথা বলি।—দিন রাত করিছ শোঁ শোঁ,
তোমার কি কাজ কর্ম নাই।—আহা চটো কেন। রোসো।
শুদ্ধ নিন্দাবাদী আমি ? তবে শোনো দুটো স্তুতিবাণী ;—
বলেছি "যা প্রাপ্য মান্য তাহা আমি করিব না হানি।"
না না ; তুমি ভাঙো বটে ; করো চূর্ণ যাহা পুরাতন ;
কিন্তু তুমি নবরাজ্য পুনরায় করিছ সৃজন ;
ব্যাপ্তি সম, কালসম, সৃজনের বীজমন্ত্র মতো,
এক হাতে নাশো তব, এক হাত গঠনে নিরত।

যুগে যুগে বহে যাও গম্ভীর কল্লোলি' নিরবধি,
ন্যায়সম নিঃসংকোচে নিজ কার্য সাধিছ জলধি।
তুমি গর্বী, তুমি অন্ধ ; তুমি বীর্যমত্ত ; তুমি ভীম ;
কিন্তু তুমি শান্ত ; প্রেমী ; তুমি স্নিগ্ধ ; নির্মল ; অসীম ;
অগাধ, অস্থির প্রেমে আসো তুমি বক্ষে ধরণীর,
বিপুল উচ্ছ্বাসে, মত্তবেগে দৈত্যসম তুমি বীর।
চাহ বক্ষে চাপিতে তাহারে ঘন গাঢ় আলিঙ্গনে,
বুঝ না সে ক্ষীণ দেহ অত প্রেম সহিবে কেমনে।
কিংবা তুমি বুঝি কোন্ যোগিবর, দূরে একমনা
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে কোন্ মহাযোগ করিছ সাধনা ;
ধরো তব বিশাল হৃদয়ে আকাশের গাঢ়তম
ঘন নীল ছায়ারাশি যোগিচিত্তে মোক্ষ আশাসম ;
কভু তুমি ধ্যানরত, মুদ্রিত নয়ন, স্থির প্রভু।
সমুত্থিত মুখে তব মেঘমন্দ্রে বেদগান কভু।
দাও অকাতরে নিজ পুণ্যরাশি যাহা বাষ্পাকারে,
প্রার্থনায়, উঠি' নীলাকাশে পুন পড়ে শতধারে,
দেবতার বরসম, প্লাবি' নদ নদী হ্রদহ্রদি
জাগাইয়া বসুধার শস্যপুষ্পরাজত্ব, বারিধি।
তুমি কভু বজ্রভাষী ; তুমি কভু শান্ত, মৌন, স্থির ;
অতল ; অপরিমেয় ; দিব্য ; সৌম্য ; উদার ; গম্ভীর ;
কল্লোলিয়া যাও সিন্ধু। চূর্ণ করো ক্ষুদ্রতার দম্ভ ;
ধৌত করো পদপ্রান্তে ভূধরের মহত্ত্বের স্তম্ভ ;
সৃষ্টির সে প্রেমান্ধ সংগীত তুমি যুগে যুগে গাও ;
যাও চিরকাল সমভাবে বীর কল্লোলিয়া যাও।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নন্দলাল

নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা' ক'রেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল, 'আ-হা-হা করো কী, করো কী, নন্দলাল।'
নন্দ বলিল, 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল।
আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ।'
তখন সকলে বলিল,—বাহবা বাহবা বাহবা বেশ।

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা।
সকলে বলিল, 'যাও না নন্দ, করো না ভায়ের সেবা।'
নন্দ বলিল, 'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কী।
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক';
তখন সকলে বলিল,—হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে, তা বটে, ঠিক।

নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির;
পড়িল ধন্য দেশের জন্যে নন্দ খাটিয়া খুন;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ।—
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল;
তখন সকলে বলিল,—বাহবা বাহবা নন্দলাল।

১১

নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি ;
নন্দ বলিল, 'আ-হা-হা, করো কী, করো কী, ছাড়ো না ছাই,
কী হবে দেশের, গলাটিপুনিতে আমি যদি মারা যাই ।
বলো ক' বিঘৎ নাকে দিব খৎ, যা বলো করিব তাহা' ;
তখন সকলে বলিল,—বাহবা বাহবা বাহবা বাহা ।

নন্দ বাড়ির হোত না বাহির, কোথা কী ঘটে কী জানি,
চড়িত না গাড়ি, কী জানি কখন উল্‌টায় গাড়িখানি,
নৌকা ফি সন্‌ ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিশন' হয় ;
হাঁটিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ি-চাপা-পড়া ভয় ;
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল ।
সকলে বলিল,—ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল ।

কামিনী রায়

পুত্রশোকে

১

তোমার দেহের সাথে হোলো ভস্মীভূত
আমার অগণ্য আশা । ভেবেছিনু মনে
আমার শ্মশানে আসি' তুমি সযতনে
বিছাইবে পুষ্পরাশি , ওরে প্রিয় সুত,
ভেবেছিনু অশ্রু তব, ভক্তি-রস-পূত,
অমর করিবে মোরে , তোমার জীবনে
ফুটিব সৌরভে নব, মানব-শ্রবণে
বাজিব নূতন সুরে, নব অর্থযুত ।

কামিনী রায়

আমার হৃদয়ক্ষেত্রে সুপ্ত বীজচয়
তোমার হৃদয়ে উপ্ত, হবে অঙ্কুরিত,
আমাতে রয়েছে যাহা না থাকারি সম,
তোমাতে উজ্জ্বল হয়ে বাড়াবে বিস্ময়
সকলের,—বিজলী সে হইছে স্ফুরিত
যথা অনুকূল পাত্রে। হায় স্বপ্ন মম।

২

আয় রে প্রভাতে নিতে মার আশীর্বাদ,
প্রাণাধিক, আজ যে রে জন্মদিন তোর ,
ষোড়শ কলায় পূর্ণ, সৌন্দর্য কৈশোর,
দাঁড়া আজ পুত্র, মিত্র। নিশার বিষাদ
মিশে যাক উষালোকে। যে মাতৃত্ব-স্বাদ
তুই দিলি এ জীবনে, সেই রসে ভোব
আমি ভুলিয়াছি শোক। আয় তুই মোর
চিব জীবনেব পুত্র, অনন্ত আহ্লাদ।
"দিয়ে কেড়ে নিলে" ব'লে করিনি কলহ
বিধাতার সনে আর। ছিলে যে ক'দিন
সেই ক'দিনের ভাগ্য তুলনা-বিহীন।
তুমি ছিলে তুমি আছ, আমি অহরহ
তোমারে পাইব পুত্র! সন্তান বিরহ
বড়োই কঠিন ব্যথা, বড়ো সে কঠিন।

ইন্দিরা দেবী

অভিমানী

হাসিখেলার অভিনয়ে অশ্রুজলে ঢাকি'
ভেবেছিলেম এমনি ক'রে তোমায় দেব ফাঁকি,
বুকে আমার যে স্বর বাজে—গুঞ্জরে যা মর্ম মাঝে,—
ভেবেছিলেম সুখের সাজে রাখব তারে ঢাকি'।
হাসি-খেলার মিথ্যা-ছলে তোমায় দিয়ে ফাঁকি।

প্রভাত যখন দ্বিপ্রহরে হোলো পরিণত,
তপ্ত বায়ু ঠেকল পায়ে অগ্নিকণার মতো,
দেহ যখন ক্লান্তি-ভরে, লুটিয়ে এল মাটির পরে,
চোখে যতই অশ্রু ঝরে গোপন করি তত—
তখন আমায় টানলে কোলে কোলের মেয়ের মতো।

তোমায় আমি শুধাইনি তো কোথায় আমার স্থান।
নয়নজলে চরণতলে ডাকাইনি তো বান।
বিজন পথে জানিয়ে ব্যথা, চাইনি তোমার সহায়তা,
তবু তুমি কেমন ক'রে শুনলে পেতে কান
আমার গহন বুকের কথা,—গোপন অভিমান ?

কেমন ক'রে ধরলে তুমি আমার প্রতারণা—
সেই কথাটি তোমার কাছে হয়নি কেবল শোনা।
কেমনে হে কোন্ ফাঁকে সে—তোমার হাসির বন্যা এসে
ভাসিয়ে নিলে আমায় হেসে—ঘুচিয়ে আনাগোনা।
কেমন ক'রে ধরলে কখন আমার প্রতারণা।

প্রিয়ম্বদা দেবী

আশাতীত

তোমায় পারি না ধরিতে, পারি না ধরিতে,
মনেতে মিশায়ে আপনা করিতে
ওরে আকাশের আলো,
তোমায় পারি না ধরিতে, পারি না ধরিতে,
যতই বাসি না ভালো।

তোমায় পারি না বাঁধিতে, পারি না বাঁধিতে,
নিত্য নবীন ছন্দে গাঁথিতে,
ওরে মোর ভালবাসা,
তোমায় পারি না বাঁধিতে, ভাবে রূপ দিতে,
তেমন নাহিকো ভাষা।

সাধনা

বক্ষে তব বক্ষ দিয়ে শুয়ে আছি আমি
হে ধরিত্রী জীবধাত্রী, নিত্য দিনযামি
মাতৃহৃদয়ের মোর ব্যাকুল স্পন্দন
প্রবাসী সন্তান লাগি নিয়ত ক্রন্দন
তারি লুপ্ত স্পর্শ তরে, করি' দাও লয়
বিপুল বক্ষের তব মহাশব্দময়
অনন্ত স্পন্দন মাঝে। শিখাও আমায়
সে পুণ্য রহস্য-মন্ত্র যার মহিমায়
প্রত্যেক নিমেষে সহি' বিয়োগ বেদন,
লক্ষ কোটি সন্তানের, প্রশান্ত বদন,
তবু ফুটাতেছ ফুল জ্বালিছ আলোক
উজলিয়া রাত্রি-দিন দ্যুলোক ভূলোক।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গৃহলক্ষ্মী

তখন আছিলে শুধু রূপে সমুজ্জ্বল ;
আজিকে তোমারে হেরি' সর্ব অমঙ্গল
ধীরে স'রে যায় দূরে ; মৌন প্রেমভরে
সকরুণ আঁখি অমিয় সেচন করে
অন্তর-নিভৃতে শতধারে ; হে প্রেয়সি,
গৃহলক্ষ্মীরূপে আজি তুমি মহীয়সী
আপন মহিমালোকে ; সংসারের মাঝে
ধ্রুবতারাসম তুমি সর্ব শুভ কাজে,
অয়ি অচঞ্চলে। পাতিয়াছ সিংহাসন
সর্বজন-মনোমাঝে গৌরবে আপন ;
ঘেরিয়াছে চারিধারে কত দুঃখ সুখ,
কত উন্মেষিত আশা, কত ম্লান মুখ।
সকল হৃদয়ভার বক্ষে লহ টানি'—
তাই তুমি, গৃহলক্ষ্মি, সকলের রানী।

অবসান

হে মোর সংগীত, তোর পতঙ্গের প্রাণ
এক বসন্তেই শুধু হোলো অবসান।
এক বেলা নৃত্য শুধু এক বেলা গান,
ছড়ায়ে রঙিন পাখা কুসুমে শয়ান।

একটুকু স্বর্ণরেণু, পুষ্প পরিমল,
একটুকু রবিকর, শিশিরের জল,
কিছুক্ষণ খেলাধুলা মুগ্ধ অভিনয়,
তার পরে দিন শেষ—আর বেশি নয়।
রে স্বল্পায়ু, তাহে তোর কোনো খেদ নাই,
যে পারে অমর হোতে হোক না সে, ভাই।
বৃদ্ধ যশ, উচ্চাসনে বসি' তার পাশে
চিরকাল বেঁচে থাকা, মহালাঞ্ছনা সে।
তার চেয়ে ঢের ভালো, ছড়াইয়া পাখা
খেলা-শেষে কুসুমের বক্ষে ম'রে থাকা।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী

অস্বীকার

তোমায় আমি মান্‌ব নাগো মান্‌ব না;
লোকের মুখের শোনা কথার আলগা জানায় জানব না।
হাওয়ায় যে বীজ উড়ে এসে   লাগে মনের উপর-দেশে
তার সে ক্ষণিক ফুলের নেশায় পরান আমার ভুলবে না;
প্রাণের গোপন গভীর তলে   রসের চির ধারা চলে
সেথায় যদি না রহে মূল সুধার ফল যে ফলবে না।
কল্পতরুর আশা ক'রে   আছি চির জনম ধ'রে,
অল্প সুখের লোভে আমি দুয়ারে কর হানব না,
জনরবের কলরবের কথাই কানে আনব না।

দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী

তোমার জানা সে তো অমন চোরের মতন আসবে না।
সকল জানা অজানা মোর তার আলোতে হাসবে না?
জানবে না মোর সকল স্নায়ু   পরান-ব্যাপী পরান-বায়ু,
জানার সুখ কি বুকের রক্তে তালে তালে নাচবে না।
আমার চেতনটুকু গ্রাসি'   দেহে মনে জড়ের রাশি;
বিপুল মরণপুঞ্জ কি সেই ওই জানাতে বাঁচবে না।
অযুত যুগের পদ্মকুড়ি ফুটলে কি বাস ছুটবে না।
অমন দূতীর মুখের খবরে মোর মরমের মান টুটবে না।

তোমায় নিয়ে যার খুশি হোক করুক জানার খেলা।
আমার প্রাণে সইবে নাগো অমন হেলা-ফেলা।
যতদিন না আসে সুদিন   আমি কঠোর আমি কঠিন
মুখ ফিরায়ে রইব দূরে করব অস্বীকার;—
সুপারিশে চিনব নাগো   সস্তাদরে কিনব নাগো
চিরদিনের সফলতা অসীম বাসনার।
আমায় ছেড়ে একেবারে   তোমার যদি চলতে পারে
আমারো যে চলবে নাগো সে কথা তো মানব না;
ভালবাসার মাঝে আমি আর তো কিছুই টানব না।

ওগো লোভী, জানি তোমার কী লোভ জাগে অন্তরে,
ভাবছ বসে মনখানি মোর কাড়বে যে কোন্ মন্তরে।
অসীম শক্তি বিপুল সজ্জা   দাগবে প্রাণে অশেষ লজ্জা,
একটুখানি প্রাণ বটে মোর, তবুও তা টলবে না।
বজ্রে যদি হানো হৃদয়   মানব মৃত্যু, তোমায় সে নয়,
চির মনোহরণ বিনে মন যে আমার গলবে না।

আপন মনের মরমখানি আপনি আমি নাহি জানি,
তুমিই জানো প্রাণ যে আমার ভুলবে কিসে নিঃশেষে,
তোমায় ধরা দিতেই হবে বক্ষে আমার সেই বেশে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

খেয়া-ডিঙি

পাটের খেতের ভিতর দিয়ে ঘাটের ডিঙা বাই—
তবু আমার হাটের সাথে কোনও বাঁধন নাই;
শিরা-ওঠা ফাটা হাতে হালের গোড়া ধরি'
আমি শুধু আপন মনে এপার-ওপার করি।

তোমরা ভাবো—খেত আর ফসল, বৃষ্টি বাদল বান,
ডুবল কত বাঁচল কত ভরা ভাদুই ধান,
আমার কিন্তু সে সব দিকে খেয়াল-খবর নাই—
আমি আমার নিয়ম মতন ঘাটের ডিঙা বাই।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভাদর আসে মরা গাঙে ভরা বন্যা নিয়ে—
রাঙা জলে এপার ওপার একসা ক'রে দিয়ে;
লগির গোড়া পায় না তলা, মিলে না আর থই,
দিনে রাতে তবু আমার কাজের ছুটি কই।

হঠাৎ যেদিন বানের জলে ছাপিয়ে উঠে মাঠ,
হাঁটু-নাগাল ধানের জমি, গলা-নাগাল পাট,
কানাকানি বানের জলে ধানের আগা দোলে,
টল্‌মলিয়ে ডিঙা আমার চলে তারি কোলে।

কোথায় বা সে আলের রেখা, কোথায় বা সে বাঁধ,
বাবলা গাছের বেড়া নিয়ে কোথায় বা বিবাদ।
বাঁধন-হারা বানের মুখে বিধি-বিধান নাই—
সীমাবিহীন সাঁতার খেতে ঘাটের ডিঙা বাই।

কোমর-জলে দাঁড়িয়ে ক'সে কাস্তে চালায় চাষী,
ধানের শিষের সোঁদা গন্ধ হাওয়ায় বেড়ায় ভাসি',
কাজল-কটা ধানের ডগা নুইয়ে জলের তলে
মস্‌মসিয়ে তারি মাঝে ডিঙা আমার চলে।

আটি বাঁধা ধানের রাশি এপার-ওপার করি,
পালা বাঁধা পাটের গাদা বোঝাই ক'রে মরি;
দিনে-রাতে কত লোকের কত কথাই শুনি—
আমি বসে আপন মনে খেয়ার হিসাব গুণি।

জলের গায়ে সিঁদুর ঢেলে সূর্যি উঠে পুবে,
দিনের খেয়া সেরে আবার পশ্চিমেতে ডুবে ;
বারোমাসে একটি দিনও ছুটি-কামাই নাই,
তারি সাথে আমি আমার ঘাটের ডিঙা বাই।

জন্মাষ্টমী

আঁধারে ফুটিল আলোকদীপ্তি—কাঁটায় কনক-ফুল,
অন্ধ অকূল সিন্ধুর পারে দেখা দিল উপকূল,
মৃত্যুকপিশ মূর্ছিত মুখে ফুটিল প্রাণের হাসি,
পাপের চক্ষে সহসা উঠিল পুণ্যের জ্যোতি ভাসি'।
উলু উলু উলু দে রে পুরনারি, ওরে তোরা শাঁখ বাজা—
অন্ধকারায় জনমিল আজ মুক্তি-দেশের রাজা।

চুপ চুপ চুপ—চুপ করো সবে, এখনো সময় নয়—
নির্যাতনের বীর্যের আজো হয়নিকো পরাজয় ;
অধর্ম আজো রক্ত পতাকা উড়ায় উচ্চশিরে,
কংসের বাহু ধ্বংসের ঘর এখনো রয়েছে ঘিরে ;
চুপ করো সবে—অন্ধকীটের গোপন গহনতলে,
দুরিত-নাশন কলুষ-শাসন মুক্তির মণি জ্বলে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

উলু উলু উলু—উলু উলু উলু—ওরে তোরা শাঁখ বাজা,
কংসকারায় জনমিল আজ বিশ্বভুবন রাজা ;
ধরণী ধরিল তাপিত বক্ষে দেবকী-গর্ভবাসে,
বসুদেবতায় পুণ্য বহ্নি ধরার ধ্বান্ত নাশে ;
কারাগার হোলো দ্বিতীয় স্বর্গ, দুঃখ হইল সুখ,
জীবের দৈন্যে দেখা দিল আসি দেবতার হাসিমুখ।

অষ্টমীতিথি—কৃষ্ণপক্ষ, আঁধারে নিখিল হারা,
গুরু-গুরু ডাকে বরষার দেয়া, অঝোরে ঝরিছে ধারা ;
বক্ষে পাষাণ—বসু-দৈবকী বন্দী গৃহের তলে—
ব্যথা-জর্জর অসহায় নর তিতিছে নয়ন-জলে ;
ঘোর দুর্দিন ভিতরে-বাহিরে, দারুণ দুঃসময়—
এমন দুঃখ না হোলে জীবের, দেবের কি দয়া হয়।

জনমিল শিশু—শঙ্খ ঘণ্টা বাজিল দ্যুলোক 'পর
দেব দুন্দুভি প্রহরীজনের শিহরিল কলেবর ;
বিদ্যুদ্দ্যুতি ঝলসিল দিঠি, অন্ধদ্বারের দ্বারী,
খুলি গেল দ্বার পলকের মাঝে, স্তম্ভিত নরনারী ;
শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম বিভূষিত নারায়ণ
বসুদেব ক্রোড়ে হাসিলা বারেক স্মরি' নিজ পলায়ন।

ত্রিলোক জনের মুক্তি-নিদান—তা'রেও লুকাতে হয়।
পাতকীর পাপ পূর্ণ করিতে—তাও লাগে সুসময়।
শঙ্কিত চিতে কম্পিত পদে ভাবে মায়ান্ধ জন—
কেমনে তাহারে পার করে—যেবা পার করে ত্রিভুবন।
শিবানী আপনি শিবারূপে পথ দেখায় গোপনে যা'রে,
অনন্ত নিজে ছত্র ধরিয়া নিবারিছে বারিধারে।

অপরূপ কথা—রূপাতীত রূপ গুপ্ত করিয়া জলে,
দ্বিভুজ হইয়া মুরলী ধরিয়া উদিলা ধরণী তলে ;
দু'হাতে বাঁধিবে স্নেহের বাঁধন আদুরে মায়ের ছেলে,
চারি হাত ফিরে প্রকাশিবে পুন বৈরীর দেখা পেলে।
ত্রিলোকপালন নরনারায়ণ পালিত আপনি লোকে,
যশোদা-মায়ের কোলে-কোলে আর নন্দের চোখে-চোখে।

গোপ-গোয়ালার স্নেহের দুলাল, ক্ষীর সর ননীচোর,
বৃন্দাবনের বনের গোপাল, রাখাল সঙ্গী তোর,—
নন্দ দুলাল, এ কী এ খেয়াল, এ কী লীলা লীলাময়।
দীনের বন্ধু করুণাসিন্ধু, তাই কি এ পরিচয়।
কংসাসুরের পাপের পসরা না বাড়িলে ধরামাঝে—
কেমনে পেতাম, কোথা দেখিতাম—দয়াল তোরে এ সাজে।

ধরায় ফুটিল কৃষ্ণচন্দ্র—ধুলায় নীলারবিন্দ—
গোপ-গোয়ালার ঘরে আসি হাসি'. দেখা দিলা শ্রীগোবিন্দ।
জরামরণের ধরণী-দুয়ারে ফুটায়ে স্বরগহাসি,
ধূলিপঙ্কিল গোষ্পদ-বুকে ছড়ায়ে জ্যোছনারাশি,
উলু উলু উলু—উলু দে রে আজ, ওরে তোরা শাঁক বাজা,—
কংসকারায় জনমিল আজ ধ্বংস-পালন রাজা।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

দেশের লোক

ঝরঝরে ঘরখানি উলুখড়ে কোনোমতে ছাওয়া,
মাটির দেয়ালে ক'টা ফাঁক দেওয়া—আসে আলো হাওয়া ;
বাঁশের খুঁটিতে আঁটা পাশে দুটি দাওয়া পরিপাটি—
নিকানো গোবরজলে, ধারে ভাঙা দরমার টাটি।

আরো দুটি ঘর আছে—একখানি প্রাচীরের পাশে—
বাহিরের একচালা—লোকজন যদি কেউ আসে ;
ভিতরের গায়ে তারি পাকের চালাটি সবে তোলা,
কূপটি তাহারি ধারে, কাছে এক শস্যহীন গোলা।

গোরুর চালাটি আছে আঙিনার এককোণ ঘেঁসে,
তারি ধারে সদরেব আগলটি দেয়ালের শেষে ;
আঙিনার মাঝখানে গোটাকত গাঁদা ও দোপাটি ;
পুঁই ও পালঙ-শাক—তারি পাশে লাউয়ের মাচাটি।

গাছপালা বেশি নাই, এককোণে ডালিমের গাছে
ছেঁড়া নেকড়ায় বাঁধা ফল ক'টা—কাকে খায় পাছে।
তারি কাছে ঝাড়-কত দু'বছরে করবীর চারা—
থোকা-থোকা রাঙা ফুলে এই শীতে সাজিয়াছে তারা।

তুলসীর মঞ্চটি তাই শুধু ইঁট দিয়ে গাঁথা,
তকৃতকে বেদীখানি—পায় না পড়িতে ঝরাপাতা ;

ঘরের গৃহিণী দিনে দশবার বেদীটি নিকায়—
মূর্তিমান নারায়ণ—সাঁঝে নিজে দীপটি দেখায়।

নিয়ত প্রণাম করে—কাজ বা অকাজ সব ফেলে,
তাই পাশে দাগ-ধরা সিঁথার সিঁদুরে আর তেলে ;
ছেলেটি তাহারি কাছে খেলা করে কাদামাটি নিয়ে
যতবার ধুলা মাখে, ততবার ফেলে ঝাঁট দিয়ে।

রোজ আনে রোজ খায়—ঘরদ্বার কিবা হবে আর,
খেটে এনে দিয়ে-থুয়ে বড়ো বেশি বাঁচে না যে তার।
ধর্ম বলো, কর্ম বলো যাহা কিছু এই শুধু আছে—
ব্যথা পেলে বাহু তুলে জানায় তা আকাশের কাছে।

অবিচার অত্যাচার—ভাবে নিজ করমের ফল,
নয়নের জল ছাড়া তাই কিছু থাকে না সম্বল ;
এই দেশ—এই লোক—হাসিও না শিক্ষা-অভিমানী,—
ধর্ম জানে তার কাছে সত্য মূল্য কার কতখানি।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার প্রতি

মনের কথা রইল মনে বন্ধু মোর,
নয়ন-কোণেই রইল জ'মে নয়ন-লোর।
আজকে পিছে চাই গো মিছে, নেই সে দিন,
শুন্‌তে যখন অনেক কথা অর্থহীন।
আজ বাঁশিতে বেসুর বাজে আচম্‌কা,
সত্যি হোলো স্বপ্নে-দেখা আশঙ্কা।

কোন্ নিমেষে বিরস হোলো মুখ-খানি,
বিদায়-বেলা দেয় গো যেন হাত-ছানি;
চুরি গেছে বুক-ভরা সে আনন্দ,
ছন্দে-ভরা ভালবাসার সনন্দ।
আজ যা বলি যায় না বলা কথায় হায়,
খেপিয়ে গেছে গভীর দরদ ব্যথার ঘায়।

বলার-চেয়ে না বলাতেই প্রকাশ তাব;
নীরবতাই গাঁথে আমার কথার হার।
হারিয়েছে ঘর পরদেশীয়া এ দরবেশ,
পিয়াস-টুকু না পূরিতেই স্বপন-শেষ।
কে আছ মোর ব্যথার ব্যথী—ডাকছি তায়,
এই দুনিয়া দেয়নি যাহা, দাও আমায়।

আব্‌ছায়ায়

জলের পারে ঝাউএর সারি
জ্যো'স্নালোকে দেখায় কালো ;
অনেকদূরে পাহাড়-চূড়ে
রাতের কাজল হয় ঘোরালো।
আবছায়া সে বেড়ায় ঘুরে'
ডাক দিয়ে যায় চেনা স্বরে,
মুখের রেখা যায় না দেখা,—
চলার সাথী বাতি জ্বালো।

কে এল রে, কে গেল রে,
পালিয়ে গেল একলা ফেলে,—
পাথার-পুরীর দুয়ার খুলে'
দাঁড়ায় সে কি প্রদীপ জ্বেলে।
সাঁত্‌রে চলি ঝড়-ঝাপটে ;
পথ চাহে সে সাগর-তটে,
বড়ো মধুর, বড়ো কোমল,
ডাগর দুটি নয়ন মেলে।

হা মুসাফির, আশার ফকির
ছটফটিয়ে মরিস ঘুরে'—
যায় না জানা সেই ঠিকানা
যেথায় গেলে পিয়াস পূরে।

জেগে-কাঁদার রাত ফুরাবে,
চিতার জ্বালা জুড়িয়ে যাবে,—
বদলে যাবে 'পূরিয়া' তান
ভোরের ললিত-ভেঁরো সুরে।

প্রমথ চৌধুরী

বর্ষা

(ছড়া)

এ বুঝি আষাঢ় মাস,
তাই ছুটে চারিপাশ,
শুধু করে হাঁসফাস
পুবের বাতাস।
কালো কালো মেঘগুলো
জল খেয়ে পেটফুলো,
পুঁটুলি পাকিয়ে শুলো
জুড়িয়া আকাশ।
হাতির মতন ধড়
নাহি তাহে নড়চড়,
নাক ডাকে ঘড় ঘড়
চারিদিক ছেয়ে।

এত হোলো অন্ধকার
    দিবারাত্রি একাকার
    পাখি সব চিৎকার
        করে ভয় খেয়ে।
দু'হাত না চলে দৃষ্টি,
    ধুয়ে পুঁছে সব সৃষ্টি
    অবিশ্রাম ঝরে বৃষ্টি
        ঝর ঝর ঝরে।
দেখে ভয়ে কাঁপে বুক,
    আকাশ ভেংচায় মুখ,
    বিদ্যুতের সবটুক
        জিভ বার ক'রে।
চিল খায় ঘুরপাক,
    ডালে ব'সে কাঁপে কাক,
    আকাশেতে বাজে ঢাক
        ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ।
সারস মেলিয়া পাখা
    নাচে হয়ে আঁকাবাঁকা,
    ময়ূর ধরেছে কেকা,
        গায় কোলা ব্যাঙ।
হাঁস, রাজ আর পাতি
    খালে বিলে সার গাঁথি'
    ফুলিয়ে বুকের ছাতি
        হেসে ভেসে চলে।
ব্যাঙদের মকমকি,
    বিদ্যুতের চকমকি

প্রমথ চৌধুরী

দেখে শুনে বক বকি
এক পায়ে টলে।
গাছেদের মাথা ছুঁয়ে
আকাশ পড়েছে নুয়ে
জল ঝরে চুঁয়ে চুঁয়ে
মেঘের চুলের,
শিউলি ভুঁয়েতে লুটে,
কদম উঠেছে ফুটে,
ভিজে গন্ধ আসে ছুটে
কেতকী ফুলের।
ছেলে পিলে মহানন্দ
ঘরে ঘরে হয়ে বন্ধ
পরস্পরে করে দ্বন্দ্ব
মহা তাল ঠুকে।
পা ছড়িয়ে নারীকুল
উনুনে শুকোয় চুল,
দু'নয়ন বাষ্পাকুল,
ধোঁয়া ঢুকে ঢুকে।
মাতিয়া বরষা-রসে,
ভাঙা গলা মেজে ঘ'সে
কোনো যুবা ভাঁজে ক'সে
সুরাট মল্লার।
কেহ বা মনের ঝোঁকে
কবিতা লিখিছে রোখে
গেঁথে দিয়ে প্রতি শ্লোকে
কুমুদ কহ্লার।

বলি শুন, ওহে বর্ষা,
　　আবার যে হবে ফর্সা
　　এমন হয় না ভর্সা —
　　　　　না হয় না হোক।
তোমার ঐ রাঙা কালো,
　　তোমার ঐ রং আলো,
　　তার বড়ো লাগে ভালো
　　　　　যার আছে চোখ।

কাঁঠালী চাঁপা

গড়নে গহনা বটে, রঙেতে সবুজ,—
ফুলের সবর্ণ নহ, বর্ণচোরা চাঁপা।
বৃথা তব গন্ধভারে গর্বভরে কাঁপা,
ফিরেও চাহে না তোমা নয়ন অবুঝ॥

নেত্রধর্ম খুঁজে ফেরা গোলাপ, অম্বুজ।
উপেক্ষিতা আছ তুমি, হয়ে পাতা-চাপা।
তোমার কাঁঠালী গন্ধ নাহি রহে ছাপা,—
ছুটে আসে, ভেদ করি' পাতার গম্বুজ॥

ঠিক ক'রে হও নাই পাতা কিংবা ফুল,—
দু'মনা করাই তব দুর্গতির মূল।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

পত্রের নিয়েছ বর্ণ, ফল হতে গন্ধ,
আকৃতি ফুলের কাছে করিয়াছ ধার,
সর্বধর্মসমন্বয়-লোভে হয়ে অন্ধ,—
স্বধর্ম হারিয়ে হোলে সর্বজাতি বার।

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

প্রশ্ন

সত্য করি' কহ মোরে কী পেয়েছ প্রাণের নিভৃতে,
পেলে না যা এই ধরণীতে।
লভিয়াছ জীবন-সম্বল,
আপনার অন্তস্তলে পশিয়া কেবল ?
কী আছে সেথায়
সূচীভেদ্য অন্ধকারে সঙ্গীহীন গোপন-গুহায়।
বিশ্বে যাহা পেলে না কোথাও,
রুদ্ধ কক্ষে আঁখি মুদি' চিত্তে তাহা পাও ?

জানি তুমি একদিন আমাদেরি মতো শান্তিহারা
ছিলে যেন উন্মাদের পারা।
আলোড়িয়া কত আবর্জনা
খুঁজিয়াছ আতিপাতি অমৃতের কণা
মরতের পরতে পরতে,
ফিরিয়াছ পথে পথে নতশিরে ব্যর্থ মনোরথে।

নয়নে ফুটেছে আজি তব
উদার প্রশান্তি ভরা দৃষ্টি অভিনব।
মনে হয় তোমা মাঝে আজি আর কোনো দৈন্য নাই,
বিস্ময়ে তোমার পানে চাই।
শুধাইলে, শুধু মধু হাসি'
নয়নে অধরে তব যেন পুষ্পরাশি
প্রস্ফুটিত ক'রে,
কও না তো কোনো কথা মৃদু হাসি মিলায় অধরে,
জ্যোৎস্না ঝরে ফুল্ল দু'নয়নে,
জানি জ্বলে রত্নদীপ পরান গহনে।

সে মণি লুকানো আছে সবারি কি অন্তর মাঝারে,
মাটি-চাপা স্ফুরিতে না পারে?
কেমনে সে ধূলির গুণ্ঠন
উন্মোচিয়া উদ্ধারিব দীপ্তি বিকিরণ।
জানি না কোথায়
লুকানো রয়েছে মণি কঠিন অস্বচ্ছ মৃত্তিকায়
অন্তরের কোন্ গুপ্ত কোণে,
তোমারে নেহারি যবে জাগে আশা মনে।

বাৎসল্য

খেলাঘরে শিশু খেলা করে,
ধূলির ফাটল-মেঘে যেন চাঁদিমার সুধা ঝরে
হাসি-জ্যোৎস্না ভরা মুখে তার,

সেই আলো সেই হাসি জননীর স্নেহ-নীলিমার
অতল জলধি-বক্ষে আলোকের শুভ্র আলিপনা
আঁকিছে কত না।
উচ্ছল তরঙ্গ শিরে শিরে,
আনন্দের সুমন্দ সমীরে।

দূর হতে কবি একা বসি'
নিস্পন্দ নয়নে হেরে কী খেলা খেলিছে শিশু-শশী
ধরণীর এই ধূলি 'পরে,
আর দেখে সেই সাথে কী তরঙ্গ স্নেহের সাগরে
উথলি' উথলি' ওঠে, জ্যোছনায় বিগলিয়া যায়
অকূল সুধায়।
ওইটুকু ধূলিমাখা দেহ
দীপ্ত করে সিন্ধুভরা স্নেহ।

ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী

সিন্ধু

১

নাহি কূল নাহি পার, সীমাহীন পারাবার,
অগাধ হৃদয়,
অনন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গে আছাড়ি' পড়িছে রঙ্গে
বালু-বেলাময়।

ঊর্ধ্বে তার নীল নভ অনন্তের অনুভব
অসীম উদার,
নয়নের অভিরাম অসংখ্য তারকাদাম
কোটি নেত্র তার।
অনন্ত গগন তলে সীমাহীন সিন্ধু-জলে
অনন্তের খেলা,
তারি মাঝে ক্ষুদ্র নর কাঁপে ক্ষুদ্র কলেবর
দাঁড়ায়ে একেলা।

২

হে অনন্ত অম্বুনিধি, বিস্ময়-বিহ্বল হৃদি
ভাবিতেছি মনে,—
তুমি অনন্তের ছায়া, আমি ক্ষুদ্র কীট-কায়া
কোন্ ক্ষুদ্র কোণে।
জানি না জগতে কবে জনম লভিলে, ভবে
র'বে কত কাল,
জানি শুধু কীট সম জনম মরণ মম
সকাল বিকাল।
কত যুগ যুগ মরি রয়েছ ধরারে ধরি'
মুষ্টির ভিতর,
এ ক্ষুদ্র পলক-প্রাণ কিসে তব পরিমাণ
ধরিবে সাগর।

৩

ওহে নীল পারাবার, যদিও এ দেহ ছার
অতি ক্ষুদ্রতম,

তথাপি এ তনু-কূলে যে অকূল হৃদি দুলে
সে যে সিন্ধু সম।
তোমারি মতন তথা উঠে ঊর্মি যথা তথা
তীব্র কামনার,
ধরিয়া ভুজঙ্গ-ফণা গরজে তরঙ্গ নানা,
সংখ্যা নাহি তার।
তোমা হতে এক বিন্দু নহে ক্ষুদ্র হৃদি-সিন্ধু
বিপুল অকূল,
কী উদ্দাম গতি তার, অফুরন্ত ভঙ্গিমার
আদর্শ অতুল।
তাহে পুন তোরি মতো এই আছে—এই হত
ভঙ্গুর লহর ;
টুটে এক, উঠে আর, কে দিবে রে সীমা তার
বিচিত্র প্রসর।

৪

তব জন্ম রত্নাকর, নহে জ্ঞান-অগোচর,
জানে ইতিহাস ;
কিন্তু কেহ নাহি জানে কোথা হবে কোন্‌খানে
আমার বিকাশ।
যথা তব বক্ষ 'পরে ছুটিতেছে থরে থরে
বিক্ষুব্ধ লহর,
সেই মতো পরে পরে জন্ম হতে জন্মান্তরে
ধাই নিরন্তর।
হয় তো আসিবে কাল তুমি যাবে অন্তরাল
শুকাইবে নীর,

আমি কিন্তু কতবার ধরিব বাসনাগার
কামনা শরীর।
কহি তাই হে জলধি, ও অশ্রান্ত নাদ যদি
থামে গো তোমার,
এ প্রাণের আর্তনাদ নাহি পাবে অবসাদ
না থামিবে আর।
অবিশ্রান্ত হুহুংকার উঠিছে যে পারাবার
তব উর্মি-মুখে,
অশ্রান্ত লহর-মেলা খেলিতেছে ফেন-খেলা
নিরন্তর বুকে,
এ সকলি জানি সিন্ধু, অন্তরের নহে বিন্দু
বহিরাবরণ,
বাহিরে অধীর অতি অশান্ত চঞ্চল গতি
নিত্য বিবর্তন;
কিন্তু তব নীল সিন্ধু, অভ্যন্তরে নাহি বিন্দু
মৃদু আলোড়ন,
সেথা স্তব্ধ নীরবতা সেথা কান্ত প্রশান্তত্যা
সুপ্তি বিস্মরণ।
এ চিত-পয়োধি মোর তেমনি গরজে ঘোর
বাহিরে কেবল,
মন বুদ্ধি অহংকার ইন্দ্রিয় তরঙ্গ তার
করে কোলাহল।
কিন্তু সে সবার তলে সুষুপ্তির স্থির জলে
শান্ত অচঞ্চল—
ঘুমায় আনন্দ-কন্দ নির্বিকার নিরদ্বন্দ্ব
আত্ম নিরমল।

পাইলে সন্ধান তার আসা যাওয়া অনিবার
থেমে যাবে মোর।
না রহিবে তুমি-আমি, না র'বে দিবস-যামী
কেটে যাবে ঘোর।

সতীশচন্দ্র রায়

চাঁদ

আরো মনোহর তুই, চন্দ্রমা উজলা।
ধরার অঞ্চল ঢাকা অভিসার দীপ,
রজনীর কুঞ্জবনে রস-বিহ্বলা
যখন মিলনে যায়, কুরুবকনীপ
হেলায় ছড়ায়ে পথে। ইন্দ্রজালে তোর
শত-যতনের কাজ শ্লথ করে ছাড়ি'
আধেক ধরণী উঠে হইয়া বিভোর—
মেদুর মদির প্রাণে।—খেয়া দিয়া পাড়ি
সংসারের তট হতে স্বপনের তটে
পঁহুছি জাগিয়া উঠে—জলে কুলু স্বর,
জাগি উঠে' জাগে স্বপ্ন মেঘমালা পটে,
পরান হইয়া উঠে আপনি বিধুর।
রবি আনে জাগরণ প্রদীপ্ত প্রখর,
তুমি আনো স্বপ্নলোকে বিধুর জাগর।

নিশীথিনী

সোনার সন্ধ্যার পরে এল রাত্রি, বিকাশিল তারা
দিগন্ত মিলায় বনে নভস্তল চন্দ্রকলাহারা।
কালো অন্ধকার যেন কালো এক ভ্রমর বিপুল
আবরিয়া বসিয়াছে ধরণীর মধুময় ফুল।
সেই আলো-প্রস্ফুটিত লক্ষদল কুসুম সুন্দর,
তারি পরে বিস্তারিয়া কালো ডানা গভীর অন্তর
বিদারি, অতুল মধু বিহ্বলিয়া করিতেছে পান
ধরণী-গগনে লাগে মধুরস জোয়ারের টান।
রস-ভরা বহে বায়ু বনস্পতি-শাখায় সঞ্চরি—
রসাবেশে বনস্পতি আপনারে রেখেছে আবরি।
প্রান্তরের ক্ষুদ্রতম তৃণমুখে লেগেছে শিশির
অতল নিদ্রার রসে ডুবে গেছে জীব ধরণীর।
সত্য কোথা নাহি জানি, নাহি জানি সত্য কারে কই
মনে হয় এ আঁধার একেবারে নহে রস বই।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগীত

ধরণীর মর্মে মর্মে রসের যে গোপন সঞ্চয়
সঞ্চারে পল্লবে পত্রে, নাহি অন্ত, নাহি তার ক্ষয়।
কুসুমে কুসুমে তাই কেঁদে মরে সুরভিত শ্বাস,
অন্তরের রসরূপ গন্ধে তাই করিছে প্রকাশ।

হৃদয়-অরণ্য মাঝে পথহারা শুধু ঘুরে মরে
বাসনা কামনা কত তাই, বেদনায় আঁখি ঝরে,
মহানন্দে হৃদয়ের মরা গাঙে দুই কূল ছাপি',
নানা বাণী নানা বর্ণে তরঙ্গিয়া উঠিতেছে কাঁপি',
কত কাব্য কত ছন্দে সে আনন্দ ধরিছে মুরতি,
মন্দিরে মন্দিরে তাই বন্দনায় ধ্বনিছে আরতি ;
কত কথা হোলো বলা সৃজনের সেই আদি হতে
তবু যেন মনে হয় বলা নাহি হোলো কোনোমতে,
ক্ষণে ক্ষণে তাই সুরে অর্থহীন বেদনায় ভরি
সেই কথা বলি—যাহা বলা নাহি হোলো যুগ ধরি' ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ঘুমের রানী

দেখা হোলো ঘুম নগরীর রাজকুমারীর সঙ্গে
সন্ধ্যাবেলায় ঝাপ্‌সা ঝোপের ধারে,
পরনে তার হাওয়ার কাপড়, ওড়্‌না ওড়ে অঙ্গে,
দেখলে সে রূপ ভুলতে কি কেউ পারে ।

চোখ দুটি তার ঢুলু ঢুলু মুখখানি তার মিঠে,
আফিম ফুলের রক্তিম হার চুলে ;
নিশ্বাসে তার হাসনু-হানা, হাস্যে মধুর ছিটে,
আল্‌গোছে সে আল্‌গা পায়েই বুলে ।

এক যে আছে কুজ্ঝটিকার দেওয়াল-ঘেরা কেল্লা,—
মৌনমুখী সেথায় নাকি থাকে।
মন্ত্র প'ড়ে বাড়ায় কমায় জোনাক পোকার জেল্লা,
মন্ত্র প'ড়ে চাঁদকে সে রোজ ডাকে।

তুঁত পোকাতে তাঁত বুনে তার জানলাতে দেয় পর্দা
হুতোম পেঁচা প্রহর হাঁকে দ্বারে,
ঝর্ণাগুলি পূর্ণ চাঁদের আলোয় হয়ে জর্দা
জলতরঙ্গ বাজনা শোনায় তা'রে।

কালো কাঁচের আর্শিতে সে মুখ দেখে সুস্পষ্ট,
আলো দেখে কালো নদীর জলে।
রাজ্যেতে তার নেইকো মোটেই স্থায়ী রকম কষ্ট,
স্বপন সেথা বেড়ায় দলে দলে।

সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকারে হঠাৎ হোলো দেখা
ঘুম নগরীর রাজকুমারীর সনে,
মধুর হেসে সুন্দরী সে বেড়ায় একা একা,
মূর্ছা হেনে বেড়ায় গো নির্জনে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

চম্পা

আমারে ফুটিতে হোলো বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে,
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্ম্মম গ্রীষ্মের পদানত ;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ-ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হোলো—সাহসিকা অপ্সরার মতো।

বনানী শোষণ-ক্লিষ্ট মর্ম্মরি উঠিল একবার,
বারেক বিমর্ষ কুঞ্জে শোনা গেল ক্লান্ত কুহুস্বর ;
জন্ম-যবনিকা-প্রান্তে মেলি' নব নেত্র সুকুমার
দেখিলাম জলস্থল,—শূন্য, শুষ্ক, বিহ্বল, জর্জ্জর।

তবু এনু বাহিরিয়া—বিশ্বাসের বৃন্তে বেপমান,
চম্পা আমি,—খরতাপে আমি কভু ঝরিব না মরি' ;
উগ্র মদ্য সম রৌদ্র,—যার তেজে বিশ্ব মুহ্যমান,—
বিধাতার আশীর্বাদে আমি তা সহজে পান করি।

ধীরে এনু বাহিরিয়া, উষার আতপ্ত কর ধরি' ;
মূর্চ্ছে দেহ, মোহে মন,—মুহুর্মুহু করি অনুভব।
সূর্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি' .
দিনদেবে নমস্কার। আমি চম্পা—সূর্যেরি সৌরভ।

গান্ধিজী

দিনে দীপ জ্বালি' ওরে ও খেয়ালী, কী লিখিস হিজিবিজি।
নগরের পথে রোল ওঠে শোন্ 'গান্ধিজী', 'গান্ধিজী'।
বাতায়নে ছাখ্ কিসের কিরণ, নব জ্যোতিষ্ক জাগে।
জন-সমুদ্রে ওঠে ঢেউ, কোন্ চন্দ্রের অনুরাগে!
জগন্নাথের রথের সারথি কে বে ও নিশান-ধাবী।
পথ চায় কার কাতারে কাতাব উৎসুক নরনাবী।

কৃষাণের বেশে কে ও কৃশ-তনু—কৃশানু পুণ্যছবি,—
জগতের যাগে সত্যাগ্রহে ঢালিছে প্রাণের হবি।

মহাজীবনের ছন্দে যে-জন ভরিল কুলিরও হিয়া,
ধনী-নির্ধনে এক ক'রে নিল প্রেমের তিলক দিয়া.
আচরণ যার কোটি কবিতার নির্ঝর মনোরম,
কর্মে যে মহাকাব্য মূর্ত, চরিতে যে অনুপম।

সাগরেব পারে স্বদেশেব মান রাখিল যে প্রাণপণে,
গোরা-চায়া-দেশে নিগ্রহ সহি' নিগ্রো-কুলের সনে,
গেল চ'লে জেলে জ্বালাইযা রেখে পুণ্য-জ্যোতিব মালা।
ভয়-তরণের সুধা-ক্ষরণের উদাহরণের মালা।
দীক্ষায় যার নিরক্ষরেও সাঁতাবে দুঃখ-নদী,
বুকে আঁকড়িয়া সত্য-লব্ধ মর্যাদা-সম্বোধি।
এশিয়া যে নয় কুলিরই আলয় প্রমাণ কবিল যেবা,
কুলিতে জাগায়ে মহামানবতা নর-নারায়ণ-সেবা,—

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অর্জন যার ব্রহ্মচর্য তপের বৃদ্ধি কাজে
উজ্জ্বল যার প্রাণের প্রদীপ তর্ক-আঁধার মাঝে,
মেথরের মেয়ে কুড়ায়ে যে পোষে, অশুচি না মানে কিছু,
চাকরেব সেবা না লয় কিছুতে, নরে সে যে করা নীচু,
যাহার পরশে খুলে গেছে যত নিদ্‌মহলের খিল,
পূরা হয়ে গেছে যার আগমনে তিরিশ কোটির দিল,
তার আগমনী গা'রে ও খেয়ালী, গৌড় বঙ্গময়,
গাও মহাত্মা পুরুষোত্তম গান্ধির গাহ জয়।

জাতির পাঁতি

জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
　　সে জাতির নাম মানুষ জাতি ;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
　　একই রবি-শশী মোদের সাথী।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
　　সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলি ডাঁটো ক'রে তুলি,
　　বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
　　জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল,
　　ভিতরে সবারি সমান রাঙা।

বাহিরের ছোপ আঁচড়ে সে লোপ,
    ভিতরের রং পলকে ফোটে,
বামুন, শূদ্র, বৃহৎ, ক্ষুদ্র
    কৃত্রিম ভেদ ধুলায় লোটে।
রাগে অনুরাগে নিদ্রিত জাগে,
    আসল মানুষ প্রকট হয়,
বর্ণে বর্ণে নাইরে বিশেষ,
    নিখিল জগৎ ব্রহ্মময়।
যুগে যুগে মরি কত নির্মোক
    আমরা সবাই এসেছি ছাড়ি'
জড়তার জাড়ে থেকেছি অসাড়ে
    উঠেছি আবার অঙ্গ ঝাড়ি';
কুল-দেবতার গৃহ-দেবতার
    গ্রাম-দেবতার বাহিয়া সিঁড়ি
জগৎ-সবিতা বিশ্বপিতার
    চরণে পরান যেতেছে ভিড়ি'।
পরিবর্তন চলে তিলে তিলে
    চলে পলে পলে এমনি ক'রে,
মহাভুজঙ্গ খোলস খুলিছে
    হাজার হাজার বছর ধ'রে।
আসিছে সেদিন আসিছে সেদিন
    চারি মহাদেশ মিলিবে যবে,
যেই দিন মহা-মানব ধর্মে
    মানুষের ধর্ম বিলীন হবে।
ভোর হয়ে এল আর দেরি নাই
    ভাঁটা শুরু হোলো তিমির-স্তরে,

জগতের যত তূর্য-কণ্ঠ
মিলিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে।
মহান্ যুদ্ধ মহান্ শান্তি
করিছে সূচনা হৃদয়ে গনি,
রক্ত-পঙ্কে পঙ্কজ-বীজ
স্থাপিছেন চুপে পদ্মযোনি।

কালিদাস রায়

ছাত্রধারা

বর্ষে বর্ষে দলে দলে আসে বিদ্যামঠ-তলে
চলে যায় তারা কলরবে,
কৈশোরের কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়,
যৌবনের শ্যামল গৌরবে।
ভালবাসি, কাছে ডাকি নামও সব জেনে রাখি,
দেখাশোনা হয় নিতি নিতি,
শাসন-তর্জন করি শিখাই প্রহর ধরি',
থাকে নাকো হায় কোনো স্মৃতি।
ক' দিনের এই দেখা, সাগর-সৈকতে রেখা
নূতন তরঙ্গে মুছে যায়।
ছোটো ছোটো দাগ পা'র ঘুচে হয় একাকার
নব নব পদ-তাড়নায়।

জানে নাকো কোথা যাবে জোটে হেথা নাহি ভাবে।
পাঠশালা,—যেন পান্থশালা,
দু দিন একত্রে মাতে মেলে মেশে, ব'সে গাঁথে
নীতি-হার আর কথা-মালা।

রাজপথে দেখা হোলে কেহ যদি গুরু ব'লে
হাত তুলে' করে নমস্কার,
বলি তবে হাসি মুখে— "বেঁচে থাকো রও সুখে,
কী করিছ কাজ-কারবার।"
ভাবিতে ভাবিতে যাই কী নাম, মনে তো নাই,
ছাত্র ছিল কতদিন আগে ?
দেখি স্মৃতি ধরি' টানি' কৈশোরের মুখখানি
মনে মোর জাগে কি না-জাগে।
ঘন ঘন আনাগোনা কতদিন দেখা শোনা
তবু কেন মনে নাহি থাকে।
ব্যক্তি ডুবে যায় দলে, মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কে বা মনে রাখে।
এ জীবন ভেঙে গ'ড়ে শ্যামল সরস ক'রে
ছাত্রধারা ব'হে চলে যায়,
ফেনিলতা উচ্ছলতা হয়ে যায় তুচ্ছ কথা,
কলরব সকলি মিলায়।
স্বচ্ছতায় শুধু হেরি আমার জীবন ঘেরি'
জাগে শুধু ম্লান মুখগুলি,
কলহাস্য মহোৎসব আর ভুলে যাই সব,
ম্লানমুখ কখনো না ভুলি।

কালিদাস রায়

কেহ বা ক্ষুধায় ম্লান কেহ রোগে ম্রিয়মান,
শ্রমে কারো চাহনি করুণ,
কেহ বা বেত্রের ডরে বন্দী হয়ে রয় ঘরে,
নেত্র কারো তন্দ্রায় অরুণ,
কেহ বা জানালা-পাশে চেয়ে রয় নীলাকাশে,
যেন বদ্ধ পিঞ্জরের পাখি,
আকাশে হেরিয়া ঘুড়ি মন তার যায় উড়ি'
বিষাদের ছায়াখানি রাখি'।
স্মরিয়া খেলার মাঠ কেউ ভুলে যায় পাঠ,
বুদ্ধিতে বা কারো না কুলায়,
কেহ স্মরে গেহ-কোণ স্নেহভরা ভাই বোন,
ঘড়ি পানে ঘন ঘন চায়।

ডাকিছে উদার বায়ু ল'য়ে স্বাস্থ্য ল'য়ে আয়ু,
ডাক শোনে ব'সে রুদ্ধ ঘরে,
হাতে মসী মুখে মসী মেঘে ঢাকা শিশু-শশী
প্রতিবিম্বে মোর স্মৃতি ভ'রে।
আর সবি গেছি ভুলি', ভুলিনি এ মুখগুলি।
একবার মুদিলে নয়ন
আঁখিপাতা ভারি-ভারি ম্লান মুখ সারি সারি
আকুল করিয়া তোলে মন।

ভাদুরানী এসো ঘরে

নিভায়ে তপন আঁধার গগন ঢেকে গেছে মেঘে মেঘে,
সঘনে গরজি' বিজলি চমকে ভ্রূকুটি হানে সে বেগে।
হেরি' বাদলের ক্ষণিক ক্ষান্তি পাখি কলতান ধরে,
এ হেন বাদরে আদরিণী মেয়ে ভাদুরানী এসো ঘরে।

টোপর পানায় পুকুর ভরেছে কোনো খানে নাই ভাঙা,
জলা ব'লে মনে হয় ডাঙাগুলা, জলে মনে হয় ডাঙা।
ফুলে ভরা সব, কোথায় ফেলিতে কোথায় চরণ পড়ে,
এ হেন দুপুরে থেকোনাকো দূরে, ভাদুরানী এসো ঘরে।

ঘন বাড়ন্ত আখের পাতায় আলিপথ গেছে ঢেকে,
কাঁকড়া-শামুক-মাছ-ব্যাঙে ভরা নালি গেছে এঁকে বেঁকে,
আজি পাটখেতে হাতি ডুবে যায়—মন যে কেমন করে,
কাঁদিছে দাদুরী, আদরিণী মেয়ে ভাদুরানী এসো ঘরে।

বনপথতল হয়েছে পিছল, ডুবেছে ঘাটের সিঁড়ি,
গোরুগুলি বাঁধা গোহালে গোহালে, কৃষাণ আসিছে ফিরি'।
বাদলা বাতাসে ভূতের মতন ঝাউ গাছগুলি নড়ে,
কী বিপদ আনে কখন কে জানে, ভাদুরানী এসো ঘরে।

কুকুর ধুঁকিছে ঢেঁকিশালে শুয়ে, ময়না ঝিমায় শিকে,
কুণ্ডলী রচি' উঠে ঘন ধূম চাল ফুঁড়ে চারিদিকে।
বাবুইএর বাসা তালগাছ হতে ছিঁড়িয়া পড়েছে ঝড়ে,
জুঁইবন হায় কাদায় লুটায়, ভাদুরানী এসো ঘরে।

হাত পেতে আছে ছেলেরা, ভাজিছে মা তাদের তালবড়া,
বালিকারা মিলি' আড়াআড়ি করি' গাহিছে তোমার ছড়া।
ঘরের সাঙায় কপোত ঘুমায়, বসে না চালের 'পরে,
নীড়ের বাহিরে কেউ নাই আজ, ভাদুরানী এসো ঘরে।

আসিয়াছে ঢল, খেয়াঘাটে গোটা প্রহরে জমিছে পাড়ি,
পাল তুলে শত নৌকা চলেছে, কোথা কোন্ দেশে বাড়ি।
উচাটন মন তোমা সারাখন চারিদিকে খুঁজে মরে,
কোথা ডামাডোল বেঁধেছে কে জানে, ভাদুরানী এসো ঘরে।

নিরুপমা দেবী

তৃণ

মোরা কচি কচি শ্যাম তৃণদল,
করি জীবনের পথ সু-শ্যামল।
উঠি ধরণীর প্রাণ ফুঁড়িয়া,
রহি কঠিনের বুক জুড়িয়া,
রাখি ঘন মখ্‌মলে মুড়িয়া,
এই কঙ্করময় ধরাতল।
মোরা কচি কচি শ্যাম তৃণদল।
শ্যাম তৃণদল।

মোরা পদতল-লীন রহি গো,
শুধু শ্যামলের বাণী কহি গো,
মোরা নাহি চাই সেবা আয়োজন,
মোরা নাহি চাই ফুল আভরণ,
আছে অঙ্গের 'পরে আবরণ—
শুধু নিশির শিশির আঁখিজল,
মোরা কচি কচি শ্যাম তৃণদল,
শ্যাম তৃণদল।

আছি শ্রম হরিবার কারণে,
চির পথিকের পদ চারণে।
শুধু পদরেণু লই কুড়ায়ে,
রহি চরণের তল জুড়ায়ে,
রাখি বক্ষের মাঝে উড়ায়ে,
কাঁচা সবুজের শ্যাম পরিমল!
মোরা কচি কচি শ্যাম তৃণদল।
শ্যাম তৃণদল।

মোরা মরু বিজয়ের সেনাদল,
শুধু কোমলতা তুই বাহু বল।
শ্যাম ধরণী মায়ের পরশে,
বাঁচি আমরা বরষে বরষে,
আছি অহেতুক প্রাণ হরষে,
চির শ্যাম আনন্দে ঢলঢল্।
মোরা শ্যামল হৃদয় শিশুদল,
—মোরা তৃণদল।

হেমেন্দ্রকুমার রায়

প্রণাম

চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-তারা, আজ সকলে করছি নমস্কার।
নীলাকাশের জ্যোৎস্না-ধারা, নাও গো প্রণাম—হে মোর চমৎকার।
মেঘের সখা হে হিমাচল, হে প্রকৃতির অজর যোগীশ্বর,
ললাট তব তুষার-ধবল, প্রণাম করে বিস্মিত নশ্বর।
অশ্রুত কোন্ শ্রুতির গাথা, গাইছ সাগর, ভুবন-ভবনে,
তোমার তটে নুইয়ে মাথা, স্তব্ধ আমি, মুগ্ধ শ্রবণে।
আলোক-ছায়ার স্বপ্ন-গেহ, উপত্যকার ফুলকারি ঐ বুক,
কঠোর শিলার স্ফূর্ত স্নেহ, করছি নতি ওগো নয়ন-সুখ।
মূর্ত যেন বিশ্বপুলক, সূর্যকরে জ্বলন্ত প্রপাত,
নির্জনতার ভাবের শোলক, আনন্দ মোর করছে প্রণিপাত।
গহন-বনের মর্মে মেতে, নৃত্য করে নিত্য-সজীব জড়।
পত্র-বীণার কীর্তনেতে চিত্তে জাগায় উন্মাদনার ঝড়।
শরৎ-উষার মিষ্টি চাওয়া, বিহগ-বাঁশির গান-জমানো তান।
ঘুম-ভাঙানো ভোরের হাওয়া, সবার পদেই নমিত মোর প্রাণ।
জল-করবীর অলক খুলে, 'জলতরঙ্গ' বাজাও তটিনী।
প্রণাম করি শ্যামল কূলে, মর্ত্যে তুমি স্বর্গ-নটিনী।
বিশ্ব-ভ্রূণের ধাত্রী-মাতা, মাটি,—জীবের প্রাণ-রসেরি সার,
কোল যে তোমার সদাই পাতা, ধরিত্রী গো, তোমায় নমস্কার।
ছোট্ট ঘাসের অনামা ফুল, শিরায় তোমার বাজছে অসীম সুর,
প্রণাম দিতে করব না ভুল, তোমার রূপে ম্লান যে কোহিনুর।
এর মাঝেতে তুমি মানুষ, ছন্দে-লীলায় মহা কবিতা,
নওকো তুমি ক্ষণিক ফানুষ,—দীপ্তি-গতির অমর সবিতা,

সান্ত দেহে বিশ্বপতি, মানুষ, তুমি জগৎ-সারথি,
নাও গো তুমি মোর প্রণতি, মানবতার করছি আরতি।
সচল-অচল রূপের নাটে ক্ষুদ্র এবং শ্রেষ্ঠতম গো,
সবার পূজায় জীবন কাটে, এই নিখিলে নমো নমঃ গো।

গিরিজাকুমার বসু

নিবেদন

নাথ,
হই জয়ী আর পাই বা আঘাত
চিরদিন যেন ভুবনে
দুঃখ সুখের জীবনে
হয় অনিবার স্নেহের তোমার
মধুময় ধারা-পাত।

মন
হোক ক্ষত, র'ক্ হরষে মগন
দিয়োনাকো কভু ভুলিতে
তোমার চরণ-ধূলিতে
অমল প্রাণের তৃপ্তি-দানের
উৎস সংগোপন।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ভোর

হয় যদি বোধ জীবন আমার
পারি যেন তবে স্মরিতে
বসুধারে তুমি ভরিতে
আলোক তিমির করেছ দুটির
সুন্দর সমাহার।

চোখ

তোমারি কিরণে জাগরিত হোক:
বিচিত্র তব সৃজনে
উপভোগ করি বিজনে
আনন্দে তার   অশ্রুর ভার
ঝরুক মুছিয়া শোক।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

উদ্যানে

চৌদিকে আজ ফুল ফুটেছে
যেথায় ফিরাই দৃষ্টি,
আজকে আমায় জানিয়ে দিলে
রূপ যে কেমন মিষ্টি।

লাবণ্য আজ উথলে উঠে
ধরতে নারে পত্র-পুটে,
চতুর্দিকে হয় যে প্রাণে
    সুধার ধারা বৃষ্টি।

ভবিষ্যতের আনন্দ ওই
    ঘুমায় রূপের অঙ্কে,
বংশধরের জনম যেন
    জানায় অযুত শঙ্খে।
উঠল আজি আদিম রবি
লোহিত জবার আলোক ছবি
আশায় ভরা ত্বরায় হবে
    নূতন ধরার সৃষ্টি॥

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ডাক-হরকরা

প্রভাতে ছুটিয়া আসি, অপরাহ্ণে ছুটে যাই আমি
    পুলিন্দা বহিয়া;
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু উড়ায় বিদগ্ধ বালুকণা
    রহিয়া রহিয়া।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

জ্বরক্লিষ্টা ধরণীর শীর্ণ তীব্র তপ্ত নাড়ী, তার
স্পন্দনের মতো,
দীর্ঘ দগ্ধ রাজপথে আমার দুর্ভর পদক্ষেপ
পড়ে অবিরত।
পান্থ, তুমি ভাবিতেছ বটচ্ছায়ে বসি'—কে ছুটে রে
কী আশার টানে।
আমার সময় নাই, ভেবে নিতে—কেন ছুটে যাই,
কিসের সন্ধানে।

শুধু জানি যেতে হবে—সেই সেথা নদীর ওপারে,
শূন্য রণভূমে ;
বৃদ্ধ ক্লান্ত দিবা যেথা লক্ষ রক্ত-করবিদ্ধ হয়ে
শরশয্যা চুমে।
রাত্রি যেথা ছেয়ে আসে একটানা লয়ের মতন
ছন্দতালহীন ;
পুলিন্দা নামায়ে সেথা একবার মুছিব ললাট,
ঘর্মাক্ত মলিন।
সেথায় পড়িয়া আছে অপর নূতন বাঁধা বোঝা—
স্কন্ধে তুলি' লব ,
প্রভাতের পানে ফিরি', নৌকা খুলি' সেই রাতে পুন
নদী পার হব।
বন্ধু, তুমি ভাবিতেছ, 'ঝম্ ঝম্ ঝম—কে যায় রে
কার অভিসারে।'
কোথা যাই। থাক্ চিন্তা, ওই উষা রাঙাইছে আঁখি
পূর্বাশার দ্বারে।

যে বোঝা বহিয়া আনি, শুনিয়াছি আছে এর মাঝে
নূতন বারতা ;
কত বিরহের শান্তি, হৃদয়ের কত না স্পন্দন—
মিলনের কথা।
শুনিয়াছি জগতের সব চেয়ে তীব্র প্রয়োজন
আছে এরি মাঝে ,
ত্রস্তে পথ ছাড়ে সবে, ডেকে কথা শুধায় না কেহ,
দেরি হয় পাছে।
কে জানে, কাহার বোঝা কেন সব বিপদ হইতে
প্রাণ দিয়ে রাখি।
দুদিনের বৃষ্টিধারে নিজ শির হতে ছত্র লয়ে
কেন তারে ঢাকি।
ওগো, একদিন কেহ পথপার্শ্বে বাতায়ন হতে
ডেকে কথা কও ;
চির আনাগোনা হতে একদিন কোনো ছলে মোরে
ছিনাইয়ে লও।
ক্ষণিক বিশ্রামে মোরে দাও বুঝাইয়ে, কত শ্রান্তি
সঞ্চিয়াছে প্রাণে।
আমারে লওয়াও ছুটি এ অনন্ত ছুটাছুটি হতে
ব্যর্থ শূন্য পানে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

হাট

দূরে দূরে গ্রাম দশবারো খানি,
মাঝে একখানি হাট ;
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলে না প্রদীপ,
প্রভাতে পড়ে না ঝাঁট।
বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে যায় ;
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়ে পুবের মাঠ ;
দূরে দূরে গ্রামে জ্ব'লে উঠে দীপ—
আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে ;
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস
পার্শ্বে পাকুড় শাখে।
হাটের দো-চালা মুদিল নয়ান,
কারো তরে তার নাই আহ্বান ;
বাজে বায়ু আসি' বিদ্রূপ-বাঁশি
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে ;
নির্জন হাটে রাত্রি নামিল
একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল
চেনা-অচেনার ভিড়ে ;

কত না ছিন্ন চরণচিহ্ন
ছড়ানো সে ঠাঁই ঘিরে'।
মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি ক'রে কেউ নিল ভ'রে
কেউ গেল খালি ফিরে ;
দিবসে থাকে না কথার অন্ত
চেনা-অচেনার ভিড়ে।
কত কে আসিল, কত বা আসিছে,
কত না আসিবে হেথা ;
ওপারের লোক নামালে পসরা
ছুটে এপারের ক্রেতা।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,
শত হাতে সহি' পরখের ছল—
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায়
সহিয়া নীরব ব্যথা।
হিসাব নাহি রে—এল আর গেল
কত ক্রেতা-বিক্রেতা।

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরানো হাটের মেলা ;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী,
নিত্য নাটের খেলা।
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,

সুধাকান্ত রায় চৌধুরী

কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে
ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা।

সুধাকান্ত রায় চৌধুরী

মুক্তির খেলা

রুদ্ধ মম চিত্ত নিত্য কাঁদে বন্দীশালে,
তবু বাতায়ন-দ্বার-পথে নব প্রাতে
যে আলোক জাগে পূর্বদিগন্তের ভালে
আভাখানি তার লাগে আসি' মোর মাথে।

পিঞ্জরে রাখিয়া মোরে সংকীর্ণ সীমায়
কেন সুদূরের পানে দৃষ্টি মোর টানো,
কেন, চিত্তপাখি যেথা ক্লান্তিতে ঝিমায়
অরণ্যের বিহগের গীত-ধ্বনি আনো।

পাষাণের দুর্গে মোরে নিত্য বন্দী রাখি',
কেন শ্রাবণের দ্বারে ওগো বার বার
ঝর্ণার উদ্দামগীত এনে দাও ডাকি',—
প্রাণে আনো মুক্তিবেগ দুরন্ত দুর্বার।

গুণে-বাঁধা তরীখানা চলে লক্ষ্য পানে
জীবনে মুক্তির খেলা বন্ধনের টানে।

কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

দেখব এবার জগৎটাকে

থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎটাকে,
কেমন ক'রে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ-দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন ক'রে।
কিসের নেশায় কেমন ক'রে মরছে বা বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে।

কেমন ক'রে বীর ডুবুরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে,
কেমন ক'রে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।
জাপ্‌টে ধ'রে ঢেউয়ের ঝুঁটি যুদ্ধ-জাহাজ চলছে ছুটি',
কেমন ক'রে আনছে মানিক বোঝাই ক'রে সিন্ধু-যানে,
কেমন জোরে টানলে সাগর উথলে উঠে জোয়ার-বানে।

কেমন ক'রে মথ্‌লে পাথার লক্ষ্মী উঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চলছে হিমালয়ের চুড়ে,
তুহিন-মেরু পার হয়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আশায়,
হাউই চ'ড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন্ পুরে,—
শুনব আমি ইঙ্গিত কোন্ মঙ্গল হতে আসছে উড়ে।

রইব নাকো বন্ধ খাঁচায়, দেখব এ-সব ভুবন ঘুরে,
আকাশ-বাতাস-চন্দ্র-তারায় সাগর-জলে পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে' দশদিকেতে পড়ব লুটে,
পাতাল ফেড়ে নামব নিচে, উঠব আবার আকাশ ফুঁড়ে।
বিশ্ব-জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে'।

সিন্ধু

হে ক্ষুধিত বন্ধু মোর, তৃষিত জলধি,
এত জল বুকে তব, তবু নাহি তৃষার অবধি।
এত নদী উপনদী তব পদে করে আত্মদান,
বুভুক্ষু, তবু কি তব ভরিল না প্রাণ।
দুরন্ত গো, মহাবাহু
ওগো রাহু,
তিন ভাগ গ্রাসিয়াছ—এক ভাগ বাকি।
সুরা নাই—পাত্র-হাতে কাঁপিতেছে সাকী।

হে দুর্গম, খোলো খোলো খোলো দ্বার।
সারি সারি গিরি-দরী দাঁড়ায়ে দুয়ারে করে প্রতীক্ষা তোমার।
শস্য-শ্যামা বসুমতী ফুলে ফলে ভরিয়া অঞ্জলি
করিছে বন্দনা তব, বলী।
তুমি আছ নিয়া নিজ দুরন্ত কল্লোল,
আপনাতে আপনি বিভোল।

পশে না শ্রবণে তব ধরণীর শত দুঃখগীত ;
দেখিতেছ বর্তমান, দেখেছ অতীত,
দেখিবে সুদূর ভবিষ্যৎ—
মৃত্যুঞ্জয়ী দ্রষ্টা, ঋষি, উদাসীনবৎ।
ওঠে ভাঙে তব বুকে তরঙ্গের মতো,
জন্ম-মৃত্যু দুঃখ-সুখ, ভূমানন্দে হেরিছ সতত !

হে পবিত্র, আজিও সুন্দর ধরা আজিও অম্লান
সদ্য-ফোটা পুষ্পসম, তোমাতে করিয়া নিতি স্নান।
জগতের যত পাপ গ্লানি
হে দরদী, নিঃশেষে মুছিয়া লয় তব স্নেহ-পাণি।
ধরা তব আদরিণী মেয়ে,
তাহারে দেখিতে তুমি আসো মেঘ বেয়ে !
হেসে ওঠে তৃণে শস্যে দুলালী তোমার,
কালো চোখ বেয়ে ঝরে হিম-কণা আনন্দাশ্রু-ভার,
জলধারা হয়ে নামো, দাও কত রঙিন যৌতুক,
ভাঙো গড়ো দোলা দাও,—
কন্যারে লইয়া তব অনন্ত কৌতুক,
হে বিরাট নাহি তব ক্ষয়,
নিত্য নব নব দানে ক্ষয়েরে করেছ তুমি জয়।

মন্থন-মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্ন-পুর,
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশী-প্রিয়া,
তা'রা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া।

করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃত-সুধা—তোমার জীবন।
সব গেছে, আছে শুধু ক্রন্দন কল্লোল,
আছে জ্বালা আছে স্মৃতি, ব্যথা-উতরোল।
উর্ধ্বে শূন্য,—নিম্নে শূন্য,—শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।

হে মহান, হে চির-বিরহী,
হে সিন্ধু, হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
সুন্দর আমার।
নমস্কার।

পউষ

পউষ এল গো,
পউষ এল
অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে;
ঐ যে এল গো—
কুজ্ঝটিকার ঘোমটা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে॥
সে এল আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ (আ—হা) মলিন চোখে চায়
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে॥

পউষ এল গো—
এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ুক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।

পউষ এল গো, পউষ এল—
শুক্‌নো নিশাস, কাঁদন-ভারাতুর
বিদায়ক্ষণের (আ—হা) ভাঙা গলার স্বর—
'ওঠো পথিক, যাবে অনেক দূর
কালো চোখে করুণ চাওয়া ছাড়ায়ে' ॥

সুকুমার রায় চৌধুরী

গোঁফচুরি

হেড্ অফিসের বড়ো বাবু লোকটি বড়ো শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো, কেউ কখনো জান্‌ত ?
দিব্যি ছিলেন খোস্ মেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা ব'সে ঝিমঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন খেপে।
আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখ্‌টি ক'রে গোল,
হঠাৎ বলেন, "গেলুম গেলুম, আমায় ধ'রে তোল্।"
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ,
কেউ বা বলে, "কাম্‌ড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস্।"
ব্যস্ত সবাই এদিক-ওদিক করছে ঘোরাঘুরি—
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি।"
গোঁফ হারানো ! আজব কথা, তাও কি হয় সত্যি।
গোঁফ জোড়া তো তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।
সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে, সামনে ধ'রে আয়না,
মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি, কথ্‌খনো তা হয় না।

রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি,
"কারো কথার ধার ধারিনে, সব বেটাকেই চিনি।
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
"এমন গোঁফ তো রাখ্‌ত জানি শ্যাম বাবুদের গয়লা।
"এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই"—
এই না ব'লে জরিমানা করলেন তিনি সবায়,
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়—
"কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।
"আফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর
"গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
'ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধ'রে খুব নাচি,
"মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধ'রে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
"গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা,
"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"

রামগরুড়ের ছানা

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা
হাসির কথা শুনলে বলে,—
"হাস্‌ব না না, না না।"
সদাই মরে ত্রাসে ঐ বুঝি কেউ হাসে
এক চোখে তাই মিট্‌মিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।
ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস যদি
মারব কিন্তু তোকে।"

যায় না বনের কাছে, কিংবা গাছে গাছে
দখিন হাওয়ায় সুড় সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।
সোয়াস্তি নেই মনে মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে।
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক্ জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।
হাস্‌তে হাস্‌তে যারা হচ্ছে কেবল সারা,
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছে না কি তা'রা।
রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা,
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা।

আবোল তাবোল

মেঘ মুলুকে ঝাপ্‌সা রাতে,
রামধনুকের আব্‌ছায়াতে
তাল বেতালে খেয়াল সুরে,
তান ধরেছি কণ্ঠ পূরে'।
হেথায় নিষেধ নাই রে দাদা,
নাই রে বাঁধন নাই রে বাধা।

সুকুমার রায় চৌধুরী

হেথায় রঙিন আকাশ তলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরনা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে,
রঙিয়ে আকাশ রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাই বা তাহার অর্থ হোক
নাই বা বুঝুক বেবাক্ লোক।
আপনাকে আজ আপন হতে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।
ছুট্‌লে কথা থামায় কে,
আজকে ঠেকায় আমায় কে।
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্ বাজনা বাজে—
রাম-খটাখট ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ্
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত।
হ্যাংলা হাতি চ্যাং-দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরানী পক্ষিরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।

আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

উড়ো চিঠি

কে পাঠালে উড়ো চিঠি
বসন্তের এই রঙিন হাওয়ায়—
ও ফুলেরা জানিস তোরা
কোন্‌খানে সে কোন্ ঠিকানায়।
গোলাপ বলে—তার ঠিকানা
আমার ভালো আছে জানা,
বকুল বলে,—না-না-না না
কাজ কী গোলাপ পরের কথায়

চামেলি তুই বলতে পারিস?
চামেলি কয় মুচকে হেসে—
কেন তোমায় বলব আমি,
ছিল আমার সখী যে সে।
পারুল বলে,—আকাশ পারে,
কামিনী কয়,—না রে না রে,

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়

ও জানে না জানে তারে
    চাঁপা সে ঐ লুকিয়ে পাতায়।

চাঁপা বলে,—কথা আমি
    কইব নাকো তোমার সনে,
মানুষগুলো এমনি খেলো
    কিচ্ছু কি তার রয় না মনে।
আমি তো কই যাই নি ভুলে
সেই কালো সেই রেশমি চুলে,
নরম নরম দু আঙুলে
    আমায় তুলে পরত খোঁপায়।

ঝিঁঝির পাজর বাজিয়ে পায়ে
    আঁচল বায়ে নিবিয়ে বাতি
কে এল রে, কে এল রে,
    নিঝুম রাতি—নিঝুম রাতি।
বললে খ্যাপা, এই আঁধারে
খুঁজে খুঁজে মরিস কারে,
সে যে নদীর অপর পারে,
    রয়েছে তোর আসার আশায়।

———

রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

অনন্তের ডাক

আকাশের মেঘরন্ধ্রে অন্ধকারে তুমি চেয়ে থাকো—
তারা হয়ে,
আঁখির পলক হারা হয়ে ;
তুমি মোরে ডাকো
আভাসে, ইঙ্গিতে, শত ডাকে ;—
আমি থাকি ক্ষুদ্রতার সীমা নাগপাশে
ধরণীর এক পাশে
বাঁধা শত পাকে—
চারিদিকে স্বার্থ-কোলাহল,
উচ্ছৃঙ্খল
সংগ্রাম সংঘাত
ঘাত প্রতিঘাত,
তবু মাঝে মাঝে আসে কানে
তব ডাক,—উদাস করিয়া দেয় প্রাণে।

চারিদিকে কামনা-অপ্সরী
খেলে লুকোচুরি-খেলা করতলে মোর দুটি চক্ষু চেপে ধরি'
দৃষ্টি রোধ করি' ;
তবু মাঝে মাঝে যেন অঙ্গুলির ফাঁকে,
আঁখির কিরণ তব আসি' মোর লাগে

রাধাচরণ চক্রবর্তী

নয়নের আগে
আলোহিত রাগে।
সে কিরণে ফুটে' উঠে অন্তরের ফুল—
ঊর্ধ্বপানে মেলি' বাহু, আরো ঊর্ধ্বে উঠিতে ব্যাকুল ;
বৃথা ঝাপটিয়া মরে পাপড়ির পাখা শুধু তার,
পা'য় দৃঢ় বাঁধন বোঁটার।

ডাকো, তুমি ডাকো
হে প্রমুক্ত বায়ুর প্রবাহ—বাহিরের হে মুক্তি বৃহৎ,
অবকাশ,—হে শূন্য মহৎ,
বদ্ধ পিঞ্জরের পানে তুমি চেয়ে থাকো ;
আমি পিঞ্জরের পাখি,
ক্ষুদ্র পাত্রে বদ্ধ বারি—ক্ষুদ্র খাদ্যে তৃপ্ত হয়ে থাকি .
নাই নির্ঝরের জল,
গিরি-বন-জাত ফল,
তবু কেন ভ্রান্তি-ভরে ভাবি সুখে আছি,
নিরুদ্বেগে বাঁচি।
কিন্তু থেকে থেকে যবে শুনি তব ভাষ,
পাই তব দৃষ্টির আভাস,
মনে করি চলি আমি ধেয়ে
পাখা মেলি' মহাশূন্য বেয়ে ;
কিন্তু বৃথা—সম্মুখে যে সুদুর্গম পিঞ্জবেব বাধা,
আমি বন্দী-বাঁধা।

যাব, যাব, তবু আমি যাব,—
হে অনন্ত, বলো বলো আমি তোমা পাব।

পাপড়ির ডানা খুলে' তুলে,
মুক্তির আনন্দে দুলে দুলে,
দেখিব পরান পণে
টুটিতে পারি কি নারি বোঁটার বাঁধনে।
জানি আমি হায়,
বোঁটা যাবে টুটে—ম্লান মর্ত্যের মাটিতে প'ড়ে লুটাইবে কায়;
তবু আমি সৌরভের রূপে,
হে অসীম, ভেসে যাব তোমার মাঝারে চুপে চুপে।

মোহিতলাল মজুমদার

বঙ্গলক্ষ্মী

ইতিহাসে খুঁজি তোমা, স্বপ্ন-সুষমায়
গ'ড়ে তুলি অপরূপ মোহিনী মুরতি—
মনোময়ী প্রতিমার করি যে আরতি
বর্ষে বর্ষে, কোজাগর লক্ষ্মী-পূর্ণিমায়।
জ্যোৎস্না-রাতে পদচিহ্ন রাখিলে কোথায়—
খুঁজিয়াছি তরী বেয়ে সারা-ভাগীরথী;
হেরি শুধু ভাঙা-ঘাট বিজন বসতি—
প্রয়াণের পথ-রেখা নদী-সিকতায়।
গেছে রূপ, ছায়া তবু ভাসে যেন চোখে;
হেমন্তের মায়া-মৃগ—স্বর্ণ-মরীচিকা—
ধায় আজো শস্য-শীর্ষে; চম্পকে অশোকে

মোহিতলাল মজুমদার

বসন্ত বিদায় মাগে ; আজো মালবিকা
চেয়ে থাকে অনিমিখ নব মেঘালোকে—
কবির অমর শ্লোকে লভে জয়টিকা।
উপবাসী চাষী কাঁদে শূন্য আঙিনায়,
শরতের পীত-রৌদ্রে দীর্ঘ জর-জ্বালা।
কে গাঁথিবে তরুমূলে শেফালির মালা—
অর্চিবে কমল তুলি' কমলাসনায়।
তুমি লক্ষ্মী ছিলে কবে, আছ কল্পনায় :
নাই ঝাঁপি, আছে শুধু নৈবেদ্যের থালা,
নিত্য পূজা-অভিনয়ে—বৃথা দেয় বালা
গৃহদ্বারে আলিপনা প্রতি পূর্ণিমায়।
ছিলে যবে হে জননী সারা দেশ ভরি'—
তখন করেছি পূজা গৃহদেবী-রূপে ;
আজ তুমি গৃহে নাই, তাই চুপে চুপে
সমগ্র দেশের রূপে মূর্তিখানি গড়ি।
লক্ষ্মীরে চাহি না বটে দীপে আর ধূপে—
বঙ্গলক্ষ্মী ? সেও যে রে ছায়া ধরাধরি।

বন-ভোজন

দিবা-বধূ পরিয়াছে বাকলের শাড়ি, কড়িহার ;
আর্দ্র চুল এলো করি' খুলিয়াছে বিপুল কবরী—
তপন-প্রেয়সী আজ সাজিয়াছে মলিনা শবরী,
সিঁদুর মুছিয়া পরে কালাগুরু ললাটে তাহার।

আজ কাননের ভোজ, তারি হাতে করিবে আহার
যত বৃদ্ধ বনস্পতি , তাই যত্নে অঞ্চল সম্বরি'
কটিতটে সুবৃহৎ থালিকায় পায়সাম্বু ভরি'
ফিরিছে নিকটে দূরে, গুণ্ঠন খসিছে বারবার।

হেরিতেছি সেই শোভা—ধরণীর সে বন-ভোজন।
নিদাঘার্ত তরুরাজি, উপবাসে বিশীর্ণ মলিন—
কী হাসি বিকাশে মুখে, হেরিয়া পারণ-আয়োজন,
পল্লবে পল্লবে স্নিগ্ধ মেঘালোক কী বর্ণে বিলীন।
হরিত, ঈষৎ-পীত, কারো দেহ গাঢ় নীলাঞ্জন—
পিয়িছে শ্যামল-সুধা আঁখি মুদি', বিরাম-বিহীন।

কালাপাহাড়

শুনিছ না—ওই দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের দল
শবভুক যত নিশাচর করে জগৎ জুড়িয়া কী কোলাহল।
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-শিলা।
ধরণীর বুক থরথরি' কাঁপে—এ কী তাণ্ডব নৃত্য-লীলা।
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার।
মানুষের পাপ করিতে মোচন, দেবতারে হানি' ভীম প্রহার,
—কালাপাহাড়।

বংশ যাহার বলি যোগাইল যূপে, যুগে-যুগে, ভয়-বিহ্বল—
জাগিয়াছে তারি বীর-সন্তান হুংকারে ভরি' জলস্থল।

মোহিতলাল মজুমদার

পথে পথে ওই গিরি নুয়ে যায়, কটাক্ষে রবি অস্তমান্‌,
খড়্গ তাহার থির-বিদ্যুৎ—ধূলি-ধ্বজা তার মেঘ-সমান,
সেই আসে ওই—বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা, কাড়া নাকাড়।
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার—
—কালাপাহাড়।

পাষাণ-পুরীর খিল খুলে যায়, দূর হতে শুনি হুহুংকার।
পূজাবেদী-মূলে হেম-তৈজস ঝংকার করে আশঙ্কার।
বেগে বাহিরায় লৌহ-কীলক বিরাট দেউল-কপাট-পাটে।
আঁধার-গহ্বরে জাগে হাহাকার, বিগ্রহ-শীলা আপনি ফাটে।
পূজারী-পাণ্ডা ঝাণ্ডা নামায়ে প্রাঙ্গণ-তলে খায় আছাড়,
ওই আসে—ওই, বাজায়ে দামামা, ভীম নির্ঘোষ কাড়া-নাকাড়,—
—কালাপাহাড়।

অকাল-জলদ-উদয় যেন সে উদিয়াছে কাল কালাপাহাড়,
ডাকিনীরা ওই দলে দলে চলে, গলে দোলে নর-কপাল-হাড়।
রক্ত-শোষণ পাপ-বিভীষিকা, প্রাণ-শিহরণ মন্ত্র-গান,
আঁখি মুদি' ভয়ে জপো অনিবার, অন্ধ-আরতি প্রদীপ-দান—
ঘুচাইতে আসে মহাভয়হারী দেবারি মানব যুগাবতার—
ঘুচাবে কায়ার ছায়া-শৃঙ্খল, চূর্ণ করিবে পাষাণ-ভার।
—কালাপাহাড়।

কতকাল পরে আজ নর-দেহে শোণিতে ধ্বনিছে আগুন-গান।
এতদিন শুধু লাল হোলো বেদী—আজ তার শিখা ধূমায়মান।
আদি হতে যত বেদনা জমেছে—বঞ্চনাহত ব্যর্থশ্বাস—
ওই উঠে তারি প্রলয়-ঝটিকা, ঘোর-গর্জন মহোচ্ছ্বাস।

ভয় পায় ভয়, ভগবান ভাগে,—প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়।
ওই আসে—তার বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা, কাড়া-নাকাড়।
—কালাপাহাড়।

কোটি-আঁখি-ঝরা অশ্রু-নিঝর ঝরিল চরণ-পাষাণ-মূলে,
ক্ষয় হোলো শুধু শিলা-চত্বর—অন্ধের আঁখি গেল না খুলে।
জীবের চেতনা জড়ে বিলাইয়া আঁধারিল কত শুক্ল নিশা,
রক্ত-লোলুপ লোল রসনায় দানিল নিজেরি অমৃত-তৃষা।
আজ তারি শেষ, মোহ অবসান,—দেবতা-দমন যুগাবতার
আসে ওই, তার বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়।
—কালাপাহাড়।

বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা—বাজে কী ভীষণ কাড়া-নাকাড়,
অগ্নি-পতাকা উড়িছে ঈশানে, দুলিছে তাহাতে উল্কা-হার।
অসির ফলকে অশনি ঝলকে—গ'লে যায় যত ত্রিশূল-চূড়া।
ভৈরব রবে মূর্ছিত ধরা, আকাশের ছাদ হয় বা গুঁড়া।
পূজারী অথির, দেবতা বধির—ঘণ্টার রোলে জাগে না আর।
অরাতির দাপে আরতি ফুরায়—নাম শুনে হয় বুক অসাড়।
—কালাপাহাড়

নিজ হাতে পরি' শিকলি দু'পায়, দুর্বল করে যাহারে নতি,
হাত জোড় করি' যাচনা যাহারে, আজ হেরো তার কী দুর্গতি।
কোথায় পিনাক, ডমরু কোথায়, কোথায় চক্র সুদর্শন,
মানুষের কাছে বরাভয় মাগে মন্দিরবাসী অমরগণ।
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার।

মোহিতলাল মজুমদার

ভয়ংকরের ভুল ভেঙে যায়। বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়।

কল্প-কালের কল্পনা যত, শিশু-মানবের নরক-ভয়—
নিবারণ করি' উদিল আজিকে দৈত্য-দানব-পুরঞ্জয়।
দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্বিষহ।
অন্তরে হোলো বাহিরের দাস মানুষের পিতা প্রপিতামহ।
স্তম্ভিত হৃদ্‌পিণ্ডের 'পরে তুলেছে অচল পাষাণ-ভার—
সহিবে কি সেই নিদারুণ গ্লানি মানবসিংহ যুগাবতার,
—কালাপাহাড়।

ভেঙে ফেলো মঠ-মন্দির-চূড়া, দারু-শিলা করো নিমজ্জন,
বলি-উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জন।
নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে, মানুষের বুকে রক্ত চাই।
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার,
ভয়ংকরের ভয় ভেঙে যায়—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,—
—কালাপাহাড়।

ব্রাহ্মণ-যুবা যবনে মিলেছে পবন মিলেছে বহ্নি সাথে।
এ কোন্ বিধাতা বজ্র ধরেছে নব সৃষ্টির প্রলয় রাতে।
মরুর মর্ম বিদারি' বহিছে সুধার উৎস পিপাসাহরা।
কল্লোলে তার বন্যার রোল, কূল ভেঙে বুঝি ভাসায় ধরা।
ওরে ভয় নাই, মুকুটে তাহার নবারুণ-ছটা, ময়ুখ-হার,
কাল-নিশীথিনী লুকায় বসনে।—সবে দিল তাই নাম তাহার
—কালাপাহাড়।

শুনিছ না ওই—দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের পাল।
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগনভাল।
কার পথে-পথে গিরি নুয়ে যায়, কটাক্ষে রবি অস্তমান।
খড়্গ কাহার থির-বিদ্যুৎ, ধূলি-ধ্বজা কার মেঘ-সমান।
ভয় পায় ভয়, ভগবান ভাগে, প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়।
ওই আসে, ওই বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়
—কালাপাহাড়।

সজনীকান্ত দাস

অগ্নিদূত

ফাগুন-দুপুরে আগুন জ্বলিছে
খাঁ খাঁ করে চারিদিক,
ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর শূন্য ছাদের 'পরে—
সৃজন করিছে দগ্ধ মরুর
মরীচিকা যেন ঠিক ;
শ্মশান নগরী ঝিমায় তন্দ্রাভরে।
অর্গল-আঁটা সব বাতায়নে,
পাণ্ডুর নীলাকাশ,
ঝাঁকে ঝাঁকে চিল উড়িছে কিসের লোভে ;
কপোত-কপোতী আলিসার কোণে
ফেলিছে ক্লান্ত শ্বাস,
কা কা করে কাক যেন কী মনঃক্ষোভে।

সজনীকান্ত দাস

পতিতপত্র দেবদারু-শাখে
ঝলসিছে কিশলয়,
নারিকেল তরু এলায়েছে পাতাগুলি।
চড়াই খুঁজিছে শূন্য খোপেতে
সুনিভৃত আশ্রয়;—
তপ্ত উঠানে ফেরে না কাকলি তুলি'।
ঘূর্ণী হাওয়ায় শুষ্কপত্র
ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়ে,
ধূলি-কুণ্ডলী কভু বা ধরিছে ফণা,
বাতাস কাঁদিছে অতি দূরে কোথা
চাপা কান্নার সুরে
ফাগুন আগুনে যেন সে ক্ষুণ্ণমনা।
নীলিমা ধূসর, পাণ্ডু সবুজ,
দিবসে গভীর রাতি,
রৌদ্র রচিছে বিজন নিশীথ মোহ;
কাকেরা জাগিছে আর্তকণ্ঠে
জ্বালায়ে দিনের বাতি,
তন্দ্রালুপ্ত দিবসের সমারোহ।
পসরা নামায়ে পসারী ঘুমায়—
ছায়া-করা দাওয়া খানি;
উলঙ্গ শিশু মেঝেতে উপুড় হয়ে
নিদ্রিতা মা'র পরশ লভিছে
বুকের বসন টানি'।
আঁখিপাতা তার টেনে ধরে সংশয়ে।
কোনো বিরহিণী বাতায়ন ফাঁকে
চাহিয়া দূরের পানে

দেখে চারিদিকে খাঁ খাঁ মরু সুবিজন,—
শূন্যতা শুধু শূন্যতা আনে
চিন্তাবিহীন প্রাণে
অজানা কারণে ভরে ওঠে আঁখি কোণ।
কাবুলি একটি লাঠি হাতে তার
বসেছে গলির কোণে—
শূন্য মনেতে ভুলিয়াছে ঠাঁই-কাল,
পাহাড়ি দেশের বাহারি সখীরে
পড়ে বুঝি তার মনে,
সুদ আর টাকা মনে হয় জঞ্জাল।
ধূলি ওড়ে শুধু রহিয়া রহিয়া
পথিকবিহীন পথে
ঘুমায় কুকুর বিরল পত্রছায়,
রৌদ্রদগ্ধ অন্ধ ভিখারী
পথে বসি' কোনো মতে;
প্রার্থনা, মুখে অতি ক্ষীণ বাহিরায়।
গরীবের বধূ একেলা বসিয়া
সেলাই করিছে কিছু,
অথবা বাসন মাজিছে শান্তমনে।
আফিসে কেরানি লিখিতেছে খাতা
মাথাটি করিয়া নিচু—
হতাশে নিশাস ফেলিয়া ক্ষণে ক্ষণে।
বাহিরে তাকায়ে দেখে লালে লাল
কৃষ্ণচূড়ার শাখা,
নাগকেশরের গন্ধ ভাসিয়া আসে;
যক্ষপরীর কাজ কোলাহল

সজনীকান্ত দাস

ক্ষণেক পড়িতে ঢাকা
ভাবে অদৃষ্ট দরিদ্রে পরিহাসে।
খাঁখাঁ চারিদিক নগরের বায়ু
উষ্ণ রৌদ্র তাপে
কী যেন মোহের স্বপন মনেতে আনে ;
ফাগুন দিবসে বিরহী যক্ষ
নিষ্ঠুর কা'র শাপে
আগুন পাঠাল প্রেয়সীর সন্ধানে।

প্রেমের দেবতা

প্রেমের দেবতা তোমারে প্রণাম করি।
মানবের প্রেমে মানবী গর্ভে মানবের দেহ ধরি'
কত যন্ত্রণা সহিয়াছ পলে পলে,
প্রেমের পরীক্ষায়
নিমেষের তরে না মানিয়া পরাজয়,
যাহারা তোমার লাঞ্ছনা মাঝে উল্লাস করিয়াছে
সেই মূঢ়দের যত করিয়াছ ক্ষমা,
এই অনাগত ভবিষ্যতের অনাগত মানুষেরে
স্মরণ করিয়া বিলায়েছ যত প্রেম,
আজিকে আমার বক্ষের মাঝে করি আমি অনুভব
সেই যন্ত্রণা, সেই ক্ষমা, সেই প্রেম ;
যন্ত্রণা সীমাহীন,
ক্ষমা সে অসম্ভব,
সর্ব বিজয়ী সেই অপরূপ প্রেম।

বিস্ময় মানি তোমার মহিমা স্মরি',
প্রেমের দেবতা, তোমারে প্রণাম করি।

হে প্রভু, তোমার সেই প্রেম আজ কবরে পড়েছে চাপা ?
তুমি ফিরে আসো নাই ?
জগৎ ব্যাপিয়া হিংসার হানাহানি,
স্বার্থের সংঘাত।
তব নাম লয়ে মুখে
তোমার প্রেমের অপমান করে যারা,
নিখিলের আলো কালো হয়ে এল তাদের বিষোদ্গারে ;
হে আলোর দূত, তুমি কোথা, কোথা তুমি।
তোমারে এখন সাজে কি পিতার কোল।
মানুষের প্রেমে মানুষ হয়েছে যেবা
এই উপেক্ষা হে প্রভু, সাজে না তাঁর।

মৃত সাগরের চারি পাড়ে আজ আমরা করেছি ভিড়,
ভিড় করিয়াছি গাঢ় তিমিরের তীরে,
কাঁদিতেছি অনাহারে—
রুটি নাই প্রভু, মাছের টুকরা নাই।
তুমি এসো এসো, এ মৃত-সাগর পায়ে হেঁটে হও পার,
ভাস্বর দেহে দাঁড়াও অন্ধকারে ;
ক্ষুধিত জনেরে রুটি দাও, জল দাও—
প্রেম দাও প্রভু, তোমার অমর প্রেম।
ধন্য করেছ মানুষে একদা মানুষের রূপ ধরি',

সে মানব মরিয়াছে—
তোমার পরশে মৃতেরা লভুক প্রাণ।

বনফুল

ছাত্রী ও ছাত্র

ছাত্রী ও ছাত্র,
চিরকালই হয় তারা
নিন্দার পাত্র।
পড়াশোনা ব্যাপারেতে মন নাই কারু বা,
বেশ-বিন্যাসে কেউ চক্‌চকে চারু বা,
আধুনিকমনা কেহ সিনেমার ভক্ত
গদ্দরধারী কারো মতামত শক্ত,
কেউ ভারি ভীতু-ভীতু—কেউ বেশি ক্ষাত্র,
ছাত্রী ও ছাত্র।

সাহিত্যে কারো ঝোঁক—কারো গীত বাদ্যে,
রুচি কারো হোটেলের পানীয়ে বা খাদ্যে,
ফাজিল বুদ্ধি কারো,—কেউ কিছু হুজুকে,
ভারি ভয় করে কারো পরীক্ষা-জুজুকে
তাই সার করিয়াছে 'নোটবুক' মাত্র,
ছাত্রী ও ছাত্র।

কারো চুল, কারো ফুল, কারো সাধ নূপুরে,
'ব্যাটিং' করিছে কেহ কাট-ফাটা দুপুরে,
সাঁতার কাটিছে কেউ,—কেহ সাধে চাঁদা যে,
থিয়েটার হবে তার 'স্টেজ্' চাই বাঁধা যে,
এর তার বাড়ি বাড়ি ঘোরে দিবারাত্র,
ছাত্রী ও ছাত্র।

ক্রমাগত পড়ে কেহ ফেল করে তবু যে,
পাশ করে গেল হায় পড়িল না কভু যে,
'বইপোকা' ভালো ছেলে ভাঙা তার স্বাস্থ্য,
গিলিতেছে মোটামোটা বইগুলো আস্ত,
"ও কলেজ ফার্স্ট হবে ?" জ্বলে তার গাত্র।
ছাত্রী ও ছাত্র।

আছে জানি তাহাদের বহুবিধ দোষ গো,
দেখে শুনে মাঝে মাঝে হয় ভারি রোষ গো!
আসলে রাগের চেয়ে হয় বেশি হিংসে,
ভিড়িয়া যেতাম দলে, গজায়েছে শিং যে।
কিন্তু সহসা যদি আসি কন দেবতা
"ও জীবন ফিরে চাও ?" এক্ষনি নেব তা
না করি ইতস্তত সামান্য মাত্র।
ছাত্রী ও ছাত্র।

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

ধরণীর বুকে

ধরণীর বুকে,
ধুলায় লভেছি জন্ম, দেবত্বের নাহি অহমিকা—
সর্ব অঙ্গে মাখি ধূলি, আঁকি ভালে পঙ্ক-জয়টিকা
পথ বাহি চলি গর্ব-সুখে,
স্বর্গপানে তুলি শির অশ্রুসিক্ত সমুজ্জ্বল মুখে।

দম্ভভরে খরদৃষ্টি হানে,
যাহারা দাঁড়ায়ে দূরে নাহি চাহি তাহাদের পানে,—
দাঁড়ায়ে মাটির পরে স্বরগের করে অভিনয়—
তারা—মোর নয়, কেহ নয়।

ভূমিতলে পড়েছে ঝরিয়া,
শুষ্ক শীর্ণ যে কুসুম মধ্যাহ্নের খর রবিকরে,
ছিন্নদল লুটাইছে বাত্যাবেগে পথধূলি পরে—
তাই দিয়ে সাজি মোর ভরি,
তাই নিয়ে গাঁথি মালা, সেই মালা গলে তুলে পরি।
এই অলংকার,
এই মোর রাজ-মাল্য, এই ঋদ্ধি, এই অহংকার।

ধরণীর জন্মতিথি হতে
মানুষ ভাসিয়া চলে দুঃখ-জ্বালা-বেদনার স্রোতে,
শঙ্কা ও সংশয় দ্বিধা লজ্জা ভয় সংঘাতে ফেনিল

নিখিলের ঘূর্ণী জলতলে,
ফুটিছে ছুটিছে নিত্য জীবন-বুদ্বুদ পলে পলে।
তরঙ্গের মন্দ্রিত ভাষণে
যত বেদনার হাহা ডুবে যায় কেহ নাহি শোনে,
আমি কান পাতি
সুর খুঁজি তারি মাঝে, তাই দিয়ে গান মোর গাঁথি।

মানুষেরে মানুষ করিয়া—
রক্ত দিয়া অস্থি দিয়া ভ্রান্তি দিয়া তুলেছ গড়িয়া,
অতি ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্রতম সুখোৎসব মাঝে
মৃত্যুরে বসায়ে দেছ মর্মহীন প্রহরীর সাজে।
বুকে দিলে তৃষ্ণা ক্ষুধা নিত্যকার দাবানল শিখা,
সুধাপাত্র নাহি দিলে। অবিশ্রান্ত চল মরীচিকা—
তাহারি পশ্চাতে ছুটে তৃষ্ণাহত অসংখ্য পথিক,
না মানে বন্ধন বাধা, নাহি জানে কোথা দিক্‌বিদিক্‌;
উড়িছে খেলিছে ধূলি রবিতপ্ত মরুভূর বুকে
তারি মাঝে খোঁজে পথ অন্ধ আঁখি শুষ্কশীর্ণ মুখে—
তাহাদেরি সাথে
যাত্রা করিয়াছি আমি হাত বাঁধি' তাহাদেরি হাতে।

কোনোদিন শুনি নাই গান,
আনন্দ কোথায় আছে মিলে নাই তাহার সন্ধান।
কোন্‌ গুপ্ত সুরপুরে চিরশ্যাম পারিজাত-মূলে
দেবভোগ্যা নিত্যধারা অনাবর্ত মন্দাকিনী কূলে
লক্ষ সুরপ্রহরীর কবচের লৌহের প্রাকার;

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র

তারি আবরণ তলে দেবতার চলে নিত্যকার
আনন্দ-অমৃত পান—নাহি জানি তাহার আস্বাদ।
বাঁটিয়া দিয়াছ যাহা—ত্রুটিচ্যুতি ভ্রম পরমাদ
অণু পরিমাণ আশা ঘন মেঘে বিজলীর পারা,
অশ্রুর জোয়ারে স্ফীতা বহমান মৃত্যুস্রোত ধারা—
তারি তরে অঞ্জলি বিথারি'
বিমূঢ় উদ্‌ভ্রান্ত গতি ছুটে চলি কোটি নরনারী।
যা দিয়েছ—মুঠা ভরি' তাই তুলি' করেছি সঞ্চয়—
উৎসুক অধর হতে অমৃতের লভি' পরিচয়
ক্ষুদ্র এক ক্ষণ তরে, ছন্দে গাহি নিত্য তার জয়।
পলে পলে বক্ষ হতে মৃত্যু যারে কাড়ি ল'য়ে যায়
তাহারে বাঁচাতে চাহি মরমের স্মৃতি-অমরায়,
দুই কর জোড় করি' তারে দিই অশ্রু উপহার—
ইতিহাস প্রতিদিনকার।

যুগশেষে আসে যুগ, বহি আনি সেই এক ভাষা—
অপূর্ণ অতৃপ্ত সাধ আশা।
প্রবঞ্চিত পিপাসার হাহাকারে দিক ওঠে ভরি',
কম্পমান কর হতে পানপাত্র খসি' যায় পড়ি'—
করি আর্তনাদ
জল মানি' বালুরাশি মুঠা মুঠা খুঁড়িছে উন্মাদ।
আর্তস্বর এই ঐক্যতান
তারি তালে ছন্দ গাঁথি, তারি সুরে রচি মোর গান।
নিরাশা সংশয় ভয় তৃষ্ণা ক্ষুধা দুর্বলতা দিয়া
নিত্য নব ভুবন সৃজিয়া,

গতিভ্রষ্ট নক্ষত্রের দলে
মুঠি মুঠি কুড়াইয়া সৌধ গড়ি' নীলাকাশ তলে।

কৃষ্ণধন দে

ধুতুরাফুলের ব্যথা

দেব্‌তা, দীনের গোপন ব্যথা তুমিই একা ফেললে ধ'রে।
ঘরছাড়া এই সবহারাকে বাঁধলে শেষে স্নেহের ডোরে।
মৌমাছিরা পায় না মধু,
গাঁথতে মালা চায় না বধু,
সবাই আমার কাছ থেকে হায়, হয়তো ঘৃণায় পালায় স'রে,
তুমিই শুধু রাখলে আমায় কানের 'পরে কেমন ক'রে।

গরল তুমি কণ্ঠে ধরো, অমৃত-ভাগ চাও না এসে,
বীভৎস ওই হাড়ের মালা সাজায় তোমায় মোহন বেশে।
সবার চেয়ে তুচ্ছ যে ছাই,
তাই যে মাখো অঙ্গে সদাই,
কুটিল ফণীর বিষের ফেণা উথ্‌লে ওঠে জটিল কেশে,
শ্মশান তোমার বিহার-ভূমি, সেথায় ফেরো অট্ট হেসে।

বিশ্ব করে যাহার পূজা তাকেই তুমি ভস্ম করো;
শির পাতি' হায় আকাশ থেকে তুমিই একা গঙ্গা ধরো;
চর্ম বাঘের উত্তরীয়,
ডম্বরু যে তোমার প্রিয়,

হে নটরাজ, নৃত্যে তোমার নিখিলজনের শঙ্কা হরো :
তুচ্ছ যাহা, ঘৃণ্য যাহা, ভূষণ ব'লে তাহাই পরো।

দেব্‌তা একা তুমিই বোঝো অনাদৃতের ব্যথার বাণী :
দম্ভতেজের দক্ষগুলোয় করেছ বধ ত্রিশূলপাণি।
তুমিই একা স্বর্গপুরে
ভেদ রাখোনি সুর-অসুরে,
তুমিই অসুর জয় করেছ তাদের শিরে আশিস দানি,'
মহৎ তুমি, পেয়েছ তাই সব-উপরের আসনখানি।

আমায় তুমি করলে বড়ো, এই বেদনাই মরম দহে ;
অনাদর আর ঘৃণার বোঝা এর চেয়ে যে বরং সহে।
ভুল করেছ হে ভোলানাথ,
আর দিয়ো না স্নেহের আঘাত,
পথের ধুলায় স্থান যে আমার, তোমার দয়ার স্বর্গে নহে।
জগৎ উপহাসের ছলে তোমায় যে আজ পাগল কহে।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

অয়ি সন্ধ্যা মায়াবিনী

অয়ি সন্ধ্যা মায়াবিনী,
মোরে সাথে নাও সাথে নাও—
পরিশ্রান্ত আঁখিপাতে তুমি যেন সুখময় নিদ্রার আবেশ,
তুমি যেন কোন্ ক্লান্ত প্রিয়ের প্রেয়সী,
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

যবে তুমি তব কৃষ্ণ অঞ্চল-ছায়ায়,
এই ক্ষুদ্র ভূমণ্ডল ওই নীল নভোপারাবার
ধীরে ধীরে ঢাকি' যাও আঁকি' যাও—
হে কৃষ্ণ-অঞ্চলা মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

মোরে সাথে নাও সাথে নাও
হে রহস্যময়ী—
ক্লান্ত আজি হৃদয়ের দোলা,
প্রাণে আজি স্বপ্নহীন বৃত্তিহীন তৃপ্তিহীন ছায়া,
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।
লাজ-রক্ত মুখে যবে রবি ঢলে পশ্চিম-অচলে,
ভাবে বুঝি বৃথা কাজে কাটায়েছে সারাদিন বৃথা খেলা খেলি' ;

তুমি ধীর পাদক্ষেপে মন্থর গমনে,
মহিয়সী সম্রাজ্ঞীর মতো,
বিছাইয়া কৃষ্ণাঞ্চল অচঞ্চল মনে
ধীরে ধীরে তরঙ্গিত সিন্ধু-'পর দিয়া
নাহি জানি চলি যাও কার পানে কাহার উদ্দেশে,
কিন্তু জানি শুধু মোর অশান্ত হৃদয়
তুমি দলি' যাও ছলি' যাও,
হে রহস্যময়ী মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

মোরে সাথে নাও অয়ি সন্ধ্যা জাদুকরী,
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

গাভীদল গোষ্ঠ হতে ফিরে গেছে আপন গোহালে,
শিশুরা ফিরেছে সব খেলা শেষে পাখি সম
আপন আপন কুলায়ে,

নূপুর রণনা তুলি' কণ্ঠ-কাকলীতে
রঙ্গিণীরা ফিরে গেছে নদী-তীর হতে
আর্দ্র বাসে কক্ষে লয়ে বারি ;—

বনতলে অন্ধকার নামে আসি' বাদুড়ের পাখার ঝাপটে,
ঝিঁঝিঁ দলে বেত্র বনে ক্ষুর সম সুর দিয়া বাতাসেরে করিছে চৌচির,
জোনাকিরা দীপ জ্বালি' খুঁজি' ফেরে বুঝি কোন্ রত্নের সন্ধান,
তীর নীর ঘাট বাট অরণ্য প্রান্তর ধীরে এক হয়ে আসে
জাদুকরী তব জাদু দৃষ্টির শাসনে—
সেই সঙ্গে মোর যেন প্রাণের স্পন্দনে
মোর যেন আকুল ক্রন্দনে
ধীরে ধীরে সুষুপ্তির রাগিণী বুলাও,
অয়ি সন্ধ্যা জাদুকরী মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

মোরে সাথে নাও সাথে নাও হে গাম্ভীর্যময়ী
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।
আমিও তোমার মাঝে মৌন হয়ে রবো
ওই নীল তারা-ঘেরা স্বপ্ন-দেখা আকাশের মতো
মৃদুতম করি' মোর প্রাণের স্পন্দন,
স্মৃতিমাঝে না রাখিব সূক্ষ্মতম বিলাপের রেখা
আক্ষেপের লেশ—
অতীত অতীত হোক—নিঃশেষ অতীত।

তুমি শুধু ধীরে ধীরে, তুমি শুধু মোহময় সুরে
মোর আঁখিপাতে মোর প্রাণের স্পন্দনে
মোর ধমনীতে মোর শোণিত ধারায়
ভবিষ্যের স্বপ্ন আঁকো,—
নব ভবিষ্যের শুধু গুঞ্জন শুনাও
হে গাম্ভীর্যময়ী মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

অয়ি সন্ধ্যা কুহকিনী মোরে সাথে নাও সাথে নাও,
ভবিষ্যের মাতা তুমি, ধাত্রী তুমি অয়ি নবীন উষার,
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।
তব গর্ভে জাগিতেছে নব শৈশবের নব হাসির সংগীত
তোমারি আঁধার বুকে সঞ্চি' ওঠে ধীরে ধীরে স্তন্য ক্ষীর সম
প্রাণ-গড়া নির্ঝরিণী,
সারা নিশা তারা-ঘেরা আকাশের সুরে
কোন্ নব সৃজনের যুক্তি চলে তারায় তারায়
বার্তা তার ফেরে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে
ঋষি-কণ্ঠে মন্ত্রসম,
তারি মাঝে পাতিয়া আসন
জরাময় অতীতের জীর্ণ স্মৃতি হতে
নিঃশেষে কাড়িয়া মোরে
মোর কানে মোর প্রাণে, আবেগ চঞ্চল
নব সৃজনের শুধু কাহিনী শুনাও
ভবিষ্যের মাতা অয়ি সন্ধ্যা-কুহকিনী
মোরে সাথে নাও সাথে নাও।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ঘরের মায়া

পিছনে উঠিছে ঝড় সম্মুখেতে অন্ধকার বন
নাম মাত্র পথ রেখা তাও আজ হয়েছে নির্জন ;
চরণ চলে না আর দেহলতা কাঁপে থর থর
কণ্টকে সংকট পথ চোখ দুটি জলে ভর ভর।
তবু যে গো যেতে হবে থেমে থাকা মরণের দায় ;
কেন মিছে থেমে যাও হে পথিক, ঘরের মায়ায়।

সর্বহারা মহা প্রাণ তাহারে কে রাখে বন্ধ ক'রে
আলোর ইশারা আসে প্রতিদিন তারই অন্ধ ঘরে।
মৃত দেহ আগুলিয়া সেই আছে নিশিদিনমান
কে জানে আসিবে কবে একবিন্দু অমৃতের দান।

আজও যারা মরে নাই

আজও যারা মরে নাই, প্রজ্জলিত মৃত্যুযজ্ঞশালে
সমিধ সংগ্রহে ব্যস্ত, ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দিকচক্রবালে
উৎকর্ণ হইয়া আছে প্রত্যাসন্ন আহ্বানের লাগি',
দুর্বিষহ দিবসের গ্লানি ঢাকে অন্ধ নিশা জাগি'
বিস্ফারিত নেত্রপাতে তা'রা দেখে নব সূর্যোদয়
তাদেরই নির্ভীক কণ্ঠে বিশ্বপ্রাণ লভিবে অভয়।

আজও যারা মরে নাই মরিবার সহস্র কারণে,
খুঁজিয়া পেয়েছে বাণী ধিক্কৃত এ জীবন ধারণে,
অকরুণ বঞ্চনায় অবহেলি' শুনিছে প্রহর,
সশস্ত্র লাঞ্ছনা মাঝে তুলিতেছে হাসির লহর,
মরিয়া না মরে তা'রা, অনিবার্য মৃত্যুপথগামী
রুধিরাক্ত চক্রনেমি তাদেরি ইঙ্গিতে যাবে থামি'।

আজও যারা মরে নাই, মরিবে না তা'রা কোনো কালে
অমৃতের জয়টিকা চিরাঙ্কিত তাহাদেরি ভালে।

নরেন্দ্র দেব

আকাশ-প্রদীপ

কুহেলী-আচ্ছন্ন-ঘন শিশির-সন্ধ্যার অন্ধকারে
কে যেন প্রসারি' দীপ আকাশের নীহারিকা পারে
মেলিয়া সাগ্রহ দৃষ্টি অন্বেষিছে কোথা শূন্য-সীমা—
সন্ধানে ব্যাকুল যেন নিঃশেষিয়া অনন্ত নীলিমা।
অনিমেষ প্রতীক্ষায় আছে চাহি ছায়াপথ পরে।
সময় গিয়েছে চলি ; কে যেন ফেরেনি তবু ঘরে
গগন গহন হতে ;

তারায় তারায় সে কি তার
তুলিয়া প্রদীপখানি খুঁজিয়া ফিরিছে বারে বার
হারানো সে বন্ধুটিরে ?

নরেন্দ্র দেব

বহু যুগ হয়েছে অতীত।
ঋতু-চক্র এল ঘুরে ; দূরে ওই আসে বৃদ্ধ শীত ,
রজনী বাড়িয়া চলে বিদলিয়া স্বল্প-আয়ু দিনে ;
প্রভাতের অশ্রুকণা কাতরে লুটায় তৃণে তৃণে ;
কেঁপে ওঠে চ্যুত পত্রে অতি মৃদু পদশব্দ কার।
অরণ্য মর্মরে যেন রণি' উঠে ধ্বনি বেদনার।

শরতের স্বর্ণ-আভা ঝলমলি কাঁপে যে লগনে
সদ্য ধৌত ধরণীর শ্যাম স্নিগ্ধ নির্মল প্রাঙ্গণে
অজস্র কাশের হাসি শুচি-শুভ্র ওঠে বিকশিয়া
নন্দিত আনন্দরসে নিখিলের বন্দনার হিয়া।
শুধু তব অন্তরের অবরুদ্ধ পাষাণ মন্দিরে
নিঃসঙ্গ সমাধি কা'র তিতিয়া উঠিছে অশ্রুনীরে।
লোকে লোকে শুরু হোলে হেমন্তের হিম-অভিযান,
স্পর্শে অকস্মাৎ—উচকিত হয়ে ওঠে প্রাণ—
তোমার মর্মের মাঝে।

আকাশে প্রদীপ জ্বালি' তাই,
গৃহবলভির চূড়ে তুলে ধরি' ভাবো—যদি পাই- -
নক্ষত্র নগর পথে আচম্বিতে তাহার সন্ধান ?

তোমার ও দীপশিখা দীপ্ত হয়ে করিবে আহ্বান
অখণ্ড আঁধারে তারে, কে তোমারে হেন আশা দিল—।
খোঁজা কি করেছ শেষ—যেথা তার যত দেশ ছিল।

প্রমথ বিশি

যেদিকে নয়ন তুলি

যেদিকে নয়ন তুলি, হেরি চিত্রবৎ
শ্যামা ধরণীর স্নেহ উঠেছে উচ্ছ্বাসি'
সুনীল পর্বত শৃঙ্গে ; তরঙ্গিত পথ
গেছে দূরে ; ম্লান রবি, দেখা দেয় আসি'
বন্য কৃষ্ণসার সম সন্ধ্যার আঁধার
কোন্ গুপ্ত গুহা হতে মেলি' ত্রস্ত আঁখি ;
পশ্চিম পর্বতচূড়া ধীরে হয়ে পার
মহুয়া-পাণ্ডুর চাঁদ স্বপ্ন দেয় আঁকি'।
জানি জানি কী আনন্দে ফুল হয় ফল ;
দ্বিতীয়ার ক্ষীণ শশী পলকে পলকে
ধেয়ে চলে পূর্ণিমায় ; বিশ্বের অতল
রহস্য ভেদিয়া তুমি কেমনে এ চোখে
ধরা দিলে। কে বলিবে কেমনে আবার
সকলেরে ছেড়ে হোলে একান্ত আমার ॥

খোয়াই

শূন্য-হৃদয়ের মতো রয়েছে পড়িয়া
দিগন্ত ভরিয়া
রক্তিম কাঁকর-ঢালা ধূসর খোয়াই।
যে দিকেতে চাই

প্রমথ বিশি

শীর্ণ মাঠ ছেয়ে আছে কণ্টক অশেষ ;
অতৃপ্তির দেশ
ফিরে-আসা বসন্তের অলক্ষ্য হাওয়ায়
করে হায় হায়।

বারে বারে নুয়ে নুয়ে পড়ে যবে মন,
ফাল্গুনের বন
পর্যাপ্ত-মুকুল ভারে বিদ্রূপের প্রায়
চক্ষে যবে ভায় ;
আশাহীন অতি দীর্ঘ বিরহের মতো
প্রান্তর সতত
নীরস-কারুণ্যে ভরি' দেয় বক্ষ মোর,
কাঁপে চক্ষে লোর।

সূর্যাস্তের শেষ রশ্মি বনান্তের কোলে
ক্ষণকাল দোলে।
তারপরে কখন যে দিগন্তের গায়
মিশে মুছে যায়।
গগনের রক্ত-পটে তাল তরু রেখা
যায় ক্ষীণ দেখা ;
দেখা-না-দেখার মাঝে কাঁপিতে কাঁপিতে
মিলায় চকিতে।

গেরুয়া মাটির ঢেউ বৈরাগ্যের প্রায়
উঠিয়া হেথায়

তরঙ্গিয়া চলে গেছে দূর হতে দূরে
আবর্তিয়া ঘুরে,
ধূসর বালুতে আর নীরস নুড়িতে
ঘুরিতে ঘুরিতে—
কাছে হতে বাহিরিয়া গেছে কোন্ দূর
উপল-বন্ধুর।
লক্ষ্য-হারা মাঠে এই শ্রান্ত মোর হিয়া
দিব বিছাইয়া—
আকার বিহীন এই প্রান্তরের প্রায়
চিত্ত মোর হায়
আপনি বুঝিতে নারে, আপনি যা বলে ;
নিজ অশ্রুজলে
নিজেই ডুবিয়া মরে তল নাহি পাই,
অতল খোয়াই।

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

আগমনী

আজকে শুধু এনো তুমি ভোরবেলার ঐ হাসি,
ফুটবে তাতে বনবীথির ঝরাফুলের রাশি।
সেই জোয়ারে করব আমি স্নান,
গঙ্গোত্তরী অভিষেকের
পুণ্যভরা প্রাণ।

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

জটার মাঝে ছলছলিয়ে
এলে তুমি কল্‌কলিয়ে,
স্বর্গ থেকে নিয়ে এলে মন্দাকিনীর বান ;
সেই রাগিণী শ্রুতিধারে
নারদ তাঁহার বীণার তারে, বেঁধেছিলেন গান।
আনো নাই তো তোমার সাথে কাজের কোনো তাড়া,
নীড়ের থেকে ছুটে-যাওয়ার পাখির ডানা নাড়া।
আনলে শুধু ধৌত স্নাত একটি সকালবেলা
মন্দ বায়ে পদ্মবনের দোলা খাওয়ার খেলা।
অরুণ তখন ঘুমিয়ে আছে তরুণ সূর্যরথে,
যাত্রা হয়নি শুরু তখন বিশ্বভ্রমণ পথে ;
শুধু একটু শিশিরসিক্ত বায়ু,
এনেছিল পাগল হয়ে বয়ে
তাবালোকের আয়ু।

বোঁটার থেকে খসে যেমন ফুল,
আলোয় যেমন হঠাৎ কাটে ভুল,
ননী যেমন কিরণ হয়ে গলে,
ময়লা কাটে জলের ছলছলে,
তেমনি যেন হৃদয়খানি মোর
শতযুগের গ্রন্থি ছিঁড়ে কাটল মোহডোর ;
দড়িছেঁড়া নায়ের মতন ছুটল ভেসে ভেসে
আনন্দেরই স্বপ্নহারা স্মৃতির উদ্দেশে।

অমিয় চক্রবর্তী

সংগতি

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া, আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে খেত চাটা,—
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,
প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।
তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।

দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গীহারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রং তার আঁকা।

অমিয় চক্রবর্তী

প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
—মেলাবেন।
তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।
মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো,
যাবা স'বে যায় তারা শুধু—লোকগুলো ;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
কেন কিছু আছে বোঝানো, কিছু বা বোঝা না যায়—
মেলাবেন।
দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন ॥

বৃষ্টি

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে,
মরুময় দীর্ঘতিয়াসার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যাম রোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
ধানের খেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষা ধারাজলে ॥

যাই ভিজে ঘাসে ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে
স্তম্ভিত দিঘির জলে, স্তরে স্তরে, আকাশে মাটিতে।

ধ্বনিত টিনের ছাদে, গলিতে, গ্রামের আর্দ্র মাঠে
জলের ডাহুকী ডাকে, প্রাচীন জলের কলরবে ;
চঞ্চল পাখির নীড়ে ; বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥

অন্ধকার বর্ষাদিনে বৃষ্টি ঝরে জলের নির্ঝরে
গতির অসংখ্য বেগে, অবিশ্রাম জাগ্রত সঞ্চারে, স্বপ্নবেগে
সঞ্চলিত মেঘে, মাঠে, কম্পিত মাটির অনুপ্রাণে
গেরুয়া পাথরে জল পড়ে, অরণ্য তরঙ্গ শীর্ষে, মাঠে
ফিরে নামে মর্মজল সমুদ্রে মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে ॥

মেঘে মাঠে শুভক্ষণে ঐক্যধারে
বিদ্যুতে
আগুনে
ঘূর্ণাঝড়ে
সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষাজলধারে ॥

রচিত বৃষ্টির পারে, রৌদ্র মাটি, রুদ্র দিন, দূর,
উদাসীন মাঠে মাঠে আকাশেতে লগ্নহীন সুর ॥

গোলাম মোস্তাফা

পল্লী-মা

পল্লী-মায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চ'লে প্রবাস-পথে,
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাষ্পরথে।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে,
বিদায়-বেলার বিয়োগ-ব্যথা অশ্রু আনে দুই নয়ানে।

চির-চেনার গণ্ডী কেটে বাইরে এসে আজকে প্রাতে
নূতন করে দেখা হোলো অনাদৃতা মায়ের সাথে ;
ভক্তি-পূজা দিই নি যারে ভুলেও যাহার বক্ষে থেকে—
নম্রশিরে প্রণাম করি দূর হতে তার মূর্তি দেখে।

স্নেহময়ীর রূপ ধ'রে মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের 'পরে,
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিক হতে ওই দিগন্তরে।
ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে চৌদিকে তার আঙ্গিনাতে,
দেখছে মা সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিমাতে।

ওই যে মাঠে চরছে গোরু লেজ দুলিয়ে মনের সুখে ;
ওই যে পাখির গানের সুরে কাঁপন জাগে বনের বুকে ;
মাথাল-মাথায়, কাস্তে-হাতে, ওই যে চলে কালো চাষা,
ওরাই মায়ের আপন ছেলে—ওরাই মায়ের ভালবাসা।

রাখাল ছেলে চরায় ধেনু, বাজায় বেণু অশথ-মূলে,
সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের খেত ওই উঠল দুলে ;
সেই গানেরই পুলক লেগে বিলের জলের বাঁধন টুটে'
মায়ের মুখের হাসির মতো কমল-কলি উঠল ফুটে।

দুপুর-বেলায় রৌদ্র-তাপে ক্লান্ত হয়ে কৃষক-ভায়া
বসল এসে গাছের তলে ভুঞ্জিতে তার স্নিগ্ধ ছায়া ;
মাথার উপর ঘন-নিবিড় কচি-কচি ওই যে পাতা,
ওরা যে মা'র আপন হাতে তৈরি করা মাঠের ছাতা।

সবুজ ধানে মাঠ ছেয়েছে, কৃষক তাহা দেখলে চেয়ে,
রঙিন আশার স্বপ্ন এল নীল-নয়নের আকাশ ছেয়ে।
ওদেরই ও ঘরের জিনিস, আমরা যেন পরের ছেলে,
মোদের ওতে নাই অধিকার—ওরা দিলে তবেই মেলে।

ওই যে লাউয়ের জংলা-পাতা ঘর দেখা যায় একটু দূরে,
কৃষক-বালা আসছে ফিরে পুকুর হতে কলসী পূরে' ;
ওই কুঁড়ে ঘর—উহার মাঝেই যে চির-সুখ বিরাজ করে,
নাই রে সে সুখ অট্টালিকায়, নাই রে সে সুখ রাজার ঘরে।

কত গভীর তৃপ্তি যে গো লুকিয়ে আছে পল্লী-প্রাণে,
জানুক কেহ, নাই বা জানুক,—সে কথা মোর মনই জানে।
মায়ের গোপন বিত্ত যা, তার খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু,
মোদের মতো তাই ওরা আর ছুটেনাকো মোহের পিছু।

———

গোলাম মোস্তাফা

কিশোর

আমরা নূতন, আমরা কুঁড়ি, নিখিল-মানব-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি-পাতার বন্ধনে।

সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটব মোরাও ফুটব গো,
প্রভাত-রবির সোনার আলো দু'হাত দিয়ে লুটব গো।
নিত্য নবীন গৌরবে ছড়িয়ে দিব সৌরভে,
আকাশ পানে তুলব মাথা, সকল বাঁধন টুটব গো।

সাগর-জলে পাল উড়িয়ে কেউ বা হব নিরুদ্দেশ ;
কলম্বসের মতন বা কেউ পৌঁছে যাব নূতন দেশ।
জাগবে সাড়া বিশ্বময় এই বাঙালি নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা শক্তি-সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।

কেউ বা হব সেনানায়ক, গড়ব নূতন সৈন্যদল
সত্য-ন্যায়ের অস্ত্র ধরি', নাই বা থাকুক অন্য বল।
দেশ-মাতারে পূজব গো, ব্যথীর ব্যথা বুঝব গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি, ধন্য হবে অশ্রুজল।

জ্ঞানের মূল্য শিখব ব'লে কেউ বা যাব জার্মানি,
সবার আগে চলব মোরা সহজে কি হার মানি।
শিল্পকলা শিখব কেউ, গ্রন্থমালা লিখব কেউ,
কেউ বা হব ব্যবসাজীবী, কেউ বা টাটা কার্ণানি।

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।
অবাধ আলোর আমরা পুত্, নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কতই কী যে করব মোরা নাইকো তাহা'র অন্ত রে।

রাধারাণী দেবী

যত দুঃখ যত ব্যথা আসুক জীবনে
সত্যে মোর শ্রদ্ধা র'বে অটুট অম্লান!
অন্যায়ে না মানি' পেনু যত অপমান
সম্মানেরো চেয়ে আমি শ্রেষ্ঠ মানি মনে।
আনন্দে স্পন্দিত প্রাণ কল্পনা-নন্দনে,
পেয়েছি মানস-স্বর্গে অমৃত-সন্ধান।
উপেক্ষার উগ্রকশা শ্লেষ-তীক্ষ্ণ-বাণ
নিষ্ফল আক্রোশে গর্জে ব্যর্থ আস্ফালনে।

বাহিরের যত দুঃখ আসে রুক্ষ বেশে,
অন্তরে আনন্দলক্ষ্মী ওঠে স্নিগ্ধ হেসে।

মিথ্যারে মানিনি আমি কোনো প্রলোভনে,
ছলনার ছদ্মরূপে চাহিনি সম্মান।
শ্রেয় যাহা বুঝিয়াছি আপনার মনে
নির্ভয়ে নিয়েছি তুলি' নিষিদ্ধ সে দান।

রাধারাণী দেবী

ঝরনার গান

পাহাড়, ওগো পাহাড়, তোমার বুকের নীড়ে,
বৃথাই তুমি চাইছ মোরে রাখতে ঘিরে।
বাইরে যে জন বেরিয়েছে সে ফিরবে নাকো—
অচল তুমি, পথ-চলা-সুখ পাওনিকো তাই দাঁড়িয়ে থাকো,
সৃষ্টি করার আনন্দ কী বিপুলতরা,—
—উষর মাটি শস্পে ভরা।

অরণ্য গো, অরণ্য, হায় ডাকছ মোরে,
লক্ষ-শাখার ব্যাকুল-বাহু প্রসার ক'রে।
বিধুর তোমার ছায়া আমার পড়ছে বুকে,—
মর্মরিয়া দীন-মিনতি গুঞ্জরিছ অবোল-মুখে।
থামার সময় নেইকো আমার ;—তোমার দেহে
রঙিয়ে গেলাম সবুজ-স্নেহে।
উপল, ওগো উপল, তোমার শিকল-ডোরে
মিছাই সখা বাঁধতে প্রয়াস করছ মোরে।
অচল হতে জন্মি' চলি অগাধ পানে—
সুনীল আকাশ নীল সাগরের স্বপন দেছে জাগিয়ে প্রাণে।
রং ছুটায়ে ফুল ফুটায়ে চলছি ছুটে,—
মত্ত গানের নৃত্যে লুটে'।

তটভূমি লো, তটভূমি, তোর প্রয়াসরাশি,—
চিত্তে আমার দ্বিগুণ জাগায় উছল হাসি।
বাঁধতে ব্যাকুল উভয় বাহুর সীমার বেড়ে,—
তোর বাঁধনে পড়তে ধরা এলাম গিরি-ঘর কি ছেড়ে।

বিপুল ভাঙন কখন কখন তাই তো আনি,—
বুঝিয়ে দিতে একটুখানি।

কুসুম লতা খেত তরু বন পাথর মাটি—
ডাকছে,—'নদি, থাম্ লো, দিব পুলক বাঁটি'।'
চলার নেশায় মাত্‌ল যে জন, হায় গো তা'রে
এই ধরণীর অচল যারা তা'রা কি কেউ বাঁধতে পারে।
বন্ধুরা সব, করতে হবে আমায় ক্ষমা,—
ধন্যবাদই রইল জমা।

আকাশ আমায় আভাস দেছে সমুদ্র-রূপ—
বাতাস দেছে পৌঁছে অতল-বার্তা অনুপ।
গান গেয়ে ঐ ডাকছে বিহগ,—'আয় লো ত্বরা,
রত্নাকরে আপনা স'পে' উর্মিলা হও স্বয়ম্বরা—'
ঢেউগুলি মোর ভাবছে—সাগর কখন পাব ;
যাবই, ওগো, যাবই যাব।

অপরাজিতা দেবী

ভাইফোঁটা

আজ্‌কে আমি তো চা-টা খাব না মা, চা দিতে বারণ করো।
ভাইফোঁটা আজ, তাও ভুলে গেছ ? মা তুমি কেমনতরো।
বিনু অমলুকে ফোঁটা দিব আমি, উঠেছি তাই তো ভোরে।
বাগানেতে গিয়ে দুর্বো ও ফুল এনেছি আঁচলে ক'রে।

অপরাজিতা দেবী

শিউলির মালা গাঁথা হয়ে গেছে, দুর্বো হয়েছে বাছা।
স্নান-টান সব সেরেছি সকালে, হয়েছে কাপড় কাচা।
চন্দনটুকু ঘষা হোলো শেষ ; ধান চাই দুটিখানি,
আর কী কী চাই ব'লে দাও না মা, আমি কি গো সব জানি।
বিয়ে হয়ে 'বধি তিনটি বছর দিই নি তো ভাইফোঁটা।
প্রতি বছরেই কেঁদেছি এ দিনে ননদে দিয়েছে খোঁটা।
সারাদিন মাগো মন করে হু হু—জল আসে চোখে শেষে,
ভাই দ্বিতীয়ার দিনটিতে কি মা থাকা যায় দূরদেশে।
ফোঁটার জোগাড় যা করেছি দেখো বাটায় আর কি রাখে।
এই বেলা মাগো ব'লে দাও যদি ভুল কিছু হয়ে থাকে।
চুয়া চন্দন ঘিয়ের পিদিম, টাটকা ফুলের মালা,
নতুন আসন, ফলমূল মেওয়া, মিষ্টি সাজানো থালা।
নতুন কাপড় নতুন চাদর,—মশলা এলাচ পান,
রূপোর রেকাবে আশীর্বাদের রেখেছি দুর্বোধান।

ভায়েদের আজ পরমান্নটা বোনই রেঁধে দেয়,—নয় ?
কাঁচা দুধ আর গাওয়া ঘি মিশিয়ে গণ্ডূষ দিতে হয়।
পায়স তাহলে রাঁধবই আমি, ওটা তো নিয়মই আছে।
আরো আবদার আছে মা আমার আজকে তোমার কাছে।
মাছের কালিয়া, পোলাও মাংস রাঁধব নিজের হাতে,
পায়ে পড়ি মাগো, মত দাও তুমি, বাবা না বকেন যাতে।
·· খুব পারব মা,···হবে না কষ্ট, পুড়বে না হাত মোটে।
দেখো মা একথা এখন যেন না বাবার কানেতে ওঠে।
খাওয়ানো দাওয়ানো চুকে গেলে সব, তখন বোলো মা তাঁকে।
অবাক হবেন নিশ্চ'ই বাবা ;—বকুনি দেবেন কা'কে।

পশমের দুটি আসন বুনেছি,—ছাঁটাফুল কাটা শিখে।
"আশীর্বাদিকা দিদি" এই কথা দু'রঙে দিয়েছি লিখে।
বাপের বাড়ির জন্যে সেখানে তৈরি করতে কিছু
লজ্জা করে মা।—জবাবদিহিতে মাথা যেন হয় নিচু।
ওদের আমি তো নানান জিনিস দিয়েছি তৈরি ক'রে,
সে বাড়ির কেউ বাকি নেই,—তবু মন তো ওঠেনি ভ'রে।
অমল বিনুকে কিছু ক'রে দিলে অনেক তৃপ্তি হয়।
কোলে পিঠে করা ছোটো ভাই যে মা এ মায়া যাবার নয়।
মনটা আমার সব চেয়ে বেশি ওদেরি জন্যে কাঁদে,
বিকেল বেলায় ঘুড়ি নিয়ে যেই ছেলেরা উঠত ছাদে—
বিনুর কথাই মনে হোত খালি, জল এসে যেত চোখে।
লুকিয়ে আড়ালে ফেলতুম মুছে দেখে ফেলে পাছে লোকে।

উমা দেবী

কনে

কোলাহল উঠিয়াছে খোলা-ঘর মাঝে,
গয়লা মেয়ের বিয়ে হবে আজ সাঁজে;
আয়োজন বেশি নয়, দুয়ারের কাছে
কলসেতে দেখিলাম আমপাতা আছে;
মেটে-ঘর লেপে মুছে গয়লার বোন
আল্‌পনা দেয় বসে; প্রতিবেশী জন
আসে যায়, কথা কয়; ছোটো ছেলে মেয়ে
কাঁদিয়া তুলিছে রব, কেবা দেখে চেয়ে।

উমা দেবী

যার বিয়ে সেই শুধু নেই আশেপাশে,
লুকায়ে রয়েছে কোথা ; বেলা বেড়ে আসে,
যায় সবে যে যাহার কাজেতে আপন,
কান্নাকাটি, কোলাহল থামে কিছুক্ষণ ;
সহসা পড়িল চোখে, আজিকার কনে,
গৃহকোণে, ভাই-কোলে, কাঁদিছে গোপনে ॥

সমস্যা

মজুর, মজুর-বউ করিছে বচসা
সেদিন নয়নে মোর পড়িল সহসা ;
নিত্যকার এ ব্যাপার, তবু কুতূহলী,
জানালার কাছে আমি ছুটে গেনু চলি' ;
দেখি এক নির্বিকার এতটুকু ছেলে
আপনার মনে সেথা ধুলো নিয়ে খেলে,
তাকে নিয়ে এ-বিবাদ বেঁধেছে এমন
জুটেছে পাড়ার লোক জানিতে কারণ।
বউটা বলিছে কেঁদে,—"করো গো বিচার,
কত যে মানৎ-করা এ-ছেলে আমার,
এরে কেন দেয় গালি, কেন মারে ধরে।
দেখি আজ কেমনে ও ঢোকে মোর ঘরে।"
"আয় খোকা আয়" ব'লে হাত ধ'রে টানে,
"বাবা" ব'লে ছেলে চায় মজুরের পানে॥

মেঘ ও রৌদ্র

মোদেরি ঘরের ওই সম্মুখের পথে
এক ধারে ছেঁড়া পাটি পেতে কোনো মতে,
রোজ দেখি বসে এক মেয়ে গোলগাল,
সাজায় পুতুল আর ঘটি বাটি থাল।
আঁট সাঁট বাঁধা চুল, পিছে দোলে বেণী,
তাই নিয়ে খেলা করে তারি পোষা মেনি ;
সেদিকে খেয়াল নেই, আপনার মনে
"বেনে বউ" পুতুলেরে সাজায় যতনে।
একদা শুনিনু, তারে "চাঁপা" "চাঁপা" বলি'
দূর হতে কে ডাকিল,—ছুটে গেল চলি' ;
সে সুযোগে মেনি তার পুতুলের ঝুড়ি
ভেঙে চুরে দিয়ে মহা খেলা দিল জুড়ি' ;
চাঁপা এসে কেঁদে ওঠে দেখে এই দশা,
মেনিরে মারিতে গিয়ে চুমিল সহসা॥

সহায়

চারিধারে খোলা মাঠ, গৃহ তারি মাঝে,
একা ঘরে, স্বামী নাই, গিয়েছেন কাজে,
জনহীন পথঘাট, অমানিশা রাতি,
আশে-পাশে কেহ নাই, পথে নাই বাতি ;

কেমন কাঁপিল মন, নিশীথ নীরব,
থেকে থেকে ওঠে দূরে শেয়ালের রব,
জানালাটা খুলে দিয়ে, অন্ধকার পথে
চুপ করে আছি চেয়ে, ভাবি কোনোমতে
শেষ হোলে বেঁচে যাই এই রাত্রি কাল,—
হেন কালে আলো-হাতে চাকর গোপাল,
রাত-কানা বুড়ো সেই, ঢুকে দালানেতে,
ছেঁড়া কাঁথাখানি তার এক ধারে পেতে,
দুয়ারের কাছে এসে, মোরে ডেকে কয়—
"গোপাল রহিল জেগে, কোরো না মা ভয় ॥"

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দী

আজি ব্যথা মোর ভরেছে নিবিড় সুখে।
আজি শত গান গুমরে আমার বুকে।
প্রাচীর, প্রহরী, কঠিন লৌহদ্বার
অন্তরে মোর কথা কহে অনিবার।
কহে কত কথা,—অনাদি যুগের কথা,
প্রাসাদে কুটীরে বন্দীর মনোব্যথা।
ব্যথিতা ধরার বেদনার ইতিহাস
মোর বুকে আজ ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।

মনোদর্পণে সহসা উঠেছে ভাতি'—
নিখিলের যত বর্ষা-সুখের রাতি ;
শত কোটি পাপ, অবিচার অপমান,—
ভীরুর মৃত্যু,—বীরের আত্মদান।

যাহারা বন্দী স্বেচ্ছায় গৃহকোণে
স্নেহের, প্রেমের, পূজার সিংহাসনে,—
যাহারা বন্দী পশুর সুখের তরে
ভোগের প্রাসাদে কনকের পিঞ্জরে,—
যাহারা বন্দী রোষের অন্ধকূপে
যাহারা বন্দী লোভের বলির যূপে,—
আজি তাহাদের সবার বন্দী হিয়া
আমার বক্ষে উঠিয়াছে স্পন্দিয়া।
আজি তাহাদের সবার সভায় বসি'
অন্তর মোর উঠিয়াছে উচ্ছ্বসি'।
যারা পাপী আর যাহারা পাপের রোষে
বন্দীশালায় পচিছে ভাগ্য দোষে,—
যাদের বেদনা, যাদের অসম্মান
দেখে না মানুষ, ভুলে থাকে ভগবান,—
আজি তাহাদের সবার চিত্ত সাথে
আমার চিত্ত মিলিয়াছে বেদনাতে।
ভাগ্যদেবতা, প্রণাম চরণে তব।
মৃত্যু এ নহে, জন্ম এ মোর নব।

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

কারায় শরৎ

আজ তোমাদের চারিপাশে সবুজ মাঠের ঘাসে ঘাসে
শরৎ রবির সোনার আলো ঝরিছে,
আজ প্রভাতে এতক্ষণে রোদ পড়েছে কাশের বনে,
শিউলিতলা সরস ফুলে ভরিছে,
মেঘলা দিনের ওড়না ফেলি' চাইছে ভুবন নয়ন মেলি',
রাঙা মাটি রঙিন আলোয় বাঁচিল,
আমার শুধু চোখের কাছে আজকে কটা পাঁচিল আছে,
সোনার আলোয় ভবেছে সেই পাঁচিলও।
আশ্বিনে এই নূতন রোদে মাত্‌ল যে মন কোন্ আমোদে—
কোন্ প্রাণে আজ উঠল যে গান গাহি' রে।
কেমন ক'রে বুঝাই প্রাতে পেলাম দু'হাত-আঙিনাতে—
মাঠ ভ'রে যা পাওনি তুমি বাহিরে।
আজকে আমার সকল দিকে ঘিরেছে এই ধরণীকে
শ্যাওলা-ধরা পাঁচিল যত পুরানো,
কেউ বা কালো কেউ বা মেটে লম্বা বা কেউ, কেউ বা বেঁটে,
তাই দেখে আজ যায় না নয়ন ঘুরানো।
এই পাঁচিলে এমনি ভাবে কতই গেছে কতই যাবে
শরৎ রবি সোনাব তুলি বুলায়ে,
দূরের স্বপন পাখায় মাখি' বসল হেথায় কতই পাখি,
বসবে কতই বন্দী-হৃদয় ভুলায়ে।

এই পাঁচিলে কতই রেখায় বাদল বারির হাতের লেখায়
কতই ছবি কতই আছে রচনা,
ক্বচিৎ কভু হেথা হোথা বুঝেছিলাম তাদের কথা,
তাদের প্রসাদ—তাদের প্রাণের যাচনা।
আজকে তাদের প্রলাপ রাশি বক্ষে আমার ঢুকল আসি'
দস্যুসম সহসা দ্বার ভাঙিয়া,
আজ পূজা চায় সবাই যেন, শেওলা জলে পান্না হেন,
রাঙা ইঁট উঠ্‌ল দ্বিগুণ রাঙিয়া।
এই উঠানে, এ জেলখানায় দেখছি আলো দিব্যি মানায়,
দুদিন আগে একথা কই ভাবিনি।
সকল দীনের দৈন্য নাশি' শরৎ এল মধুর হাসি',
সোনার বান আজ এল ভুবনপ্লাবিনী।

ইঁটের পরে ইঁটকে গেঁথে মানুষ রাখে পিঞ্জরেতে
এমন করেই মানুষকে ভাই শুকায়ে,
হঠাৎ আবার সেই কারাতে শরৎ তারে এমনি প্রাতে
দেয় নিখিলের রঙিন চিঠি লুকায়ে।
সহসা সেই শুভক্ষণে সব কিছু হয় মধুর মনে
একটুতে হয় অনেকখানি দেখা সে,
কঠিন সে হয় কোমল বড়ো, পুরানো হয় নূতনতরো,
রঙিয়ে ওঠে সকল ফিকে ফ্যাকাসে।
আশ্বিনে সেই দিন এসেছে আলোর নদীর কূল ভেসেছে,
আজ তবে আর আমার কিসের ভাবনা।
নিখিলে রং ছড়িয়ে যাবে তোমরা কি তার সবটা পাবে,
হেথায় আমি একটুও কি পাব না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাইরে আলো দুষ্ট ছেলে মাঠে মাঠে বেড়ায় খেলে,—
ধরার নয়ন ভরে স্বপন আবেশে,
হেথায় আলো লক্ষ্মী মেয়ে করুণ চোখে রয় যে চেয়ে,
যায় কি পারা থাকতে ভাল না বেসে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মহাসাগরের নামহীন কূলে

মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভিড়।
মাল বয়ে বয়ে ঘাল হোলো যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।

কূলহীন যত কালাপানি মথি'
লোনা জলে ডুবে নেয়ে,
ডুবো পাহাড়ের গুঁতো গিলে' আর
ঝড়ের ঝাঁকুনি খেয়ে,

যত হায়রান লবেজান তরী
বরখাস্ত্ হোলো ভাই,
পাঁজরায় খেয়ে চিড়্,
মহাসাগরের অখ্যাত কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই,
সেই অথর্ব ভাঙা জাহাজের ভীড়।

দুনিয়ায় কড়া চৌকিদারি যে ভাই
হুঁশিয়ার সদাগরি,
হালে যার পানি মিলেনাকো আর, তারে
যেতে হবে চুপে সরি'।
কোমরের জোর কমে গেল যার ভাই
ঘুণ ধরে গেল কাঠে, আর যার
কল্‌জেটা গেল ফেটে,
জনমের মতো জখম হোলো যে যুঝে,
সওদাগরের জেঠিতে জেঠিতে
খাতাঞ্চিখানা ঢুঁড়ে,
কোনো দপ্তরে ভাই,
খারিজ তাদের নাম পাবেনাকো খুঁজে।
মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
সেই সব যত ভাঙা জাহাজের ভীড়.

শিরদাঁড়া যার বেঁকে গেল
আর দড়াদড়ি গেল ছিঁড়ে
কব্জা ও কল বেগড়াল অবশেষে,

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জৌলুষ গেল ধুয়ে যার আর
পতাকাও পড়ে নুয়ে ;
জোড় গেল খুলে,
ফুটো খোলে আর রইতে যে নারে ভেসে,
তাদের নোঙর নামাবার ঠাঁই
দুনিয়ার কিনারায়
—যত হতভাগা অসমর্থের নির্বাসিতের নীড়।

আজি এই প্রভাতের

আজি এই প্রভাতের আশীর্বাদখানি,
লও তব মাথে,
হে নগরী,
লও তব ধূলি-ধূম-ধূম্র-জটা-বিভূষিত শিরে।
তব লৌহ-কাষ্ঠ-শিলা কারাগার হতে
রক্তমসী-কলঙ্কিত, যন্ত্র-জর্জরিত তব
কর দুটি জুড়ি'
আজি এই প্রভাতেরে করো নমস্কার।
মোহের দুঃস্বপ্নজাল বারেক ছিঁড়িয়া দুই হাতে
ঊর্ধ্বে চাহ অভিশপ্তা
ওই নীল আকাশের পানে,
পুরব সীমান্তে যেথা দিবসের মাঙ্গলিক বাজে
আলোকের সুরে।

তোমার ব্যথিত বক্ষে,
অন্ধকারে যেথা
অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ড জ্বলে দিকে দিকে,
হারায় কঙ্কাল পথ
বিকারের পয়োনালী মাঝে,
লুকায় সুরঙ্গ লাজ ভরে মৃত্তিকার তলে,
লোভ হিংসা ফেরে ছদ্মবেশে
অন্ধকারে নিঃশব্দ লোলুপ,—
সেথা আজ ডেকে আনো প্রভাত আলোবে .
তার সাথে আনো শান্তি,
লোভ-দীর্ণ তব ক্ষুব্ধ বুকে,—
লালসার দৈন্য যাক ঘুচে।
যন্ত্রের চক্রান্ত ভাঙি',
ভেদ করি' ষড়যন্ত্র লৌহে আব লোভে
আসুক প্রভাতখানি,
—সৌম্য-শুচি কুমার সন্ন্যাসী
হে পতিতা তোমার আলয়ে।
পুঞ্জীভূত সমস্ত কালিমা,
সমস্ত সঞ্চিত ব্যথা, লজ্জা গ্লানি পাপ,
মনস্তাপ বহু মানবেব
ব্যাধি ও বিকাব
সযত্নে লালিত
—দূব হোক সব আবর্জনা,
আলোকেব কল্যাণ ধাবায়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শক্তির সাধনে মাতি',
হে উন্মত্তা নারী-কাপালিক,
অগণন জীবনের আশার শ্মশানে
আনন্দের শবাসনে বসি'
সুন্দরেরে গিয়েছিলে ভুলি',
সীমাহীন আকাশের সুনীল বিস্ময়
রাত্রির রহস্য আর আলো গন্ধ রূপ,
ভুলেছিলে সহজ প্রাণেরে।
সেই স্বেচ্ছা-নির্বাসন হয়ে যাক শেষ।

আজ তব
শক্তি-সুরা-রক্ত নেত্রে ভ্রূকুটির তলে
বিহঙ্গেরা বাঁধে নাই নীড়,
প্রস্তর-নিষেধ-প্রান্তে জাগিছে সভয়ে
শীর্ণ তৃণ বিবর্ণ কুসুম,
—সংকুচিত দুর্বল কাতর।
যন্ত্রের জটিল পথে
বিকলাঙ্গ জীবনের
হেরি শুধু ব্যঙ্গ-সমারোহ।

ফের যদি ফিরে আসি

ফের যদি ফিরে আসি,
ফিরে আসি যদি
কোনো শুভ্র শরতের অম্লান প্রভাতে
কিংবা কোনো নিদাঘের শুষ্ক রুক্ষ তপস্যার দ্বিপ্রহরে
কিংবা শ্রাবণের বৃষ্টি-ধরা ছিন্নমেঘ রাতে কোনো ;—
নূতন ধরণী পরে কারেও কি পারিব চিনিতে,
কাহারেও পড়িবে কি মনে।
এ জীবনে যাহাদের ভালবাসিয়াছি
আজ ভালবাসি যাহাদের
তাহাদের সাথে হবে দেখা ?
—পারিব চিনিতে ?
জন্ম লব হয়তো সে
কোন্ ঊর্মি-ছন্দোময়ী ফেনশীর্ষ সাগরের তীরে
ডুবারীর ঘরে,
কিংবা কোন্ জীর্ণ ঘরে কোন্ বৃদ্ধ নগরীর নগণ্য পল্লীতে
দীনা কোন্ পথের নটীর কোলে.
কিংবা—কোথা কিছু নাহি জানি।
এই আলো সেদিন নয়নে জ্বলিবে কি।
এই তারা এই নীলাকাশ সম্ভাষিবে আরবার ?
সে দিন কি এমনি ফুটিবে ফুল,
এই মতো তৃণ,
জাগিবে কি পদতলে,
এই মতো পুঞ্জ পুঞ্জ প্রাণ
সমস্ত নিখিলময়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পড়িবে কি মনে,
এই আলো মোর চোখে একদিন লেগেছিল ভালো ;
এই ধরণীর 'পরে আমি খেলা করিয়াছি,
কাঁদিয়াছি হাসিয়াছি
ভালবাসিয়াছি।
যে মুকুল আশাগুলি রেখে যাব আজ
জীবনের খেয়াঘাটে বিদায়-সন্ধ্যায় অর্ধস্ফুট,
তাহাদের সাথে আর
হবে ফিরে দেখা ?
এ জীবনে যত কাজ সাঙ্গ হোলো নাকো,
যত খেলা রয়ে গেল বাকি,
ফিরে আর পাব তাহাদের ?
আমার চোখের জল,
মোর দীর্ঘশ্বাস,
হতাশা, বেদনা,
তাহাদের সাথে পুন হবে পরিচয় ?
যত দুঃখ ফেলে রেখে যাব
তাহারা শুধাবে ডেকে.
ডেকে কহিবে কি প্রিয়া,
"আমারে ভুলিয়াছিলে কেমন করিয়া।"

আবার প্রিয়ার সাথে সুখে দুঃখে কাটিবে কি দিন,
এমনি করিয়া প্রতি জীবনের দণ্ড পল সুধাসিক্ত করি',
আনন্দ ছড়ায়ে চারিদিকে, আনন্দ বিলায়ে সর্বজনে।
সকলেরে ভালবেসে—ভালবেসে সব কিছু,
দুর্দিনে নির্ভয় আর দুঃখে ক্লান্তিহীন

চলিতে পাব কি দুইজনে
এক সাথে।

ফের যদি ফিরে আসি,
আরো আলো চক্ষে যেন আসি নিয়ে,
বুকে আরো প্রেম যেন আনি
পৃথিবীকে আরো যেন ভালো লাগে;
এবারের যত ভুল ভ্রান্তি
স্খলন পতন
ক্ষমায় ভুলিয়া আসি.
আরো আনি পথের পাথেয়
আনন্দ অক্ষয়।

বুদ্ধদেব বসু

শাপভ্রষ্ট

যৌবনের উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতটভূমে
ব'সে আছি আমি।
দগ্ধ স্বর্ণ-রেণু-সম বালুকণারাশি
লুটায় চরণ-প্রান্তে অকৃপণ বিপুল বৈভবে।
ঊর্ধ্বে মম রক্তিম আকাশ—
প্রভাত-সূর্যের লজ্জা রঞ্জিত করিছে অরণ্যানী:

বুদ্ধদেব বসু

সন্ত-নিদ্রা-জাগরিত গগনের পাণ্ডুভাল-'পরে
বহ্নি-শিখা করিছে অর্পণ,
কামনার বহ্নি সে যে, স্বপনের সলজ্জ বিকাশ।
গোলাপের বর্ণে-বর্ণে স্বপ্ন-সুধা মাখা,
আরক্তিম কামনায় আঁকা।
আমার অন্তর নিয়ে একাকী বসিয়া আছি আমি
উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে।

সম্মুখে গরজে সিন্ধু বেদনার দুঃসহ পীড়নে।
লক্ষ লক্ষ লুব্ধ ওষ্ঠ মেলি'
চুম্বিয়া মুছিতে চাহে গগনের তরুণ রক্তিমা,
রিক্ত করি দিতে চাহে ধরিত্রীর তীর্থযাত্রীদলে
সহসা-বন্যায়।
নিষ্ফল আক্রোশে তার ক্রূর জিহ্বা উদ্গারিছে বিষ,
তরঙ্গ-মথিত ফেনা রেখে যায় সৈকত-শিয়রে।
গাঢ়কৃষ্ণ জলরাশি অস্বচ্ছ অতল
নিত্য-নব অমঙ্গলে করে জন্মদান
গোপন গভীর গর্ভে।
অকল্যাণ বায়ু বহি' প্রাণের মন্দিরে
নির্বাপিত করি দেয় পূজার প্রদীপ;
ম্লান মুখে ঝরি' পড়ে কাননে অস্ফুট শেফালিকা
হিমস্পর্শে তার।
আমি শুষ্ক, নিশাচর, অন্ধকারে মোর সিংহাসন,
আমি হিংস্র, দুরন্ত, পাশব।
সুন্দর ফিরিয়া যায় অপমানে, অসহ্য লজ্জায়
হেরি' মোর রুদ্ধ দ্বার, অন্ধকার মন্দির-প্রাঙ্গণ।

সুদূর কুসুম-গন্ধে তার যাত্রাবাঁশি বেজে ওঠে ;
দৈন্য-ভরা গৃহ মোর শূন্যতায় করে হাহাকার— ।
—যৌবন আমার অভিশাপ।

ক্ষণে-ক্ষণে তরঙ্গের 'পরে
গগনের স্নিগ্ধশান্ত আলোখানি বিচ্ছুরিত হয়ে যেন লাগে ;
ফুটে ওঠে সোনার কমল
ক্ষণিক সৌরভে তার নিখিলেরে করিয়া বিহ্বল।
সেই পদ্মগন্ধখানি এনে দেয় মোর পরিচয়
পল্লব-সম্পুটে।
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ি আমি লিখন তাহার,—
'হে—তরুণ, দস্যু নহ, পশু নহ, নহ তুচ্ছ কীট—
শাপভ্রষ্ট দেব তুমি।'
শাপভ্রষ্ট দেব আমি।
আমার নয়ন তাই বন্দী যুগ-বিহঙ্গের মতো
দেহের বন্ধন ছিঁড়ি' শূন্যতায় উড়ি' যেতে চায়
আকণ্ঠ করিতে পান আকাশের উদার নীলিমা।
তাই মোর দুই কর্ণে অরণ্যের পল্লব-মর্মর
প্রেম-গুঞ্জনের মতো কী অমৃত ঢালে মর্ম-মাঝে।
রবির গভীর স্নেহে, শিশিরের শীতল প্রণয়ে
শুষ্ক শাখে তাই ফোটে ফুল,
দক্ষিণ-পবন তা'রে মৃদু হাস্যে আন্দোলিয়া যায়।
রাত্রির রাজ্ঞীর বেশে পূর্ণচন্দ্র কভু দেয় দেখা,
আঁধারের অশ্রুকণা তারার মনিকা হয়ে জ্বলে
ত্রিযামার জাগরণ-তলে।
স্তব্ধচিত্তে চেয়ে থাকি ; অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনা

বুদ্ধদেব বসু

সযত্নে সাজাই নিত্য উৎসবের প্রদীপের মতো
আনন্দের মন্দির-সোপানে।
সুধায় নির্মিত মোর দেহ-সৌধখানি,
ইন্দ্রিয় তাহার বাতায়ন—
মুক্ত করি' রাখি তারে আকাশের অকূল আলোকে
অন্ধকার-অন্তরালে অন্তরের মাঝে
বিনিঃশেষে করি যে গ্রহণ।

অক্ষম, দুর্বল আমি নিঃসম্বল নীলাম্বর-তলে,
ভঙ্গুর হৃদয়ে মম বিজড়িত সহস্র পঙ্গুতা—
জীবনের দীর্ঘ পথে যাত্রা করেছিনু কোন্ স্বর্ণরেখাদীপ্ত উষাকালে—
আজ তার নাহিকো আভাস।
আজ আমি ক্লান্ত হয়ে পথ-প্রান্তে পড়ে আছি নীরব ব্যথায় শান্তমুখে
ঝরে-পড়া বকুলের গন্ধস্নিগ্ধ বিজন বিপিনে।
সেই মোর গোধূলির সুরভি আঁধারে
যার সাথে দেখা,
যার সাথে সংগোপনে প্রণয়-গুঞ্জন,
যার স্পর্শে ক্ষণে-ক্ষণে হৃদয়ের বেদনার মেঘে
চমকিয়া খেলি যায় হর্ষের বিজলী,—
নেত্রের মুকুরে তার দেখেছি আপন প্রতিচ্ছবি,
দেখিয়াছি দিনে-দিনে, ক্ষণে-ক্ষণে আপনার ছায়া,
দেখিয়াছি কান্তি মম দেবতার মতো অপরূপ,
ভাস্করের মতো জ্যোতির্ময়;—
তখন বুঝেছি প্রাণে, আমি চিরন্তন পুণ্যচ্ছবি,
নিষ্কলঙ্ক রবি।

তখন বিষণ্ণ বায়ু নিঃশ্বাসি কহিয়া গেছে কানে,—
'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি।'
নিকুঞ্জের সঙ্গী মোর হাসিয়া কয়েছে যবে কথা
তুচ্ছতম বাণী তার রূপান্তর করেছে গ্রহণ,
বিহঙ্গের উদাসীন কলকণ্ঠ-সাথে মিশি আসি'
বেজেছে আমার বক্ষে দুরাশার মতো—
'শাপভ্রষ্ট দেব তুমি।'

তাই আজি ভাবি মনে-মনে—
পঙ্কের কলঙ্ক-রবি উত্তরিয়া আছে মোর স্থান
পঙ্কজের শুভ্র অঙ্কে।
শেফালি-সৌরভ আমি, রাত্রির নিঃশ্বাস,
ভোরের ভৈরবী।
সংসারের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণ্টকের তুচ্ছ উৎপীড়ন
হাস্যমুখে উপেক্ষিয়া চলি।
যেথা যত বিপুল বেদনা,
হেথা যত আনন্দের মহান্ মহিমা—
আমার হৃদয়ে তার নব-নব হয়েছে প্রকাশ।
বকুল-বীথির ছায়ে গোধূলির অস্পষ্ট মায়ায়
অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।—
শাপভ্রষ্ট দেবশিশু আমি।

বুদ্ধদেব বসু

আর-কিছু নাহি সাধ

আব-কিছু নাহি সাধ। জানি, মোর তবে নহে জয়মাল্য
যশের মুকুট,
বিশ্বেব কবিবা যত জ্বলিছে নক্ষত্র হয়ে বজনীর
শ্যামল অঞ্চলে--
সেথা মোর নাহি স্থান। আমাব বন্দনা-গান জাগিবে না
নীল নভস্তলে,
মোব কবস্পর্শ কভু লভিবে না শ্রদ্ধা-সিক্ত অভিষেক—
পল্লব-সম্পুট।
নব-চিত্ত-ভক্তি তীর্থে নিত্য-স্বর্গ নহে মোর, মবণের
তিক্ত কালকুট
আমার চবম ভাগ্য। একবিংশ শতাব্দীব কোনো
সপ্তদশী লীলাচ্ছলে—
মনে জানি—পড়িবে না আমাব কবিতাখানি জ্যোৎস্না-স্নাত
বাতায়ন তলে,
সতীর্থেব হৃদ-পদ্মে গন্ধ রূপে ক্ষণিকেব স্মৃতি-স্বপ্ন—
জানি, তাও ঝুট্।

তব্ যে জাগিছে আজি সংগীত-তরঙ্গ-ভঙ্গ হৃদয়েব
হিম সবোবরে—
সে শুধু তোমাবি লাগি'। তোমারে যে পেয়েছিনু সর্ব-অঙ্গে,
মর্মে-মনে প্রাণে,
পেয়েছিনু বিবহেব স্পন্দমান অন্ধকাবে, মিলনের
প্রফুল্ল বাসরে,—

সে-কথা কহিতে চাই আকাশেরে, ধরণীরে, তৃণপত্রে,
সমুদ্রের কানে।
পারি না বহিতে এই পরিপূর্ণতার ভার একা-একা
আপন অন্তরে,
সহস্রের মাঝে তাই আপনারে বিতরণ ক'রে যাই
লক্ষ গানে—গানে।



অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আমার পরান মুখর হয়েছে সিন্ধুর কলরোলে,
প্রভঞ্জনের প্রতি পদপাতে আমার পরান দোলে।
আমার পরানে ভাই,
কোটি মানবের অশ্রুজলের জোয়ার শুনিতে পাই।
সূর্যের বুকে কী ভুখ জাগিছে, আমার পরান জানে,
কীটের পাখার অস্ফুটতম বেদনা আমারে হানে।
আমার পরানে ভরা
এ পথ-চারিণী বসুন্ধরার অকারণ ঘুরে'-মরা।
বনানী-বীণায় মর্মরি' ওঠে আমার ব্যাকুল প্রাণ,
আমার পরান তৃণের সভাতে হয়েছে শ্যামায়মান।
আমার পরানে শিহরিছে প্রতি পুষ্পের ঝিলিমিলি,
আমার পরান নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' আকাশ হয়েছে নীল।

জীবনানন্দ দাশ

রহেনি কোথাও ফাঁক,
আমার পরানে জমেছে বিশ্ববেদনার মৌচাক!
দীর্ঘশ্বাসের দরিয়া দুলিছে, মরুভূর শূন্যতা,
অন্ধকারের কাতর কাকুতি, ঝরা মুকুলের ব্যথা—
আমার পরান ভরি'
মূছিত আছে যুগান্তরের মৃত্যুর বিভাবরী॥

জীবনানন্দ দাশ

মৃত্যুর আগে

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার;
পুরানো পেঁচার ঘ্রাণ, অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারাল।
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, মাঠে মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আস্বাদে ভরা, অশথের ডালে ডালে ডাকিয়াছে বক,
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক,

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত
সন্ধ্যার কাকের মতো আশঙ্কায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে,
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস,

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
শুকনো গুঁড়ির পরে চৈত্রের দুপুরে বেজি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চাল-ধোয়া গন্ধ পেয়ে ঘাটে এসে মাছগুলো ভিড়েছে দু'বেলা,
শামুক গুগ্‌লি ভরা পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
শুনেছে ঘরের ডাক—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে ;

আমরা দেখেছি যারা নিবিড় বটের নিচে লাল লাল ফল
পড়ে আছে ; নিঃসহায় ভাঙা মাঠ নেমে গেছে নদীর ভিতরে ;
কাঁচপোকা-টিপ্‌ প'রে গেঁয়ো মেয়েটির মুখ হয়েছে উজ্জ্বল ;
পথে পথে দেখিয়াছি মৃদু চোখ ছায়া ফেলে পৃথিবীর পরে,
আমরা দেখেছি যারা শুপুরির সারি বেয়ে সন্ধ্যা আসে রোজ,
প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ ;

আমরা বুঝেছি যারা বহুদিন মাস ঋতু শেষ হোলে পর
একটিও নম্র মুখ কাছে এসে অন্ধকারে আন্তরিক কথা
কয়ে গেছে ;—আমরা বুঝেছি যারা পৃথিবীর আলোর ভিতর
পথে পথে মেঘ্‌লা দিনের মতো রয়ে গেছে মুগ্ধ সজলতা .
সোঁদা ভিজে ধুলো, মাঠ-কল্‌মির ঘন দাম, ডাহুকের নীড়,
ভাঙা মন্দিরের ইঁট, শাদা শাঁখা স্নিগ্ধ হাত, ঘাসের শরীর ;

কী বুঝিতে চাই আর ।……রৌদ্র নিভে গেলে পাখিপাখালির ডাক
শুনিনি কি । প্রান্তরের কুয়াশায় দেখেনি কি উড়ে গেছে কাক ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

নবীন লেখনী

অধুনা-আনীত নব অলিখিত
লেখনী মোর,
কী জানি কেমন ভাগ্যলিখন
আছে রে তোর।
মুখাগ্রে তোর ছুটিবে কি গান,
পাবি লাঞ্ছনা? মিলিবে কি মান।
কোথা কবে হবে কাজের খতম,
নেশার ভোর,
জানি না, এই তো জাগিলি প্রথম,
লেখনী মোর।
ওরে অভিনব, চতুরালি তব
বচনাতীতে,
পারিবে কি, হায়, আঁখির আগায়
আনিয়া দিতে।
পরশে কি তোর, ইন্দ্রজালিক,
শূন্যে মিলাবে দানবী অলীক।
পারিবি জাগাতে, মথি' নিশ্চল
দিগন্তর,
বুদ্বুদসম তারামণ্ডল
নিরন্তর।

তোর অন্তরে কভু কি শিহরে,
উঠিবে রণি'
স্ফীত ধমনীর সঙ্কর অধীর
নাটনধ্বনি।
তোরে দিয়ে কভু হবে কি রচন
প্রণয় লিপির ব্যাকুল বচন।
শত-যোজনের-আড়াল প্রিয়ার
কানের পর
পারিবি ঢালিতে আমার হিয়ার
তরল স্বর।
হবে কি জরায় ধূলির ধরায়
যাত্রাশেষ,
অথবা অকালে জীবন সকালে
নিরুদ্দেশ।
কী দিলে মিটিবে পিপাসা তোমার।
চাও কি বুকের শোণিত আমার,
চাও কি বিনিদ রক্ত আঁখির
তিক্ত লোর,
গ্লানি কলঙ্ক কালিমা নিবিড়
বড়ো কঠোর।

ওরে অশান্ত নবীন পান্থ,
নেই কি জানা
অজ্ঞাত পথে খাদে পর্বতে
বিঘ্ন নানা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অশ্রুর নদী, শাসনের শিখা,
হিংসার বিষ, যশ মরীচিকা,
ভূখারী দীনতা নির্ভর হৃতা
গমনচোর—
জ্বেলে দিবে সহমরণের চিতা
তোব ও মোর ॥

শ্রাবণবন্যা

সংকীর্ণ দিগন্ত চক্র, অবলুপ্ত নিকট গগনে
পরিব্যাপ্ত পাংশুল সমতা,
অবিশ্রান্ত অবিরল বক্রধারা ঝরিছে সঘনে,
ঢাঁকে বজ্র বিস্মৃত মমতা,
প্লাবিত পথের পাশে আনত বঙ্কিম তরুবীথি
শিহরিছে প্রমত্ত ঝঞ্ঝায়, নিমজ্জিত প্রহরের বৃতি,
ভেদ নাই উষায় সন্ধ্যায় ॥

পথস্থ কুটীর দ্বারে ভয়ে পান্থ নিয়েছে আশ্রয়;
সিক্ত গাভী ছুটে চলে গোঠে,
কপোত কুলায়ে কাঁপে; দাদুরী নীরব হয়ে রয়,
পুষ্পবুকে অশ্রু ভ'রে ওঠে,
নিষিক্ত স্তব্ধতা ভেদি, প্রলয়ের হুংকার-রণনে,
পরিপ্লুত নদীর কল্লোলে,
উন্মাদ শ্রাবণবন্যা ছুটে আসে ভৈরব নিঃস্বনে,
অবরুদ্ধ পরান পল্বলে ॥

অন্নদাশঙ্কর রায়

ওরে কবি তোর ছবির পসরা
ভরিয়া লইবি আয়
উৎসবময়ী সাজিয়াছে ধরা
বসন্ত নাটিকায়।
আজ পেয়ে যাবি যাহা চায় মন,
এত মিঠা লাগে ভানুর কিরণ,
পাখিদের সনে বনে সমীরণ
এত শিষ দিয়ে যায়।

একখানি মেঘ কোনোখানে নাই
মেঘেরা লয়েছে ছুটি,
তরী চলাচল থামিয়াছে, তাই
স্থির আছে সিন্ধুটি।
আমাদের এই শ্যাম দ্বীপটির
কূলে ছলছলে তারি নীল নীর,
আমাদের গায়ে লাগে ঝির ঝির
তারি ফেন মুঠি মুঠি।

তরুর পাণ্ডু অধরে ফিরেছে
সবুজ সোনালি তামা।

অন্নদাশঙ্কর রায়

চুম দিতে তার আনন ঘিরেছে
পাখিরা বিদেশীনামা।
এরা সেই পাখি যারা তোর দেশে
হেসে ফাঁসি যায় বকুলের কেশে,
আকাশসিন্ধু সন্তরি' শেষে
সাজ ফিরায়েছে শ্যামা।

ভূঁই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফুটিয়াছে ফুল
রূপসীর পদপাতে।
নব শিশু সম নাড়িছে আঙুল
সু-রঙিন আঙিনাতে।
এরা নয় তোর অশোক করবী
তবু চির চেনা এরা তোর সবি
জন্ম নিয়াছে মালতী মাধবী
পরদেশী ভূমিকাতে।

ওরে কবি আয় লবি একে একে
সকলের পরিচয়।
সাত ভাই চাঁপা তোরে ডেকে ডেকে
মৌন বুঝি বা হয়।
এ যে আমাদের সেই আদরিণী
সূর্যবদনা সোনার মেদিনী,
এর প্রতি তিল চিনি চিনি চিনি
প্রতিটি অঙ্গময়।

এই আলোকের ফেনিল পিয়ালা
রাখিসনে হাতে ক'রে।
এখনি ছুটিবে সবটুকু জ্বালা
টুটিবে পিয়ালা ওরে।
প্রাণভরে এরে করে নে রে পান
এ যে ত্রিলোকের তরলিত প্রাণ,
আকাশমথিত এ অমৃত দান
পিয়াসী মেনেছে তোরে।

ছবির পসরা করিয়া উজাড়
প্রিয় রমণীর পায়
মন হতে তোর নেমে গেছে ভার
ওরে কবি ছুটে আয়।
তোর তরে হেথা মেলিয়াছে ছবি
আন জগতের আরো এক কবি
ভালবেসে এরে শিরে তুলে লবি
এইটুকু সে যে চায়।

অজিতকুমার দত্ত

আকাঙ্ক্ষা

নাহি জানি তথাগত বুদ্ধের বচন সত্য কিনা—
পুনরায় জন্মলাভ আছে কিনা অদৃষ্টে আমার.
চার্বাকের তিক্ত বাণী, 'ভস্মীভূত এ-দেহের আর
পুনরাগমন নাই', সত্য কিনা সে-কথা জানি না।

হুমায়ুন কবীর

এ-জীবন কাটে যদি অর্থ, যশ কিংবা মান বিনা,
তাহাদের তরে আমি জন্মলাভ চাহি না আবার,
নতুন বস্ত্রের মতো নব দেহ ল'য়ে বারংবার
মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করি' পৃথিবীতে আসিতে চাহি না।

আমি শুধু এ-জীবনে আহরিতে চাই প্রাণ ভ'রে
তোমার সুন্দর প্রেম, তোমার সিন্ধুর মতো স্নেহ;
কাব্যে আহরিতে চাই সেই কথা, যাহা আর কেহ
কভু কহে নাই (অন্যে তব কথা জানিবে কী ক'রে)।
এ-জীবনে তুমি থাকো, তার পর মরণের পরে
মোর কাব্যে অনশ্বর হ'য়ে থাক্ এ-জন্মের দেহ।

হুমায়ুন কবীর

পদ্মা

বহুদিন পরে আজি রোগ জীর্ণ আঁখি ছুটি মেলি'
হেরিলাম তোরে।
শ্রাবণের ঘনঘটা এই পুঞ্জ মেঘের আড়ালে
অপূর্ব যোগিনী বেশে মুক্তকেশে আসিয়া দাঁড়ালে
নয়নের আগে মোর। ক্ষুব্ধ রুষ্ট ঊর্মিরাশি ঠেলি'
চলেছ বহিয়া শুধু,—আবিল সলিলরাশি তব
নেচে ওঠে মরণের তাণ্ডব নর্তনে নব নব।—
চিরমুক্তা, কোনো কালে ধরা দিবি নাকো কোনো ডোরে?
শৈশব জীবন হতে তোরে আমি দেখিতেছি নদী
পাইনাকো শেষ।

কখনো শরৎ প্রাতে পূর্ণবারি শান্ত অচঞ্চল,
কূলে কূলে কুলু কুলু গান গেয়ে বয়ে চলে জল,
কখনো বৈশাখ সাঁঝে গগনে ঘনায় মেঘ যদি
প্রলয় নর্তনচ্ছন্দে নেচে ওঠে তোমার পরান,
তোমার সলিলে বাজে তরঙ্গের ধ্বংসলীলা গান,
তোমার নয়নতলে করুণার নাহি চিহ্ন লেশ।
বালার্ক কিরণে তব দেখিয়াছি হে নদী আমার
অপরূপ হাসি।
কূলে কূলে কাশরাশি ফুটিয়াছে পূর্ণিমা প্লাবনে
মদির কুসুম গন্ধ ভাসিয়াছে অধীর পবনে
মুগ্ধ জলরাশি তব শিহরিয়া ছুটেছে আবার।
বুকে নিয়ে ধনধান্য আঁচল সাজায়ে বনফুলে
সোহাগ-শরম-লাজে মৃদুবাণী-পূর্ণা কূলে কূলে
ছুটিয়া চলেছ যেন দূরে কোন্ জনে ভালবাসি'।
আজি পুন হেরিলাম এ কী:তব অভিনব রূপ
ভৈরবিনী সাজ।
গগনে মেঘের ঘটা শ্রাবণের শেষদিনে আজি
ভয়াল গৈরিক ভীম। নভোতলে ভীমাবেশে সাজি'
এলায়ে ধূসর জটা—জলরাশি শ্মশান-স্বরূপ—
তুমি চলিয়াছ ছুটে। স্রোতবেগে শিহরি উঠিয়া
তড়িত-ত্বরিত-গতি আত্মহারা চলেছ ছুটিয়া,
ধ্বংসের প্রলয় মন্ত্র বক্ষে তব বাজিতেছে আজ:
আজি তব দেখিতেছি নাহি দয়া করুণা নয়নে
সুকঠিন হিয়া।
মানব ধরিত্রী আজি আঘাতে কাঁদিবে সুকঠোর,
গগন ব্যথার ব্যথী ঢালিবে অঝোর আঁখিলোর,

হুমায়ুন কবীর

তবু তব ক্রোধ-বহ্নি নিভিবে না আঁখির প্লাবনে।
স্রোতবেগে ক্ষুদ্রতরী ওই দূরে ঠিকরিয়া পড়ে,
তীর হতে লক্ষ নর ফুকারিয়া হাহাকার করে
নিরুপায়। ঠাঁই পাবে অতল অকূলতলে গিয়া!
অকস্মাৎ স্রোত তব রবিকরে ঝলকি' উঠিছে
ছুরিকার মতো।
এ যেন কুটিল হাস্য তব হিংস্র দন্ত ওষ্ঠ 'পরে
তব হত্যাসাধ সেথা নিষ্ঠুর নয়নে ক্ষণতরে
ব্যাঘ্রের জিঘাংসা প্রায় শান্ত স্মিত আলোকে ফুটিছে
প্রবল দুর্বার তুমি, অত্যাচারী মদগর্বে তব,
ভাঙি' গড়ি' শক্তিমদে শ্যাম শোভা দেশ নব নব,
চলেছ কাটিয়া বলে ধরামাঝে আপনার পথ।
তোমার প্রবল শক্তি বাধা দিতে আছে আমাদের
স্নেহ প্রেম বুকে।
সে ক্ষীণ বাঁধন ঠেলি' হে দর্পিত চলিয়াছ বেগে
আঘাতি' কঠোর ঘাত। ব্যথিত পঞ্জরে ওঠে জেগে
দীর্ঘশ্বাস—ভগ্ন-আশা নিরুপায় দীন হতাশের।
তবু নর কাঁদে শুধু, বুকে বাঁধি' একে অপরেরে,
বাহিরে বিশাল বিশ্ব আপন কঠোর জালে ঘেরে,—
সে তবু বসিয়া রহে উর্ধ্ব-আঁখি সব সুখে দুখে।

দিলীপ কুমার রায়

নিহিত

কুসুমের বুকে ঝুরে যে সুবাস   কুসুম তারে না দেখিতে পায় :
অসীমের ছায়া প্রতিফলি' নিধি   অসীমেরি বাণী শ্বসি' সুধায়।
কার লাগি অলি ফাগুনে উছসি'
উতলা গোপন সুরভি পরশি',
নিয়ত আকুল বাসনা বরষি' গাহে কার স্মৃতি মলয় বায়।
কম্প্র নিশীথে অম্বরতলে
চাঁদিমা তারায় কার দীপ জ্বলে।
উষালোকে কার শুভ্রতা ঝলে—কাহারে বা সবে বরিতে চায়।
যুগ যুগ ধরি' নভোনীলে বলো
কার মহিমার স্তব উচ্ছল,
নদ নদী গিরি-নির্ঝর কল-তানে কাহার বা মিলনে ধায়।
তরুলতা তৃণে কার পরিমল
অণুতে অণুতে চির-চঞ্চল।
লুটায়ে কাহার ছায়া অঞ্চল   ধূসরিমা প্রিয়-ব্যথা জাগায়।
ফুটিবে না যদি শূন্যতা-মাঝে
কেন নিতি নব সুন্দর সাজে
নিখিলে তোমার কিঙ্কিণী বাজে—আলেয়ার মোহমায়া বিছায়।
অন্তরে রাজো,—তবু অন্তর চাহে সে-বারতা ভুলিতে হায়।

দিলীপকুমার রায়

শুধু এক বেরসিকেরি তরে

ছুটিল মন্ত্রী,—মহারাজ নীলকণ্ঠের গান শুনিতে চান ;
যত টাকা লাগে দিবেন দান।
করজোড়ে নীলকণ্ঠ কহিল,—"করুণা তাঁহার অশেষ প্রভু,
শুধু সভাগীতি গাহি না কভু।"
মানিল মন্ত্রী বিস্ময়, "সে কী, প্রচুর অর্থ মিলিবে তোর।"
—"অপরাধ প্রভু ক্ষমো হে মোর,—
কৃষ্ণকৃপায় আজো জুটে যায় দুবেলা দুমুটো তাঁহার স্তবে,
প্রচুর অর্থে কী মোর হবে।"
তরজে মন্ত্রী,—"স্পর্ধা ! যাবি না !—পাঠালেন যবে ডাকিতে রাজা ?
জানিস মিলিবে মৃত্যু-সাজা।"
হাসিল ভক্ত,—"হরিগুণগান বেচি' কি রাখিব এ ছার প্রাণ।
গানেরো যে তাহে অসম্মান।"
পড়িল মন্ত্রী ফাঁপরে,—"লভিবি যশ—", "হায় প্রভু, যশের লাগি'
করে গান কভু গানানুরাগী ?"
কহিল মন্ত্রী সহসা,—"রাজা যে বৈষ্ণব।" কহে গায়ক তবে,—
"চলো—গান মম ধন্য হবে।"

প্রহ্লাদ-কথা কীর্তনে গুণী, সভাসদ যত তুণ্ড নাড়ে ,
বারেকো না চাহি' তাদের ধারে,
গাহে গান গুণী আপনা-বিভোর—মহারাজও হায়, বাহবাস্বরে
বরষে স্বর্ণ দর্পভরে।

থাকি' থাকি' শুধু এক কোণে এক দীনবেশী শ্রোতা উঠে কাঁদিয়া—
'আহা আহা' রবে উচ্ছ্বসিয়া।
কহে রাজা রুষি',—"কে রে বেরসিক। রাখিতে না শিখি' গুণীর মান
আসে এ সভায় শুনিতে গান।
বেতালা ফুকারে রহি',রহি'।চাষা! নিষ্কাশি' মূঢ়ে কেহ দে তো রে।"
দিল মূঢ়ে দ্বারী বাহির ক'রে।
কহে গুণী,—"প্রভু, স্বর্ণ তোমার দয়া ক'রে লহ ফিরায়ে পায়,
কিঙ্করো এবে মাগে বিদায়।"
"সে কি গুণী। মোরা সকলেই হেথা রয়েছি তো—শুধু হয়েছে দূর
এক অতি বেরসিক—বেসুর।"
"ক্ষমো প্রভু, নহে সকলের লাগি'—গাহিতেছিলাম পরান ভ'রে
ওই এক বেরসিকেরি তরে॥"

নিশিকান্ত রায় চৌধুরী

ধন্য

ধরণী আজি ধন্য হোলো তোমার চলা লভি';
তোমার-চলা উদয়াচলে জাগাল নব রবি।
সরণী তব চরণ তলে
বিকশি' ওঠে কুসুমদলে,
পবন তব পরশলীলা ভুবনে চলে জপি';
ধরণী আজি ধন্য হোলো তোমার চলা লভি'॥

নিশিকান্ত রায় চৌধুরী

সন্ধ্যা-তারা চিনিল তার বাঞ্ছিতরে আজি ;
চাঁদের বীণা তোমারে বরি' ভূতলে ওঠে বাজি'।
ধূলাতে নামি' ইন্দ্রধনু
শোভিল তব শ্যামল তনু—
আজি সে রঙে রঙিন হয়ে স্বপন রচে কবি ;
ধরণী আজি ধন্য হোলো তোমার চলা লভি' ॥

পণ্ডিচেরীর ঈশাণকোণের প্রান্তর

কোন্
সংগোপন
থেকে এল, এই উজ্জ্বল
শ্যামল
বিন্দুর শিখা।
এই পাষাণখণ্ড-কণ্টকিত
শুষ্ক রুধির-সঞ্চিত
প্রাণহীন রক্তবর্ণ মৃত্তিকা
কার স্পর্শে পেয়েছে প্রাণ।
অমৃত-সিঞ্চিত বন-মঞ্জরীর অবদান
কোন্ অদৃশ্য সৌন্দর্যের উৎস থেকে উৎসারিত—
এই গরল-কুণ্ডলিত
ভুজঙ্গ-ভূমির অঙ্গে অঙ্গে
প্রস্ফুটিত মাধুরীর তরঙ্গে।

যোজনের পর
যোজন বিস্তৃত প্রান্তর;
আজ সকাল বেলা
এসেছি এখানে। দূরে দূরে দেখা যায় রুক্ষ মাটির স্তূপের মেলা,
তারি উপর দণ্ডের মতো দাঁড়ানো জমাট বাঁধা পাথরকুচির চাঙড়া,
যেন ক্ষিপ্ত মুণ্ড
নাসাখড়্গধারী গণ্ডার, যেন উদ্যত শুণ্ড
মদ-মত্ত মাতঙ্গের মতো।

রাক্ষসী মেদিনী অবিরত
বৎসরে বৎসরে
নিজেই নিজেকে গ্রাস ক'রে ক'রে
সৃষ্টি করেছে এই আরক্তদশন
বুভুক্ষার গহ্বর প্রাঙ্গণ।
বক্ষে তার
বালু-কঙ্করের বঙ্কিত পন্থার
কঙ্কাল।
তারি একপাশে ভস্ম-ভাল
শ্মশান; প'ড়ে আছে দগ্ধ-শেষ চিতার
নিরুত্তাপ পাংশু অঙ্গার,
জীর্ণ মলিন বিক্ষিপ্ত কন্থার
রাশি, ভগ্ন কলসের কানা,
নর-কপালের করোটী, শকুনীর নখর-চিহ্ন, শব-লুব্ধ সংগ্রামে পরাজিত মৃত
বায়সের বিচ্ছিন্ন ডানা;
বসে আছে অপরাজেয়
লোলুপ দৃষ্টির অধিকারী কৃষ্ণকায় সারমেয়।

তবু সেখানে সর্বজয়ী জীবনের
বিকাশের
লিখা
এনেছে দুর্লভ তৃণ-মঞ্জরী, বিন্দু বিন্দু সবুজ গুল্ম-শিখা।—
আর
দুর্দম দুর্বার
মর্ত্য-বিদ্রোহী তালবিটপীর বৃন্দ ; তাদের
অটল স্বরূপের
অভিযান তুলেছে উর্ধ্বের
উদ্দেশে, যেন সহস্রশির
বাসুকীর
শত শত ফণা রসাতল ভেদ ক'রে
উঠেছে তুলে' অনন্ত অম্বরে,
তা'রা
পান করে যেন সেই সুনীল সুধার অক্ষয়-ধারা ;

যেন কোন্ খেয়ালী চিত্রকর, আষাঢ়ের
ঘনীভূত মেঘের
রঙের পাত্র শূন্য ক'রে নিয়ে
ধূম-কেতুর পুচ্ছের মতো বিশাল তুলি দিয়ে
ঐ অভ্রংলিহ রেখার সারি করেছে অঙ্কিত,
তারি চূড়ায়
শাখায় শাখায়

করেছে তরঙ্গিত
হরিদ্বর্ণ রশ্মিবিকীর্ণ তীক্ষ্ণধার
পাতার
ত্রিকোণ মণ্ডলিকাছন্দের নীহারিকাপুঞ্জ ; সেখানে বিষাণ
বাজায় বাতাস, দোলে বিজয় নিশান ;

তাদের
সর্ব অঙ্গে পুরু ইস্পাতের
চক্রাকার আবর্তনের
কালজয়ী আবরণ ;
নলকূপের মতো তাদের মূল—
এই উষরপিণ্ড পৃথুল
পৃথিবীর জঠরের অতলতলে
পলে পলে
করেছে সঞ্চিত
মর্ত্য-শ্মশান-মন্থিত
অমৃত।
হে সম্রাট শিল্পী, সুন্দর কোন্ অচিন্ত্য লোকের
রহস্যের
বেদিকায় বসে আছ তুমি।
এই মরু বাস্তব ভূমি
তোমার
নিমগ্ন কল্পনার
নির্লিপ্ত আনন্দের
পরম-বস্তু-রসের
রঞ্জনে রঞ্জিত হয়।

নিশিকান্ত রায় চৌধুরী

জ্যোতির্ময়,
দাও দীক্ষা, অপূর্ব রূপান্তর সাধনের মন্ত্র দাও আমায় ;
যে মন্ত্রের শক্তিতে সত্তায়
বিলুপ্ত হবে মেদিনীর
মাতঙ্গ প্রকৃতির
মদমত্ত অভিযান, রাক্ষসী কামনার
বুভুক্ষার
বিক্ষুব্ধ আসক্তি ;
জীবনের অভিব্যক্তি
হবে মূর্ত, ঐ বিরাট তাল-বিটপীর নীলাম্বর চুম্বিত আত্মার মতো, বর্তিকা
জ্বলবে অন্তরে
ঐ ওজস্বান তৃণ-শিখার অক্ষরে ।
দাও তোমার বর্ণ মন্দাকিনীর লাবণ্যধারা-নির্ঝরিত তুলিকা,
স্পর্শে যার
দীর্ণ ক'রে আমার
কঠিন প্রাণখণ্ডের শিলা
মুঞ্জরিত হবে তোমার
অমর্ত্য মালঞ্চের
মাধুর্য মন্দারের
সৌন্দর্য লীলা ।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমরা

আমরা কবিতা লিখি বিধাতার শুভ্র আশীর্বাদ
মোদের লেখনীমুখে অর্পিয়াছে অন্তহীন প্রাণ,
মর্ত্যের মানুষ মোরা শুনি তাই অমর্ত্য-সংবাদ,
কল্পনার পাখা মেলে উড়ে যাই উন্মুক্ত-অবাধ :
প্রত্যহের ধূলি-লিপ্ত বিষ-তিক্ত গ্লানি অপমান,
জীবনেরে করে যবে পলে পলে বিকৃত বিস্বাদ,
আমরা বহিয়া আনি ক্ষণিকের আনন্দ-সংবাদ
ছন্দোবদ্ধ-গান।

আমরা সৌন্দর্য-লিপ্সু—পৃথিবীরে মোরা বাসি ভালো ;
দিগন্ত-প্রসারী মাঠ, নির্মেঘ উদার নীলাকাশ,
প্রশান্ত নদীর ধারা, অকুন্ঠিত স্বচ্ছন্দ বাতাস,
নিশার সীমন্ত-প্রান্তে অর্ধস্ফুট নক্ষত্রের আলো—
কুরঙ্গ-চঞ্চল চিত্ত কিশোরীর ভীরু ভ্রূ-বিলাস,
আমরা সাদরে দেখি—দেখি তার বেণী মেঘকালো ;
মোদেব উদ্বেল বক্ষে অতর্কিতে ঘনায় ঘোরালো
ভাবমুগ্ধ শ্বাস।

আমরা বধির নই—কানে মোরা শুনি দিনরাত,
ধ্বনিছে চৌদিক হতে ধরণীর আর্ত ক্লিষ্ট রোল,
জীবন-শিয়রে বসি' মরণের উচ্চকিত দোল

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমরা জানিতে পারি ; দাবদগ্ধ নির্মম আঘাত
দুঃসহ তরঙ্গ-ভঙ্গে তটে তটে তুলিয়া কল্লোল
ভঙ্গুর সঞ্চয় যত অসংকোচে করে আত্মসাৎ—
তবু প্রতি নিশি শেষে ডাকে আসি আসন্ন প্রভাত,
'খোল্ দ্বার খোল্।'

তনুর লাবণ্য হেরি' হই মোরা আনন্দ-বিহ্বল,
জানি তবু রক্ত-মাংস-মেদ-মজ্জা কদর্য কুৎসিত
আছে তার অন্তরালে—কুসুমের সংক্ষিপ্ত সম্বিৎ
জানি ক্ষুদ্র পতঙ্গের ক্ষুদ্রতর ক্ষুধার সম্বল।
মূর্ছাতুর হৃৎতন্ত্রী, ভয়ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ চকিত,
সম্মুখে নিবিড় কালো পায়ে-পায়ে প্রহত উপল—
তবু এ ধরণী পানে চেয়ে চেয়ে চোখে আসে জল,
কণ্ঠে জাগে গীত।

জানি বন্ধু, জানি মোরা এ ধরণী নহে চিরন্তন,
তুমি-আমি তুচ্ছ কথা, সবি হবে নিঃশেষে নিলয়.
স্তব্ধ হবে চরাচর, মহাব্যোমে ব্যাপিবে প্রলয়,
বিস্মৃতি-পাণ্ডুর হবে আজিকার রক্তাভ যৌবন।
তবু এ দেহের পিণ্ডে যতখানি প্রাণ বদ্ধ রয়,
ক্ষণিক খেলানা ল'য়ে রচি মোরা অনন্ত স্বপন,
অফুরন্ত গীত-গন্ধে আমাদের নিজস্ব ভুবন
চির প্রাণময়।

ছন্দের শৃঙ্খলে মোরা রোধিয়াছি সময়ের গতি,
গড়েছি চিন্ময় বিশ্ব বিস্মৃতির বারিধি-বেলায় ;
নিষ্ফল শূন্যতা শুধু বাহু মেলে ডাকে 'আয়' 'আয়'
সৃষ্টির গৌরবে মোরা ফিরে নাহি চাই তার প্রতি।
মোদের সংগীত রেশ কেঁপে কেঁপে তারায় তারায়,
লোক হতে লোকান্তরে ছুটে চলে ত্রস্ত লঘুগতি ,
ভবিষ্যের স্বপ্ন মোরা—অনাগত জানাবে প্রণতি,
আমাদের পায়।

সনেট

১

মরণে সমাপ্তি হবে—তারপর নির্মম আঁধারে
সব চিহ্ন লুপ্ত হবে, মুছে যাবে ক্ষীণতম দাগ—
এই দ্বিধা এই দ্বন্দ্ব হানাহানি, উদ্যোগ বিরাগ
অতল বিস্মৃতি মাঝে অবলুপ্ত হবে একেবারে।
আজিকে বুকের রক্তে দণ্ডে দণ্ডে স্মরিয়া যাহারে
আশা আর নিরাশায় মুহুর্মুহু পড়ে লক্ষ পাক,
সেদিন সে মুছে যাবে—নিত্য এই সহি যে নির্বাক
দারিদ্র্যের দৃপ্ত কশা—চলে যাব তারো শেষ পারে ?

মরণে কী লাভ তবে। এই জীর্ণ উদ্বেগ যন্ত্রণা
বাঁচার বরণমাল্য, এই নিয়ে দীর্ঘ বর্ষমাস
দুর্লভ সুদূরে স্মরি' ব্যর্থতায় ফেলি দীর্ঘশ্বাস,

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

দুঃখের তিমিরতীর্থে করি নিত্য প্রাণের সাধনা।
ক্ষুদ্র হোক, তুচ্ছ হোক, তবু ভালো আশার বঞ্চনা,
আশাহীন পূর্ণচ্ছেদ, মৃত্যু তার নাই ইতিহাস।

২

চিন্তার সীমান্ত শেষে—কোনোখানে কোনো কল্পলোক
হয়তো এখনো আছে—মানুষের দৃপ্ত পদরেখা,
তার রক্তধূলি পরে হয়তো হয়নি আজো লেখা—
হয়তো ধূমায়মান নয় সেথা প্রভাত আলোক।
লালসার বিষবাষ্পে কলুষিত ক্ষুধাতুর চোখ
উলঙ্গ করেনি তারে—নিঃসঙ্গ নির্মল আজো একা,
অবাধ পূর্ণতা লয়ে দিগন্তরে আজো দেয় দেখা,
হয়তো সে মায়ারাজ্য আনন্দের অদৃশ্য দ্যুলোক।

একটি মুহূর্ত শুধু দুর্লভ রঙিন ভোরবেলা
হাতে হাতে ধরাধরি যাওয়া যেত যদি গো সেখানে—
সংকোচ আশঙ্কাহীন সেথাকার পুষ্পিত বাগানে,
প্রাণ ভরে যদি যেত খেলে যাওয়া এলোমেলো খেলা—
ভুলে যদি যেত যাওয়া প্রত্যহের তুচ্ছতার মেলা—
আরো কি সুন্দর হোত দু'জনার এ স্বপ্ন, কে জানে।

৩

কবিতা ঘুমায়ে আছে, বুকে মুখে ওড়ে এলোচুল,
অলস শীতের রাতে আলুথালু কবিতা ঘুমায়—
ফেলো না নিশাস তার নিমীলিত চোখের পাতায়,

শিয়রে রেখো না হাত, ডেকো না, হবে সে মহা ভুল।
কবিতা ঘুমায়ে আছে, ঘুমায়েছে ভীরু জুঁই ফুল—
চুপি চুপি কাছে এসো, টিপি টিপি অতি লঘু পায়,
ফ্যাকাশে চাঁদের তলে ঝিলিমিলি আলোয় ছায়ায়,
দূর হতে দেখো শুধু ঘুমে তার শরীর আকুল।

বিজন শীতের রাতে বুকে যদি কথা জমে ওঠে
আজ তা গোপন করো,—যদি চোখে জল ভরে আসে
নীরবে ঝরায়ে দিয়ো পদতলে হিম-জাগা ঘাসে
খুঁজো না জবাব তার কবিতার ঘুমে-ভেজা ঠোঁটে।
তোমার সাড়ায় যদি কবিতার কাঁচা ঘুম টোটে,
তোমারি স্বপন ভেঙে কবিতা সে মিলাবে আকাশে।

হেমচন্দ্র বাগচী

দুরাশা

অনাদি ক্রন্দন মোর মর্মতলে আঘাতিয়া ফিরে ;—
কোটি কোটি সিন্ধু-শঙ্খ ঘন ঊর্মি-বিভ্রম-চূড়ায়
শোভে যেন রৌদ্রালোকে ; কে যেন রে কেতন উড়ায়,
লঘু শুভ্র চীনাংশুক—মত্ত বায়ু নিত্য তারে ঘিরে।
সে কী ভীম আয়োজন।—বক্ষ যেন লক্ষ হয়ে চিরে

ধূলিতে মিশাতে চায় আপনার শ্রেষ্ঠ সাধনায় ;
সার্থক করিবে যেন প্রত্যহের তুচ্ছ ব্যর্থতায়।—
দ্বিধা তবু চিরদিন,—প্রাণ তাই গুমরে অধীরে।

এ কী আত্মনাশী তৃষা। নব নব চিন্তারে জড়ায়ে
এ কী ক্ষোভ অহরহ। কী দুর্বার চিত্ত-বিমথন।
ভাষা এরে নাহি পায় ;—আশা তবু ঘুরায়ে ঘুরায়ে
দেখে লয় হৃত রত্ন : পঙ্গু যেন করিবে লঙ্ঘন
দুর্গম শঙ্কর-শৃঙ্গ। মনে হয়, শিখর ছাড়ায়ে
উঠিয়াছে বীর-শির—বিন্ধ্য নয়—চুম্বে সে গগন।

ক্ষিতীশ রায়

পরিণতি

রজনীর শেষে নিঃঝুম জাগরণে
কপোতী যখন কোমল কূজন রত,
আসিল ভাসিয়া প্রভাতের সমীরণে
অ-ফোটা ফুলের আকুল গন্ধ যত
উতলা হিয়ার গোপন প্রেমের মতো।

দিবসের শেষে বর্ষণ শুরু আকাশে
কপোতী কুলায়ে কাতর কূজন রত,
আসিল ভাসিয়া অশ্রু সজল বাতাসে
ঝরেছে যে ফুল তাহারি গন্ধ যত
বিফল প্রেমের গভীর ব্যথার মতো।

বন্দে আলী মিয়া

ময়নামতীর চর

এ-পারের এই বুনো ঝাউ আর ও-পারের বুড়ো বট
মাঝখানে তার আগাছায় ভরা শুকনো গাঙের তট,
এরি উঁচু পাড়ে নিত্য বিহানে লাঙল দিয়েছে চাষী,
কুমীরেরা সেথা পোহাইছে রোদ শুয়ে শুয়ে পাশাপাশি।
কূলে কূলে চলে খরসুলা মাছ, দাঁড়িকানা পালে পালে
ছোঁ দিয়ে তার একটারে ধরি' গাঙ চিল বসে' ডালে
ঠোঁটে চেপে ধরি' আছাড়ি আছাড়ি নিস্তেজ করি' তায়
মুড়ো পেটি লেজ ছিঁড়ি' একে একে গিলিয়া গিলিয়া খায়।
এরি কিছু দূরে এক পাল গোরু বিচরিছে হেথা সেথা
শিঙে মাটি মাখা দড়ি ছিঁড়ি' ষাঁড় চলে সে স্বাধীনচেতা।
মাথা নিচু করি' কেহ বা ঝিমায় কেহ বা খেতেছে ঘাস,
শুয়ে শুয়ে কেহ জাবর কাটিয়া ছাড়িতেছে নিঃশ্বাস,
গোচর-পাখিরা ইহাদের গায়ে নির্ভয়ে চলে ফেরে
উকুন আঠালু ঠোকরিয়া খায় লেজের পালক নেড়ে,
বক পাখিগুলা গোচরকীয়াব হয়েছে অংশীদার
শালিক কেবলি করিছে ঝগড়া—কাজ কিছু নাই তার।

নতুন চরের পলি জমিটাতে কলাই বুনেছে যারা
আখের খামারে দিতেছে তারাই রাতভর পাহারা।
খেতের কোণায় বাঁশ পুঁতে পুঁতে শূন্যে বেঁধেছে ঘর
বিচালী বিছায়ে রচেছে শয্যা বাঁশের বাখারি 'পর।

বন্দে আলী মিয়া

এমন শীতেও মাঝ-মাঠে তা'রা খড়ের মশাল জ্বালি'
ঠক্‌ঠকি নেড়ে করিছে শব্দ—হাতে বাজাইছে তালি।
ওপার হইতে পদ্মা সাঁতারি' বন্য বরাহ পাল
এ-পারে আসিয়া আখ খায় রোজ ভেঙে করে পয়মাল।
তাই বেচারীরা দারুণ শীতেও এসেছে নতুন চরে
টোঙে বসি' বসি' জাগিতেছে রাত পাহারা দেবার তরে;
কুয়াশা যেন কে বুলায়ে দিয়েছে মশারির মতো করি'
মাঠের ও-পাশে ডাকিতেছে 'ফেউ' কাঁপাইয়া বিভাবরী।
ঘুমেল শিশুরা এই ডাক শুনি জড়ায়ে ধরিছে মায়,
কৃষাণ যুবতী সাপটি' তাহারে মনে মনে ভয় পায়;
'ফেউ' নাকি চলে বাঘের পিছনে গাঁয়ের লোকেরা বলে—
টোঙের মানুষ ভাবিতেছে ঘর, ঘর ভেজে আঁখি জলে।

এই চরে ওই হালটের কোণে বিঘে দুই খেত ভরি'
বট ও পাকুড়ে দোঁহে ঘিরে ঘিরে করি' আছে জড়াজড়ি।
গাঁয়ের লোকেরা নতুন কাপড় তেল ও সিঁদুর দিয়া
ঢাক ঢোল পিটি' গাছ দুইটির দিয়ে গেছে নাকি বিয়া।
নতুন চালুনি ভেঙে গেছে তার, মুছি আর কড়িগুলা
রাখাল ছেলেরা নিয়ে গেছে সব ভরি' গামছার ঝুলা।
চড়কের মেলা এই গাছতলে হয় বছরের শেষে
সেদিন যেন গো সারা চরখানি উৎসবে ওঠে হেসে।
বটের পাতায় নৌকা গড়িয়া ছেড়ে দেয় জলে কেউ,
এই চর হতে ওই গাঁ'র পানে নিয়ে যায় তারে ঢেউ।
ছোটো ছেলেপুলে বাঁশি কিনে কিনে বেদম বাজায়ে চলে,
বুড়োদের হাতে ঠোঙায় খাবার, কাশে আর কথা বলে।

ছেঁড়া কলাপাতা টুকরো বাতাসা চারিদিকে পড়ে রয়
পরদিনে তার রাখাল ছেলেরা সবে মিলে খুঁটে লয় ;
উৎসব শেষে খাঁ খাঁ করে হায় শূন্য বালির চর—
এ-পারের পানে চাহিয়া ও-পার কাঁদে শুধু রাতভর।

সুধীরচন্দ্র কর

কল্যাণী

ওই তার বাড়ি,—
—ঐ যে ঘেরিয়া আছে রাংচিতার সারি
আঙিনার সীমা। এককোণে কয়েকটি
কলাগাছ। অন্যধারে সীম বরবটি
ছড়াইছে ডালপালা বাঁশের মাচায়।
সায়াহ্নের সুমন্থর বাতাসে নাচায়
তার তাজা ডগাগুলি। পরিপুষ্ট শ্যাম
সঘন পল্লব শোভা নয়নাভিরাম।
তারি পাশে খুঁটিবাধা দেখায় গাভীর
সুচিক্কণ শুভ্ররোম স্থূলকান্ত স্থির
ছবিখানি। মাতা সুখে খায় তৃণজল,
কাছে আছে দাঁড়াইয়া বৎসটি কোমল ;
মাঝে মা এক-একবার অঙ্গ তার চাটে,
দুধ খেতে খেতে বৎস গুঁতো মারে বাঁটে।

সুধীরচন্দ্র কর

পিতলের ঘটি এক কুয়োতলাপাড়ে,
বাল্‌তি দড়িতে বাঁধা, শুখাইছে আড়ে
বেলাশেষে ধুয়ে-দেওয়া শাড়িখানি কার,—
জ্বল্‌জ্বল্‌ করে তার গাঢ় কালো পাড়।
উঠানের মাঝখানে এক মোড়া ধান,
পায়রা শালিখ করি' তণ্ডুল সন্ধান
পায়ে পায়ে ঘোরে ফিরে গ্রীবা বাড়াইয়া;
গৃহদ্বারে পিঞ্জরেতে পোষমানা টিয়া।
খড়কুটো ঠোঁটে তুলি' ব্যস্ত টুনটুনি
করে শুধু ঘর-বার। টিনের ছাউনি,
কাঁচা ভিৎ বাস্তু-ঘর। বাঁধানো সিঁড়িতে
সাজানো ফুলের টব, দুয়ার শোভিতে
লতার কেয়ারি-তোলা অর্ধচন্দ্রাকার;
কানাচ করেছে আলো মল্লিকার ঝাড়।
প্রায়-ই থাকে পশ্চিমের জানালাটি খোলা,
ওই দিকে চলে গেছে রিক্ত পথভোলা
ধূসর বিস্তীর্ণ মাঠ; দিগ্বলয়-সীমা
বহুদূরে ছুঁয়ে আছে পিয়াসী নীলিমা।
পায়ে-চলা পথখানি পড়িয়া অদূরে,
মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে মেঠো বাঁশিসুরে।
রক্তচ্ছায়া সন্ধ্যারবি ধীরে অস্ত যায়,
ব্যথাতুর আলোরেখা পড়ে জানালায়—
দেখা দেয় একখানি কম কচি মুখ,—
তারি মাঝে ভাসে সেথা একান্ত উৎসুক
টানা দুটি কালো চোখ নিমেষবিহীন,
দিনান্তেরি সাথে যেন হোতে চায় লীন

চিরপরিসমাপ্তির নৈঃশব্দ-পাথারে।
গৃহকাজে টানে মন—তবু বারেবারে
চায় ফিরে। শেষে উঠে দেয় ঘর ঝাঁট,—
শুকানো কাপড়গুলি ক'রে রাখে পাট।
গাছে ঢালে জল, নেয় গাভীটি গোয়ালে;
দু-চারিটি পত্রপুষ্প একখানি থালে
সাজাইয়া রাখে যত্নে বসিবার ঘরে,
জ্বালে সন্ধ্যাধূপদীপ, যায় তার পরে
পাকশালে, প্রবীণা গৃহিণী মার সাথে
অন্নসুধা আয়োজনে লাগে হাতে হাতে।
ক্রমে রাত্রি বেড়ে ওঠে, চোকে খাওয়া-দাওয়া
কাজে কাজে কাটে কাল; অন্ধকার-ছাওয়া
আঙিনাটি পার হয়ে শয়ন মন্দিরে
যায়, শয্যায় আশ্রয় লয়; পাশ ফিরে
বৃদ্ধা পিসি গুঞ্জস্বরে জোড়ে আলাপন;
ক্লান্তি নামে সারা দেহে, ঢোলে দুনয়ন,—
কত কী মনের কথা জমে হয় ভারি
প্রদীপ নিভায়ে দিয়ে ঘুমায় কুমারী॥

সাধক দ্বিজেন্দ্রনাথ

ঐ দূরে দেখা যায় ধূসর প্রান্তর
বন্ধুর বিরলতৃণ উদার গম্ভীর,
ওরই বুকে রাজে তব শ্মশানবাসর,
ছত্র নাই, পত্র নাই, ওঠেনি মন্দির।

সুধীরচন্দ্র কর

দিনের প্রথম ডালি নব রৌদ্রবানে
রবিকর হতে ঝরে বেদীর চৌধারে,
বিহগ বিহগীদল বৈতালিক তানে
ঊর্দ্ধ্বাকাশে নন্দি' যায় স্মরিয়া তোমারে।
বায়ু বহে ধীরে স্বল্প তৃণ দুলাইয়া
অলক্ষ্য সে নিসর্গের চামর ব্যজন.
পুষ্প নাই আছে রক্ত কঙ্করের হিয়া
লালিমায় লেপিয়াছে চাতালে চন্দন।
ধূপধূনো কোথা, শুধু শুষ্ক ধুলাবালি,
গোষ্ঠধেনু-কণ্ঠে বাজে ঘণ্টা-কোলাহল,
দিগ্‌বালা স্বর্ণ থালে সাজায়ে বৈকালি
আরতি করিয়া যায় দিনান্তে কেবল।
নাহি আসে সাধু সন্ত নাহি মিলে মেলা
আজও কেহ করে না এ তীর্থ পর্যটন,
শুধু হেরি ভোর হতে অপরাহ্নবেলা
রাখালেরা আশেপাশে করে গোচারণ।
তুমি চলে গেছ, তব রয়েছে আভাস
হে তপস্বী জ্ঞানবৃদ্ধ চিরশিশু-প্রাণ,
তা'রে ঘিরে আছে শান্ত দীপ্ত নীলাকাশ,—
দেহে নাই আছ মনে অমৃত সন্তান॥

জসীম উদ্দীন

উড়ানির চর

উড়ানির চর ধুলায় ধূসর
যোজন জুড়ি'
জলের উপরে ভাসিছে ধবল
বালুর পুরী।

ঝাঁকে বসে পাখি ঝাঁকে উড়ে যায়
শিথিল শেফালি উড়াইয়া বায়,
কিসের মায়ায় বাতাসের গায়
পালক পাতি';
মহা কলতানে বালুয়ার গানে
বেড়ায় মাতি'।

২

উড়ানির চরে কৃষাণ-বধূর
খড়ের ঘর,
ঢাকাই সীমের উড়িছে আঁচল
মাথার 'পর।

জাঙ্‌লা ভরিয়া লাউএর লতায়
লক্ষ্মী সে যেন দুলিছে দোলায়;

ফাগুনের হাওয়া কলার পাতায়,
নাচিছে ঘুরি'।
'উড়ানিচরে'র বুকের আঁচল
কৃষাণ-পুরী।

৩

'উড়ানির চর' উড়ে যেতে চায়
হাওয়ার টানে
চারিধারে জল করে ছলছল
কী মায়া জানে।

ফাগুনের রোদ উড়াইয়া ধূলি
বুকের বসন নিতে চায় খুলি',
পদতলে জল কলগান তুলি'
নূপুর নাড়ে;
'উড়ানির চর' চিকচিক করে
বালুর পাড়ে।

৪

'উড়ানির চরে' ছাড়-পাওয়া রোদ
সাঁঝের বেলা—
বালু লয়ে তা'রা মাখামাখি করি'
জমায় খেলা।
কৃষাণী কি ব'সে সাঁঝের বেলায়
মিহি চাল ঝাড়ে মেঘের কুলায়,

ফাগের মতন কুঁড়া উড়ে যায়
আলোক ধারে ;
কচি ঘাসে তা'রা জড়াজড়ি করে
গাঙের পারে।

৫

'উড়ানির চরে' তৃণের অধরে
রাতের রানী,
আঁধারের ঢেউ ছোঁয়াইয়া যায়
কী মায়া টানি'।

বিরহী কৃষাণ বাজাইয়া বাঁশি
কালো-রাতে মাখে কালো-ব্যথা রাশি ;
থেকে থেকে চর শিহরিয়া উঠে,
বালুকা উড়ে ;
উড়ানির চর ব্যথায় ঘুমায়
বাঁশির সুরে।

রামেন্দু দত্ত

মজঃফরপুরে ভূমিকম্প

সহসা শরীর টলিয়া উঠিল, হাতের কলম কাঁপিল কেন।
মাথা ঘোরে কি ও, এ কী মুশকিল, চেয়ার টেবিলও কাঁপিছে যেন।
ও কী কোলাহল—"পালাও, পালাও", হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে ছুটিছে সবে,
সহসা পবন হোলো উতরোল ঘণ্টা-কাঁসর-শঙ্খ-রবে।

রামেন্দু দত্ত

"ভূঁই ডোল্, ভেইয়া ভূঁই ডোল্" ওরে ভূমিকম্প-এ সর্বনাশ।
বাসুকি নাগের শির টলিতেছে, কোথা প্রাণ ল'য়ে পলাতে চাস।
ঘরের বাহির হইতে, সে ঘর ধূলিসাৎ হোলো একটি পলে,
চারিদিকে বাড়ি চুরমার হয়, মাতালের মতো বাকিরা টলে।

পায়ের নিচেতে চির-স্নেহময়ী মাটীর ধরণী ধরে না ভার—
চিরশ্যামলিয়া সর্বংসহা মাতা যে ভরসা দেয় না আর।
কাঁপে থর থর যত জীব জড়, মাটির খেলেনা কাঁপিছে যত
আকাশের আলো নিচে নেমে এসে কাঁপে থরথর ভীরুর মতো।
ধূলি মাটি গাঁথা রাজার প্রাসাদ, হাজার রম্য অট্টালিকা
তা'রা অসহায ধূলিতে লুটায় খণ্ডিবে কেবা ললাট-লিখা।

ছুটে যাই মাঠে, ও কী ও সহসা মাটি ফেটে ওঠে ঘোলাটে জল।
গন্ধকভরা গন্ধ-ফোয়ারা উচ্ছলি' ওঠে অনর্গল।
দেখিতে দেখিতে প্লাবি' প্রান্তর, প্লাবিয়া মোদের চতুর্দিক—
ছুটে এল জল, ধ্বংসপাগল, হেরি' মৃত্যুরে নির্নিমিখ।
হেরি ধরণীর বক্ষ বিদারি' লক্ষ ধারায় অশ্রু ছুটে।
রুদ্ধ বেদনা ধূম্র হইয়া শতেক রন্ধ্রে ঊর্ধ্বে উঠে।

যতদূর যায় আঁখির দৃষ্টি ধ্ব'সে পড়ে বাড়ি উড়ায়ে ধূলি,
গর্জিয়া জল ধেয়ে ছুটে যায় সর্পের মতো চক্র তুলি'।
ইঁটের কাঠের স্তূপ হয়ে ওঠে নরনারী-শিশু-কবর শেষে।
ভাসাইয়া লয় ভাঙা খোড়ো চাল ওধারেতে জল অট্টহেসে।
গোরু চ'লে যায় একদিকে, আর বাছুর চলেছে অন্যধারে,
কাতর 'হাম্বা' ধ্বনি ডুবে যায়, ধ্বংসলীলার হুহুংকারে।

মাটি ফেটে ওঠে অনল-হল্‌কা, কাদা ওঠে আর উঠিছে ধূম—
কাদা ও মাটির দ্বীপের উপরে কেহ বা ঘুমায় করাল ঘুম।
শিশুকোলে মাতা করে হাহাকার, আর দুটি ছেলে ইটের তলে,
পিতার বক্ষে কোথাও বালিকা মাতারে খুঁজিছে নয়নজলে।
"ওগো ছোটো খোকা বিছানায় আছে" ব'লে যে জননী ঢুকিল ঘরে,
খোকারে স্বামীর হাতে না দিতেই, তার শিরে ছাদ ভাঙিয়া পড়ে।
রুগ্ন ছেলেটি দোতলায় শুয়ে, হাড় ও চামড়া হয়েছে সার,
সকলে ছুটিয়া মাঠে জড়ো হোলো, সেও তার মাতা হোলো না বার।
প্রাণাধিকা প্রিয়া, ছেলেমেয়ে আর, বাঁচাইতে গিয়ে কেহ বা হোথা
সবাকার সাথে বসৎ-ভিটাতে চিরদিন তরে রহিল পোঁতা।

কাঁদবার লাগি' কোথাও বা জাগি' রহিল না বেঁচে জনপ্রাণী,
ধুয়ে মুছে সব সাফ্‌ ক'রে নিল ধ্বংস দেবের রুদ্রপাণি।
বিকৃত অঙ্গ ব্যথায় বিকল অর্ধ-প্রোথিত ধ্বংস-স্তূপে,
কাঁদিছে হেথায় নর নারায়ণ অতি অসহায় মানবরূপে।
করে হাহাকার শ্মশান মাঝারে অভাগা আতুর দুঃস্থ দল,
হিমে হি হি করে শূন্য উদরে পান করে লোনা চোখের জল।
যারা বাঁচিলেও বাঁচিতে পারিত কেবা তাহাদের টানিয়া তোলে
শকট বোঝাই রাশি রাশি শব স্থান পাইতেছে নদীর কোলে।

ধরণীর বোঝা ধরিতে পারে না, ক্লান্ত বাসুকি পাপের ভারে,
তাই বুঝি তার ফণা সহস্র হেলায়ে ধরায় ঈষৎ নাড়ে,
মাটি ফুঁড়ে ওঠে তারই নিশ্বাস, বিষধূমরাশি ছড়ায় নভে,
গন্ধক জল হয়তো তরল তাহারই ফণার গরল হবে।
ওই হাহাকার ওঠে ব্যোমপথে লক্ষ মানব-কণ্ঠ-চেরা,
বম্মানগরী চারিদিকে আজ শ্মশান-সলিল-সমাধি ঘেরা।

কাজী কাদের নওয়াজ

হারানো টুপি

টুপি আমার হারিয়ে গেছে
হারিয়ে গেছে ভাই রে,
বিহনে তার এই জীবনে
কতই ব্যথা পাই রে,
হাসবে লোকে শুনলে পরে
হারাল সে কেমন ক'রে,
কেমন ক'রে বৈশাখী ঝড়
উড়িয়ে দিল মোর সে টুপি,
বুঝেছি হায় টুপির লোভে
দেব্‌তাদেরই এ কাচুঁপি।

২

থাকৃত টুপি দুপুর রোদে
ছায়ার মতোই মাথায় মম,
কখনো বা বাতাস পেতাম
ঘুরিয়ে তারে পাখার সম।
বক্ষে তাহার নিতুই প্রাতে
ফুল রেখেছি আপন হাতে,
সে ছিল মোর ফুলদানি আর
ফুলের সাজি একসাথে হায়,
জানিনে আজ কোথায় গেছে
কোন্‌ দেশে সে কোন্‌ অলকায়।

৩

হয়তো এখন পবন দেবের
মাথায় আছে সেই টুপি মোর
এদিকে তার বিচ্ছেদে হায়
আমার চোখে ঝরতেছে লোর ;
ভুলতে নারি টুপির প্রীতি
জাগছে হৃদে শুধুই স্মৃতি,
বিদেশ গেলে বালিশ হোত
হায় সে টুপি মোর শিয়রে
চলতে পথে সেলাম পেতাম
থাকলে টুপি মাথার পরে।

৪

তিনটি টাকায় কিনেছিলাম
"চাঁদনি" হতে সেই টুপিরে
তিনশ টাকা দিবই আজি
পাই যদি ফের তারেই ফিরে।
চার মিনিটে 'চসার' প'ড়ে
শেষ করেছি টুপিব জোবে,
পরীক্ষাতে প্রথম হতাম
থাকলে টুপি মাথার 'পবে
দুখের দিনের বন্ধু টুপি
কোথায় গেলি আজকে ওরে।

৫

আজিও হায় নিমন্ত্রণে
গেলে সভার মধ্যিখানে

সব ভুলি' যে প্রথম আমি
তাকাই লোকের মাথার পানে।
দেখি কেবল চুপি চুপি
কার শিরে রয় আমার টুপি,
মিলে না খোঁজ সভার থেকে
ফিরে আসি শুষ্ক মুখে,
নূতন টুপি কিনব না ভাই
পণ করেছি মনের দুখে॥

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

বিচিত্রা ধরণী

সহসা ভাঙিল ঘুম ; গভীর রজনী ;
মৃতা স্তব্ধা বাক্যহীনা বিস্তৃতা ধরণী
পড়ে আছে ধূম্রবর্ণা ; দিকে দিকে দিকে
অজস্র শ্রাবণ-ধারা বর্ষে অনিমিখে
ভীতা ত্রস্তা ধরাপৃষ্ঠে—হরিণী-শরীরে
তীব্র ঘন বাণ সম। বায়ু ঘুরে ফিরে
দক্ষিণে পুরবে কভু প্রবল নিস্বনে
বাদলে বিত্রস্ত করি' অশান্ত চরণে
ছুটিছে উদ্দাম।
দাঁড়াইয়া বাতায়নে
হেরিতেছি জল আর পবনের সনে
দ্বন্দ্ব অবিরাম।

সহসা বাজিল বক্ষে
সর্ব পৃথিবীর সর্ব দেশে কক্ষে কক্ষে
উঠিছে উল্লাস যত ক্রন্দন নিশ্বাস ;
সানন্দ মিলন আর হাস্য পরিহাস ,
জননীর স্নেহ কথা ; প্রিয়ার ভাষণ ;
শিশুদের আলাপন ; যোদ্ধার গর্জন ;
মিত্রজনে সকৌতুক রহস্য-বচন ;
আর্ত, নিঃস্ব ব্যথিতের উচ্ছ্বাস-বেদন ;
ধরণীর সর্ব সুখ আর সর্ব ব্যথা ;—
সহসা সকলে মিলি' রচি' নিবিড়তা
আসিল হৃদয়ে মোর। মনে হোলো আজ
যে মুহূর্তে আমি হেরি, ভুলি' সব কাজ,
বরষার মেঘ আর বারির নর্তন—
সে মুহূর্তে ধরাবক্ষে বিচিত্র স্পন্দন
উঠিতেছে অবিরাম।
এই এ নিমেষে
বনে-ঘেরা ধরণীর কোন্ প্রান্তদেশে
জীর্ণ কুটীরের মাঝে বসিছে জননী
জাগরণ-শীর্ণা, ক্ষীণা, মলিন-বরনী—
মুমূর্ষু সন্তান বুকে ; মৃত্যু দয়াহীন
তীব্র কষাঘাতে নিত্য করিতেছে ক্ষীণ
সে প্রিয় সন্তানে। জননী নামায়ে মুখ
দুর্ভেদ্য বাহুর বাঁধে প্রসারিয়ে বুক,
আগুলায় সে সন্তানে ; ছাড়িবে না তারে ;
প্রাণ-আলো যত নেবে, তত আশা বাড়ে—
"রাখিব রাখিব ধ'রে।" ... ...

প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

আবার কোথায় কোন সুষুপ্ত ভবন—
নিস্তব্ধ চরণে চলে প্রতিহিংসা-ভরে
কোন নর, আত্মীয়েরে নাশিবার তরে*
ল'য়ে ছুরি।
কোথা হাসে প্রথমা জননী,
আজি রাত্রে লভিয়াছে আনন্দের খনি
প্রথম সন্তান।
কোথাও জ্বলিছে ঘর—
যত্নে-ঘেরা আরামের সুন্দর নিগড়
সর্বনাশা অগ্নিমুখে পুড়ে হয় ছাই।
ত্রস্ত গৃহী বলে—"কই, ভগবান নাই।"
বিবাহ-উৎসবে কোথা সারা গ্রাম মাতে
উল্লাসে উচ্ছ্বাসে ভোজ্যে আজিকার রাতে
বহিছে প্রাণের বন্যা। শত নারী নর
বলে যেন—"দুঃখ নাই ধরণীর 'পর।"

প্রথমা বিধবা আজি কোথায় লুটায়,
আছাড়ি' ধরণী 'পরে করে 'হায়, হায়'
নাথহীনা। অন্ধকার গৃহখানি তার
দীর্ঘশ্বাসে বেদনায় কাঁপে বারংবার।

আজিকে বরষা-রাত্রে বিচিত্র বিলাপ,
বিচিত্র আনন্দ, সুখ, বিচিত্র সন্তাপ—
ধরণীর মানবের সকল বেদন,
বরষা ধারার মাঝে তোলে শিহরণ
হৃদয়ে আমার। চুম্বক সমান হিয়া

ধরণীর সর্বদেশ হতে আহরিয়া
সব দুঃখ সুখ আজি করে অনুভব ;—
বিচিত্র আস্বাদ তার ; সে যেন বিভব
সমারোহে হৃদয়েরে করিছে দুর্বার ;—
সবাকার দুঃখ সুখ আঁজিকে আমার।

হাসিরাশি দেবী

তোমার ধরায় প্রতি প্রাতে হোক

বন্ধু, হেরিছ আমার অদূর সুনীল সন্ধ্যাকাশে
রজনী আসিছে নামি'—
চির যবনিকা সাথে,
তবুও ক্ষণিক দাঁড়ায়ে তোমার খেলার পান্থবাসে
নাম লিখে যাই আমি,—
আলোকের আলেয়াতে.
আমি গেলে মোরে ভুলে যেয়ো, আর কোনোদিন জাগায়ো না,
তার চেয়ে র'য়ো জাগি'—
নব প্রভাতের তরে,
যে কথা কারেও শুধাওনি, তাহা আমারেও শুধায়ো না।
পিছন হইতে ডাকি'
আজি আগ্রহভরে।

হাসিরাশি দেবী

তার চেয়ে দেখো দূর-দিগন্তে আকাশ ধরণী মিশি'
যেথা হোলো একাকার,—
উড়ে যায় বলাকারা,
তার চেয়ে শোনো বাঁশি কে বাজায়, সাড়া দেয় দিশি দিশি
স্তব্ধ ব্যর্থতার
শেষ হয় আঁখি ধারা।
কবে কোন্‌দিন বেদনা-ব্যাকুল পাণ্ডুর শশধর
চেয়ে র'বে মুখপানে,
সে কথা ভুলিয়া যাও,—
তার চেয়ে খেলো নূতন খেলায়, যা হয় পূর্বাপর,
পুরাতন অবসানে ;
আবার ভুলিয়ো তাও।
বন্ধু, আজিও আমার জীর্ণ মন-মর্মর তলে
তোমারই নয়ন আঁকা
বুকের শোণিত দিয়া,—
লাজের লালিমা হারায়েও সে যে ঘন কালো হয়ে জ্বলে,
ব্যর্থ বাসনা মাখা,
ম্লান মুমূর্ষু হিয়া ;
পৃথিবীতে মোর হয়েছে কাকলী-কূজন-চিহ্ন শেষ,
দগ্ধ এ মরু পথে
বন্ধু, বিদায় আজ,—
তোমার ধরায় প্রতি প্রাতে হোক রবির নবোন্মেষ,
রামধনু রাঙা রথে
আসুক রাজাধিরাজ।

ছায়া দেবী

আনমনা

কুঞ্চিত শিহরণ রেখা
পাহাড়ী হ্রদের বুকে তরঙ্গবিহীন।
ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠে সোনালি রোদের রং
আনীল আকাশে।
বসে বসে চেয়ে দেখি ফেরাতে পারি না চোখ—
ভুলে যাই হাতের কাজেরে।
উন্মনা হৃদয় বোনে অতীত দিনের জাল
স্বপ্ন আর কল্পনার
ছায়াময় মিঠে আলো দিয়ে।

তোমার তোরণদ্বার আজ বুঝি জনতামুখর।
পোড়ে ধূপ জ্বলে দীপ, তোমায় ঘিরিয়া।
চলে নিতি আরত্রিক পালা।
সাজানো রয়েছে থরে থরে,
নৈবেদ্যের ডালা—
আত্মরত পরিপূর্ণ তুমি
গ্রহণ করিছ ভোগ নিঃসংকোচ ক্ষোভহীনতায়।

একদা যে ছিল বিপরীত।
তখন পূজারী ছিলে তুমি

মৈত্রেয়ী দেবী

যে দেউলে নিত্য পূজা ছলে, ছিল তব নিত্য আনাগোনা
সে দেউল ভেঙে গেছে আজ।
আলোকের বেদী গেছে টুটে—
প্রাচীর ঘিরেছে আগাছায়
ফাটলেতে কত শত প্রাণী
নিরালোক নৈরাজ্যের মাঝে
শুরু করে অন্ধকার খেলা।

মৈত্রেয়ী দেবী

উপহার

সেদিন সকাল বেলা হয়ে এলোমেলো
অকস্মাৎ কোথা হতে হেন বন্যা এল
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি' চূর্ণ করি' সব
কোথায় ভাসাল মোরে। যা কিছু দুর্লভ
তারি তরে হোলো আশা। আনন্দ মধুর
দূরের সংগীত ঢালে কর্ণে সুধা সুর।
সংসারের আলো ছায়া তুচ্ছ লজ্জা ভয়
সব যেন মিথ্যা হোলো ; শুধু চিত্তময়
কোন্ এক স্পর্শ লাগি ওঠে উতরোল
নিরন্তর গীতধ্বনি আনন্দ কল্লোল।

দুই চক্ষু মুদিলাম, কিছু বুঝি নাই
কী ইহার অর্থ আছে। কিবা আমি চাই।
কী বাণী প্রকাশ মাগে, কী যে বেদনায়
ক্ষুদ্র মোর তরীখানি কূল নাহি পায়।
কী আশ্চর্য গন্ধ আসে সুরভিত করি',
এ কী দীপ্ত আলো লাগে—
আহা মরি-মরি।
সব যেন লুপ্ত হয়, কোথা নেয় মোরে,
সমস্ত নিমগ্ন করি' এ কোন্ সাগরে।
এ অপূর্ব দিনে আজি মত্ত হৃদিতটে
যদি কোনো অনুচিত অপরাধ ঘটে,
হেরি' এই উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়ের সুর
সংসার করে গো যদি আঘাত নিষ্ঠুর;
তুমি সব জানো প্রভু ক্ষমা কোরো তাই
শূন্য সূত্র ধরি' আমি ভাসিবারে চাই।
যখন জোয়ার আসে হয়ে আত্মহারা
উন্মত্ত দুর্ধর্ষ বেগে ছোটে জলধারা।
ভাঙি' দীর্ঘ বালুতট মরু প্রান্ত দিয়া
উত্তাল তরঙ্গ নাচে তীরে উচ্ছলিয়া।
শতকম্বুনিনাদিনী ঘন অম্বু রাশি
দুরন্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসে সহসা উচ্ছ্বাসি'
দুর্নিবার স্রোতে যবে ছোটে অন্যমনা
চতুর্দিকে মেলি' দিয়া শত লক্ষ ফণা
সর্ব বন্ধ ছিন্নকারী সে বেগ চঞ্চল
আমি কি রুধিতে পারি। কোথা পাব বল।

দিলীপকুমার সান্ন্যাল

কেন সেই বল নাই, কেন আসিলাম,
তুমি সব জানো প্রভু কেন ভাসিলাম।
আমি কিছু বুঝি নাই শুধু স্তব্ধ হয়ে,
মুগ্ধ মনে দেখিলাম কোথা গেল ল'য়ে।
কী আনন্দ লাগে যেন, অনির্বচনীয়,
সব যেন কাছে পাই যাহা মোর প্রিয়।
অন্ধকার নাহি আর, চক্ষে লাগে আলো
চারিদিকে যাহা দেখি তাহা বাসি ভালো,
সুধাগন্ধসুরভিত হৃদি মধ্যে চাই,
সব যেথা পরিপূর্ণ কোনো দৈন্য নাই।
কী সুস্নিগ্ধ রশ্মি হানি' তোমার আলোক
যেখানে করেছে সৃষ্টি নব স্বর্গলোক,
যেথা মোর মুগ্ধ মন সারা দিনমান
যে অনন্ত ধ্বনি শোনে যে সংগীত গান,
আজি এই অতি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তার
বাহিরে এনেছি নাথ দিতে উপহার।

দিলীপকুমার সান্ন্যাল

নিম্নে শত শিকড়ের বিচিত্র প্রয়াস
তার ইতিহাস শুধু মূক মাটি জানে ;
ঊর্ধ্বে শত শাখা মেলি' অধীর উল্লাস
শ্যামল পল্লবে, পুষ্পে—তরুর এ দানে

স্পর্ধিত গর্বের নাহি লেশ, এই তার
সফল আনন্দ ব্রত, দিয়াছে আশ্রয়
বিহঙ্গমে, পেল গান ; দিল ফলভার
স্নেহভরে, পেল বীজে জীবন অক্ষয়।
যেদিন সমাপ্ত হবে শত গ্রন্থিময়
বিড়ম্বিত শিকড়ের মর্ম-ইতিকথা,
কীটদষ্ট, রসহীন শেষ পরিচয়
নিভৃতে নিবিয়া যাবে ; অন্ধ নীরবতা
বিসর্পি' উঠিবে বিশ্বে—শাখার যা দান
তখনও স্মরণ পথে ছড়াবে কল্যাণ।

মনীশ ঘটক

শবরী-প্রতীক্ষা

দিনমান কাটে সোৎসুক শঙ্কায়,
চিত উদ্বেল নিভৃত প্রতীক্ষায়।
দূর দিগন্তে পলাশ পরশ রাগে
জ্বলে যে আগুন, মর্মে আসি' তা লাগে।

দিনমণি ডোবে চম্পক বন পারে
সিন্দুর লেপি' পম্পার পয়োধারে।

সুফী মোতাহার হোসেন

শান্তিনিবিড় স্নেহঅঞ্চল ছায়া
প্রসারে সন্ধ্যা, স্নিগ্ধ শ্যামল কায়া।

যুগযুগান্ত কালের পরিক্রমা
চলে অনিবার, অন্ধ নিয়তি সমা।

ছায়াপথচারী দয়িতের পদধ্বনি,
শ্রবণে পশিবে কবে, তারই কাল গনি'
নির্দেশহীন নিরুদ্দেশের লাগি'
আর কতকাল রহিবে শবরী জাগি'।

সুফী মোতাহার হোসেন

দিনান্তে

কুলায় প্রত্যাশী এক দীর্ঘপক্ষ পাখির মতন
দিগন্ত-প্রসারি দুটি ঘনচ্ছায় ব্যাকুল পাখায়
পশ্চিম সাগর পারে দিন যবে ধীরে চলি যায়
মৌন মূক বেদনায় সকরুণ করিয়া গগন ;—
যবে তারে সন্ধ্যাবধূ স্মিতহাস্তে টানিয়া গুণ্ঠন,
বাসর-প্রদীপগুলি জ্বালি দিয়া তারায় তারায়,
গোপনে বরণ করে, ঢাকে তারে গভীর মায়ায় ;—
দিনান্তে পথিক এক আঁখি ভরি নেহারে স্বপন ;

অমনি দিনান্ত যবে গাঢ়চ্ছায়ে ঘনাবে জীবনে
সকরুণ, সুগম্ভীর ; দিনান্তের যাত্রা-সহচরী
বধূ কি আসিবে তার। সুগভীর স্নিগ্ধ মমতায়
অমনি সুন্দর করে সন্ধ্যাদীপ জ্বালায়ে যতনে
বরণের ডালাখানি কম্প্রহস্তে তুলিবে কি ধরি'।
গভীর আশ্বাস বাণী কহিবে কি অস্ফুট ভাষায়।

সুকোমল বসু

যাত্রাদলের রাজা

ফালি কাপড়টা তালি দিয়ে পরি দিনের বেলাতে ভাই
রাতের বেলায় সেই আমি হই রাজা,
দিনের বেলাতে জীবনের হাটে আমি খালি দুখ্ পাই
রাতের বেলাতে আমি সবে দিই সাজা।
দিনের বেলায় মোরে গালি পাড়ে যতেক পাওনাদারে
রাতের বেলাতে যদি হাঁকি—"কই হ্যায়'
তটস্থ যত মন্ত্রী শান্ত্রী এসে জোটে চারিধারে
মাটি ছুঁয়ে মোরে লম্বা সেলাম দেয়।,
দিবসে ভিখারি, রাতের আসরে রাজা হই ফের আমি
দিনের বেলার পোষাকে আমার ফুটো,
আলোকের তলে ঝল্‌মল্ করে রাতের পোষাক দামী
দিনে জোটেনাকো শুধু চাল দুই মুঠো।।

সুকোমল বসু

রাজা আমি ভাই নেহাৎ শখের যাত্রাদলের রাজা
রাতের আসরে আমার সিংহাসন
রাতে রাজা হই—বাদশাহ আমি একেবারে প্রাণ তাজা
দিনের বেলায় ভিখারিরি মতো মন।
রাতে আর দিনে একই মুখে পরি তুইটি মুখোস্ মোর
তফাৎ যেন সে জমীন ও আসমান্
আলো নিভে যায় পেশাদারী নেশা কেটে যায় হোলে ভোর
চলে দিনে ফের ভিখারির অভিযান।
রাতে হাতে মোর প্রচুর সুযোগ ক্ষমতা অনেকখানি
খুশি যদি হয় নিতে পারি গর্দান,
অযাচিতে এসে হাজার স্তাবক দাঁড়ায় জুড়িয়া পাণি
প্রজারা আসিয়া ভয়ে করে কর দান।
দিনের বেলায় ফিরি দ্বারে দ্বারে ভিখারি আমারে কেউ
ডেকে শুধায় না খেয়েছি, কি খাই নাই,
'টাকা' 'টাকা' ক'রে ঘুরে ফিরে মরি করি শুধু ফেউ ফেউ
কার যায় আসে ম'রে যদি যাই ভাই।
রাজা ভিখারিব তুটি জীবনের বিরাট বোঝার মাঝে
আজ খুঁজে দেখি আমার সত্তা নেই
দিনে আর রাতে বাদশাহী আর ভিখারিগিবির কাজে
হারিয়ে গিয়েছে নিজের মনের খেই।
আমি ভাই হই রাত্রের রাজা দিবসে ভিখারি আর
চাকার মতন মোর অভিনয় চলিছে চমৎকার॥

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাত ভিখারি

নিথর রাতির পথের মাঝে রাত ভিখারির আনাগোনায়
শহর তলির নিঝুম গলির পথে—পথে কোনায় কোনায়
আলোর ছায়ার আবছায়াতে
হালকা তাদের চরণপাতে,
দ্রুত গতির ইশারাতে স্বপ্ন সম কী সুর শোনায়।
অলক্ষিতে ডাক দিয়ে যায় পরশ ক'রে সুপ্ত জনায়।

রাত ভিখারির দল গো তা'রা নিঝুম রাতের অন্ধকারে,
ভিখ্ মেগে যায় হালকা হাওয়ায় পরশ ক'রে দ্বারে দ্বারে।
পথিক তা'রা আঁধার-পথে
ভাসে ছায়ায় হাওয়ার স্রোতে,
ক্ষুধা তাদের মেটেনিকো তৃপ্তিবিহীন এ সংসারে,
অতৃপ্তিরই কামনা তাই ঘুরছে বুকে হাহাকারে।

পরলোকের দেশ হতে তাই আসছে তা'রা চুপি চুপি
ও-লোক হতে এ-লোক পানে—কে জানে গো কিসের লুভী।
আঁধারে কেউ ধনের মায়ায়
যক্ষ হয়ে রয় পাহারায়,
কেউ বা আসে, হাওয়ায় যখন গন্ধ পাঠায় জুঁই-করুবী,
তারই মাঝে প্রিয় জনায় ডাক দিয়ে যায় চুপি চুপি।

আব্দুল কাদির

বাহির হতে ঠেলছে দুয়ার আর কে যেন হাওয়ার সাথে।
বাতায়নে শিয়রে ঐ দাঁড়ানো কে দুপর রাতে।
দেয়ালে কার পড়ল ছায়া।
স্বপন না কি, ভুলের মায়া।
ঝিলমিলিতে শব্দ হোলো ঐ না মৃদু ঝঞ্ঝাপাতে।
বুকখানা কে ছুঁয়ে গেল স্বপনসম স্নিগ্ধ হাতে।

রাতভিখিরি ভিখ্ মেগে যায় আব্ছায়াতে ঘরে ঘরে,
অতৃপ্ত তার বুকের তৃষায় একটুখানি তৃপ্তি তরে।
নেমে আসে ভুবন তলে,
উঁকি দিয়ে যায় গো চ'লে,
অলখ পথের আনাগোনায় ডাক দিয়ে যায় পথের পরে,
ঘুমের ঘোরে যায় গো ছুঁয়ে কামনারই তৃষ্ণা ভরে।

আব্দুল কাদির

জয়যাত্রা

যাত্রা তব শুরু হোক, হে নবীন, কর হানি' দ্বারে
নব-যুগ ডাকিছে তোমারে।
তোমার উত্থান মাগি' ভবিষ্যত রহে প্রতীক্ষায়—
রুদ্ধ বাতায়ন-পাশে শঙ্কিত আলোক শিহরায়।
সুপ্তি ত্যজি' বরি' লও তারে, লুপ্ত হোক অপমান,
দেখা দিক্ শাশ্বত কল্যাণ॥

সৃজন-উৎসব আজি, হে নবীন, খুলে দাও দ্বার,
আনো তব নব-উপহার।
নিখিল-মানব মিলি' বিশ্বপ্রান্তে পাতিয়াছে মেলা—
উদ্বোধনী-বাণী তার তুমি আসি' গাহ এই বেলা।
উদার পরান মেলি' সবাকার লহ আলিঙ্গন,
দৃঢ় হোক আত্মার বন্ধন॥

ক্রন্দিছে নিখিল বন্দী, হে নবীন, মুক্ত করো তারে,
নিয়ে চলো আলো-অভিসারে।
পৃথিবীর অধিকারে বঞ্চিত যে ভিক্ষুকের দল—
জীবনের বন্যাবেগে তাহাদের করো বিচঞ্চল।
অসত্য অন্যায় যত ডুবে যাক, সত্যের প্রসাদ
পিয়ে লভো অমৃতের স্বাদ॥

অজস্র মৃত্যুরে লঙ্ঘি', হে নবীন, চলো অনায়াসে
মৃত্যুঞ্জয়ী জীবন-উল্লাসে।
আসুক বেদনা ভীতি, আসুক ব্যর্থতা পরাজয়—
সব-বন্ধ বিস্মরিয়া ধ্বনি' তোলো অসীমের জয়—
কণ্ঠে ধরি' বিধাতার জ্বালা-মাথা রক্ত মালাগাছি,
বলো "মা ভৈঃ, আমি আসিয়াছি।"

সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

যন্ত্র-যুগ

বাহিরে ঘনায় রাত্রি পৃথিবীতে নামে অন্ধকার—
যন্ত্রের নাহিকো ক্লান্তি, আর মোর চোখে ক্লান্তি নাই,
দুঃসহ আবর্ত-চক্রে রুদ্ধ শ্বাসে যন্ত্র গুমরায়,
ঘনায়িত অন্ধকারে দীর্ঘ ছায়া হোলো একাকার।
সবুজ শ্যামল ধরা ফিরে মোরে ডাকিবে না আর—
আজি এই সন্ধ্যা-কূলে ভাষাহারা কোন্ বেদনায়,
কর্মের চাকার তলে জীবনের স্বপ্ন টুটে যায়।
জাগর ত্রিযামা ব্যাপি' বয়ে চলি ক্লান্ত দেহ-ভার।

বাহিরে বাড়িছে রাত্রি, ক্লান্তিহীন কালের প্রহর
নিঃশব্দে আগায়ে চলে—দ্রুত পায় অশান্ত চঞ্চল;
অদৃশ্য বিক্ষেপে তার মূর্ছা যায় ক্লান্ত ধরাতল,
আমার চেতনা লোকে বাজিছে যন্ত্রের রূঢ় স্বর।
আমার নয়নে আজ মৃত্যুনীল আকাশ-ভূতল,
তিক্ত এ যান্ত্রিক প্রাণ কী আশায় করিবে নির্ভর।

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

রাতের রুবাইয়াৎ

দৈত্য-শিশুর নিশ্বাস যেন সহসা মত্ত বায়ু
পরখ করিল মোর কুটীরের কত আছে পরমায়ু,
ঝিমানো প্রদীপ চির নির্বাণে লভিল মুক্তি তার,
মনে হোলো যেন আলো ছিল মায়া—সত্য অন্ধকার।

বাতায়ন-পাশে হাস্নুহানা সে সুরভি লইয়া কাঁদে,
বক্ষে তিয়াসা কাঁদিছে বিশ্ব রূপ-মরীচিকা ফাঁদে,
জনম ভরিয়া দেওয়া হোলো শুধু পাওয়া নাহি হোলো কিছু
এই কি জীবন সমুখে আলেয়া, আঁধার নিয়েছে পিছু।

ঘুমায় মানসী ঘুম নাহি মোর ঘুমের মহল মাঝে,
মনে হোলো ঝড় বাহিরে থামিয়া অন্তরে মোর বাজে,
মানুষের প্রাণ কতটুকু আর ভাঙিয়া পড়িবে বুঝি,
হেন মনে লয় আমার আমিরে পাব না কোথাও খুঁজি'।

বাতায়নে আসি' রহিনু বসিয়া হয়তো বা অকারণে,
হৃদয় আমার বাহিরে গিয়েছে বাহির এসেছে মনে,
দগ্ধ আঁখির দৃষ্টি-শায়কে আঁধার বিঁধিয়া চাহি,
ঝঞ্ঝা তখন বিলাপি কহিল, "কিছু নাহি কিছু নাহি"।

এই যে প্রদীপ নিভিয়া রয়েছে কে তারে জ্বালাবে আর—
নভোসীমা হতে যে-তারা খসেছে কে ফিরাবে জ্যোতি তার।
নয়ন উপাড়ি যারে দেছ তুমি সে কি দিল দেখো নাই,
তোমার আকাশে ঝড়ের রাত্রি, বসন্ত আর ঠাঁই।

হরপ্রসাদ মিত্র

প্রভাতে

পুবের আকাশ লাল হয়ে গেছে রাত্রিশেষে,
সীমান্ত পথে চলে যাযাবর হাঁসের দল।
ওদের পাখার গভীর শব্দ মাটির দেশে,
মাটির বন্দী আত্মারে করে সুখে উতল।
ওদের ডানায় সিঁদুরের মতো আলোর পাছে,
সমুখে ওদের জাগে সীমাহীন আকাশ-পথ;
হৃদয়ের তলে বাসার বাঁধন পেয়েছে লোপ,
ভোরের আলোয় ওরা চিনিয়াছে পুবের পথ।
হয়তো পৃথিবী স্বপ্ন দেখিল গভীর রাতে—
বক্ষ ছাড়িয়া ভেসে চলে যায় আত্মা ওর।
সে-স্বপন বুঝি হোলো রূপায়িত আজিকে প্রাতে।
বনহাঁস নয়, নবরূপ-নেয়া স্বপন ওর।

বিরাম মুখোপাধ্যায়

হারানো সুর

সৌন্দর্যের এ পৃথিবী, সৌগন্ধের এ উদ্যান জানি;
জানি এ উজ্জ্বল স্বর্গ—হৃদয়ের রং আর স্বপ্নের সংগীতে
উন্মীলিত আত্মা মোর একদিন পুঞ্জ-পুঞ্জ প্রাণ-বিনিময়ে
জানি এ নিখিলখানি নানারূপে করেছে রঙিন।

কিন্তু হায়,
স্বর্গচ্যুত দেবত্বের এই দগ্ধ আজিকার পার্থিব জীবনে
ঈশ্বরের উদ্যানের নেই স্নিগ্ধ চন্দন-পরশ,
নেই কোনো ছন্দোময় কবিতার স্বপ্ন-সম্ভাবনা।
হায় আজ—
এখানে আমার শুধু গীতরিক্ত বিহঙ্গের মতো পড়ে-থাকা।
আজ শুধু আছে বিংশ শতাব্দীর জ্বালাময় নিষ্ঠুর জীবন,
আছে অন্ধ আত্মাশূন্য ভাই-বোন, মূঢ় প্রতিবেশী,
তুলা-দণ্ডে-মাপা হাসি, কান্না ও পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণ-পরিমিতি
মরস্বর্গে অমরত্ব লভিবার অপ্রবুদ্ধ, রক্তাক্ত উপায় :
এই সব তুচ্ছতার যূপ-কাষ্ঠে বাঁধা আছে দৈনিক জীবন,
এই মতো জীবনের অভিনয়ে আছি মোরা আচ্ছন্ন বিভোর,—
এই স্বর্গ-সুধা লাগি স্তিমিত ধমণী হতে বিন্দু বিন্দু রক্ত নিষ্কাশিয়া
করিতেছি কী কঠোর তপশ্চর্যা, আয়ুর সাধনা।

তবু আজ ক্ষোভ নেই,—
ক্ষোভ নেই, এ জীবন নহে যে আমার—
আমার জীবন আছে সূর্যের সোনালি-আঁকা আকাশের গায়,
আকাঙ্ক্ষা আকীর্ণ আছে তূর্ণগতি উল্কাপিণ্ড 'পরে।
সৌন্দর্যের এ পৃথিবী, সৌগন্ধের এ উদ্যান জানি :

জানি মিছে স্বপ্ন-দেখা সেই মোর মরে-যাওয়া স্বর্ণ-গোধূলির।
কিন্তু তবু ওগো মোর আত্মার ঈশ্বর,
ওগো বিংশ শতাব্দীর নিষ্ঠুর ঈশ্বর,
আজিকে ফিরায়ে দাও, ভিক্ষা দাও মোরে
ভিক্ষা দাও গোপন সৌরভটুকু রুদ্ধস্রোত আমার সত্তার।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

সায়াহ্ন

আমরা দেখেছি শুধু দিবসের ম্লান অবসান
মধ্যাহ্ন আকাশ পথে দেখি নাই সূর্য বহ্নিমান
রৌদ্রের রোদন যার উর্বশীরে খোঁজে দিকে দিকে—
যার স্মৃতি লয়ে আজ এ পৃথিবী আছে নিনিমিখে।

সন্ধ্যার আরক্ত ব্যথা বহে দূর প্রান্তিক গগন ;
অন্ধকার হয়ে এল ঝিলমের দেওদার বন,
বলাকারা উড়ে গেছে কবে কোন্ দিক্ দিগন্তরে
শূন্যতায় নেই তার কোনো চিহ্ন আমাদের তরে।

আমাদের দিনগুলি প্রাক্তনের ভুক্ত-অবশেষে,
মুহূর্তেরা নিয়ে আসে মৃত্যুর ক্ষুধিত ছদ্মবেশ,
পলে পলে করি দীন স্বপ্নহীন, অবসন্ন মন
ধূসর আকাশ আর মুখর মাটিরে সমর্পণ।

তবু যেন একদিন ভুলে যাই আপনার সীমা—
নয়নে স্বপন নামে, আসে নীল আকাশে পূর্ণিমা—
মনে পড়ে পৃথিবীর লাগি বুঝি আকুল হিয়ায়
মন্দার মালিকা ফেলে স্বর্গ হতে নিয়েছি বিদায়॥

আশু চট্টোপাধ্যায়

যৌবন-ধর্মী

আমরা যৌবন-ধর্মী—এই বিংশ শতকের তরুণ তাপস
বাঁচার সাধনা করি—ঠিকমতো বাঁচা যাকে বলে—
রুটিনের দাস নই, বাঁধা পথে কভু চলিব না ;
প্রথাকে মানি না মোরা, যদি সেই প্রথার পাঁচিলে,
মান্ধাতার আমলের সে-প্রথার কঠিন পাথরে
মাথা খুঁড়ে' মরে আত্মা অসহায়, অসহ্য ক্ষুধায়।

আমরা যৌবন-ধর্মী—কে বলে যে মোরা ক্রীতদাস
আমাদেরি হাতে-গড়া কয়েকটা লোহার যন্ত্রের।
আমরা যন্ত্রের প্রভু, প্রভু এই গোটা পৃথিবীর ;
ভাঙছি গড়ছি সদা সব কিছু নিজেদের ছকে।
জীবনের সব পথে আমাদের অশ্রান্ত মিছিল
গ্রীষ্মে, শীতে, বর্ষণেতে—আমরা মাঠের অট্টহাসি।

আমরা পাই না খেতে। হাসি পায়। ক'জন পাই না।
ঈশ্বরের সমকক্ষ, আমরা ভাগ্যের নিয়ামক।
উৎসুক বলিষ্ঠ হাতে ধরেছি এ জীবনের হাল—
জানি কোথা যেতে হবে, সর্বদাই পালে আছে হাওয়া,
যদি ঘটে ব্যতিক্রম, জেনো তাহা ক্ষণিক বিলাস—
আমাদের ভাগ্য নিয়ে মাঝে মাঝে খেলি লোফালুফি।

নির্মল ঘোষ

নারীর কেশের গুচ্ছে বন্দী হয় যদি কোনো রাত
মদির মোহের স্বপ্নে—আবার তো কাজের প্রাঙ্গণে
দিনে মোর পাবে দেখা ঘর্মাক্ত হাসির অন্তরালে।
যদি কোনো সন্ধ্যাবেলা হাওয়া লাগে শালের মাথায়,
চুপ ক'রে বসে থাকি মিটমিটে তারার আলোয়—
তখন ডেকো না মোরে—কথা কই বিধাতার সনে।

নির্মল ঘোষ

অনামী

আমাব কবিতাগুলি উড়ে যাক বাতাসে বাতাসে
—তাহাদের কোনো অর্থ নাই।
কোনো প্রজাপতি যেন কোনোদিন নাহি বয়ে আনে
লঘুপক্ষে ভর করি' কোনো প্রেমলিপির বারতা।
আমাব কবিতা থাক্ ক্ষণিকের মর্মকথা হয়ে।
মূল্যহীন অর্থহীন আমাদের দিন
অজস্র কণ্টকাকীর্ণ প্রতিদানবিমুখ-প্রয়াস
প্রতিটি মুহূর্ত ভরি' হতাশার বাণী বয়ে আনে।

আলোক রয়েছে কোথা, প্রতিক্ষণে জন্ম লয় কোথায় বসুধা।
মৃত্তিকায় ঢেউ ওঠে অরণ্য কাঁপিয়া ওঠে
আমরা তা জানি না কিছুই।

হরিদ্র মলাট খুলি' পড়িতে পারি না মোবা
পৃথিবীর গোপন বারতা ।
আমারে খোঁজে না যেন অনাগত কোনো কালে কেহ ।

ফ্যাকাশে বালুরবেলা আকাশে বিচিত্র ইন্দ্রধনু
ছড়াক আঁখিতে কারো অরণ্য-বিস্তার—
শতাব্দীর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে,
উড়ে যাক আমার কবিতা—
আমাদের গান ।

বাসব ঠাকুর

অজানা

অসীম কালের ক্রীড়নক মোরা যা কিছু ভেবেছি মনে
যুগ যুগ ধ'রে ব্যর্থ হয়েছে তাই ।
কুসুমের কুঁড়ি ফুটিতে ফুটিতে ঝরিয়া পড়েছে বনে,
ভ্রমর কহিছে, গন্ধ কোথায় পাই ।

চির নবীনের নীল অঞ্জন কালের নয়নে আঁকা
আজিকে যেথায় সোনার নগর কালি হবে তাই ফাঁকা,
আজি অসীমের যাত্রীরা যার মোহন বাঁশরি শোনে
কালের খেয়ালে কালিকে সে আর নাই ।

বাসব ঠাকুর

এই নশ্বর নয়নে যখন যা-কিছু লেগেছে ভালো
এ পরান শুধু তারি পিছু পিছু ধায়।
কখনো ঘনায়ে এসেছে আঁধার কখনো জ্বলেছে আলো
হারায়েছে যারে তাহারে খুঁজিয়া পায়।

হৃদয় মাঝারে দুবাহু বাড়ায়ে ধরিতে গিয়াছি যারে
এই জীবনের ক্ষণিক আলোয় ধরা নাহি যায় তারে।
কখনো সাকীরে নীল পেয়ালায় কয়েছি মদিরা ঢালো
কভুও বা তাই হেলায় শুধায়ে যায়।

এই মানবের মনের গহনে চিরকাল চলে খেলা,
অসীম কালের খেলার নাহিকো শেষ।
কখনো স্বপনে কনক কিরণে করিয়া গিয়াছি হেলা
মাটির মাধুরী নয়নে লেগেছে বেশ।

আলসে বসিয়া চলিতে চেয়েছি, সুধায়েছি কোথা পথ।
অসীম কালের দেবতা রয়েছে বসি' নিশ্চলবৎ,—
নীরবে হাসিয়া করিয়াছে শুধু সুদূরে যাবার বেলা
অজানার পানে অঙ্গুলি নির্দেশ।

দিনেশ দাস

মৌমাছি

জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে
দুপুরের মিহি স্বপ্ন ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল।
জেগে দেখি আমি ;
আমার ঘরেতে ওড়ে ছোটো এক বুনো মৌমাছি—
ডানায় ডানায় যার অরণ্য-ফুলের কাঁচা ঘ্রাণ,
পাগুটে শরীরে যার সোঁদা গন্ধ অজানা বনের।

কেমন সুন্দর এই উড়ন্ত মৌমাছি।
নিশ্রান্ত করুণ ওর গুনগুণানিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মসৃণতম গান,
আর দূর পাহাড়ের বন্ধুর বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি
যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ
আমার ঘরের মাঝে তুলে নিয়ে এল,
কোথাকার ছোট্ট এক বুনো মৌমাছি।

মহীউদ্দীন

বুভুক্ষা

চক্ষে রূপ-দৃষ্টি-তৃষ্ণা বক্ষে মোর তৃপ্তিহীন অনন্ত বুভুক্ষা,
সমস্ত ইন্দ্রিয় মম কেঁদে বলে নিশিদিন ভুখা আমি ভুখা।
আঁধার প্রাকার ভাঙি' আলোক-প্রবাহ চলে দুর্নিবার বেগে
ধরণী খুলিয়া দেয় অবরুদ্ধ দ্বার।—লোকে লোকে উঠে জেগে

মহীউদ্দীন

অবিশ্রান্ত আনন্দের পুলক-স্পন্দন—সূর্যের শিঙার রব
জাগে নীল নভস্তলে—সর্বজীবে জাগে নব জীবনের স্তব

জড়ের জড়তা ত্যজি' জীব আমি জন্ম কবে লভিলাম ভবে,
অনন্ত সৃষ্টির মাঝে ভূমানন্দে জ্যোতিষ্কের আলোক-আহবে
সাড়া দিনু চৈতন্য সাকার। কহিলাম জড় আমি জাগিয়াছি,
সীমাহীন শূন্য ব্যাপি' হোলো প্রতিধ্বনি জাগিয়াছি, জাগিয়াছি।—
নির্বিকার নিদ্রালোকে পরিশ্রান্ত মুসাফির ছিনু কতকাল
ক্লান্ত কায়ে ঘুমাইয়া—ভুলি' মম উন্মত্ত গতির নৃত্যতাল।

প্রভাতে জাগিল সূর্য, জাগিল অনাদি ব্যাপি' আলোক-প্রগতি
চির-পথ পান্থ যত সঙ্গীদল যাত্রা-পথে জানাইল নতি।
বিশ্ব-পান্থশালা দ্বারে হাঁকিলাম বাসনা ভিখারি আমি ভাই,
আলো চাই ছায়া চাই আনন্দ পুলকময় মহাপ্রাণ চাই।

জঙ্গল কাটিয়া আমি বসায়েছি স্বর্ণ নগরী। হিমাদ্রির
শৃঙ্গ লঙ্ঘি' করিয়াছি অভিযান। অগাধ জলধি নীর
সেঁচিয়া এনেছি মুক্তা। ভরিয়াছি ধন রত্নে বিপুল ভাণ্ডার,
আমারি শ্রমেতে সৃষ্টি করিয়াছি এ বিশাল ভোগের সংসার।

দুশ্চর তপস্যা যোগে বিশ্বের প্রপঞ্চ লঙ্ঘি' করেছি প্রয়াস,
মৃত আমি অমৃতের—ভাব-যোগে ভেদিয়াছি অনন্ত আকাশ।
সূর্য সোম গ্রহ তারকার দেশে রহস্যের করেছি সন্ধান,
পাতালে পেতেছি রাজ্য জলেতে বিলাস-বাস করেছি নির্মাণ।

আমি রচিয়াছি কাব্য দর্শন বিজ্ঞান জ্ঞান মহা ইতিহাস,
আমি অলি অন্বেষিয়া ফিরিয়াছি মকরন্দ মাধুরী নির্যাস,
পৃথিবীর ফুলে ফুলে। গাহিয়াছি প্রেম বিরহের গান,
গেয়েছি বেদনা গীতি। বঞ্চিত মানব লাগি ধরিয়াছি তান—
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা সুরে। আমি খেলিয়াছি খেয়ালের খেলা
ভেঙেছি গড়েছি কত হাট—বিজনে বিভুঁয়ে আমি
বসায়েছি মেলা।

মনের মুকুরে আমি হেরিয়াছি আমারি বিচিত্রময় রূপ,
ভেঙেছি কপাট আমি চূর্ণ করিয়াছি রুদ্ধ কঠিন কুলুপ।
ভেদের বিহঙ্গ আমি বাঁধিয়াছি মোর জ্ঞান-স্বর্ণ-প্রভা-জালে,
আলোক-আলেখ্য-রূপ হেরিয়াছি আঁধারের দ্বার-অন্তরালে।

অরণ্যের আধো আলো-ছায়া তলে কবে আমি বেঁধেছিনু ঘর,
উন্মুক্ত উল্লাসে কবে আন্‌মনে ভ্রমিয়াছি বিশ্ব চরাচর।
বন বনান্তরে খুঁজি' ফিরিয়াছি প্রতিদিন আহার্য শিকার,
ফলফুল লতা পত্র পুষ্পদল কাননের অগাধ সম্ভার,
আহরি' আহরি' নিত্য পূর্ণ করিয়াছি মম প্রত্যহের ডালা—
নিদাঘে তরুর ছায়ে বাজায়েছি বাঁশি বিরলে গেঁথেছি মালা।

দারিদ্র্যের জীর্ণ ঝুলি স্কন্ধে বহি' ভ্রমি আজি সংসারের দ্বারে,
মুমুক্ষু মানুষ আমি বন্দী হয়ে কাঁদি আজি অন্ধ কারাগারে।

আমি কাঁদি ক্ষুধাতুর নিপীড়িত মানবের ক্ষুধার্ত জঠরে,
আমি কাঁদি ক্ষুধাতুর দুঃখ-দগ্ধ দরিদ্রের প্রতি ঘরে ঘরে।
আমি কাঁদি ক্ষুধাতুর মৃত্যুমাঝে শ্মশানের ছাই ভস্মতলে,
আমি কাঁদি ক্ষুধাতুর নির্যাতন নির্বাসনে ফাঁসি রজ্জু-গলে।

মহীউদ্দীন

কণ্ঠে কণ্ঠে জাগে মোর অবিশ্রান্ত বুভুক্ষার উদাত্ত সংগীত,
হৃদয়ে জ্বলিছে অগ্নি লেলিহান শিখা নিত্য দিবস নিশীথ।
রক্তে রক্তে জাগে মুক্ত নৃত্য-পরা সাগরের তরঙ্গ কল্লোল।
আত্মা কাঁদে অন্ধকারে 'নিরুদ্ধ রহস্য-দ্বার খোল্ ওরে খোল্।'
